"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com
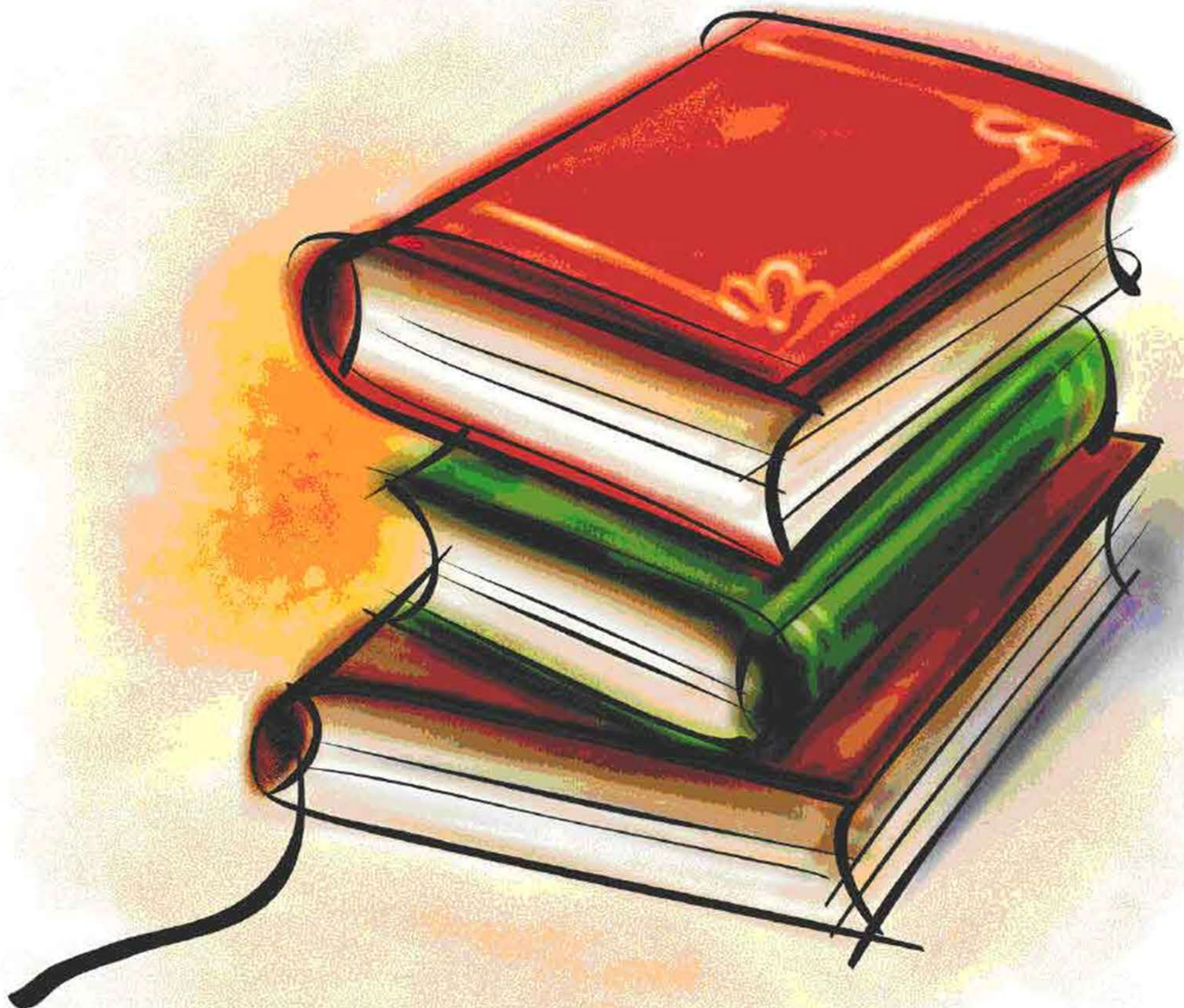
ম্যাডোনা

বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা

নিশীথ কর

উনিশ ও বিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের মৃত্যু ঘটে গেল। উনিশ শতকের শেষ দশকে এই তেজস্বী ব্যক্তিত্বের যে ক্রমবিবর্তন ঘটছিল তার তাৎপর্য স্পষ্টতই রাজনৈতিক হয়ে উঠেছিল। প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণের পর তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত' যে বক্তৃতামালার সঙ্কলন তাতে দেখি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে, আর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের পর তাঁর বক্তৃতায় দেখি তাঁর মন যেন গণচেতনায় আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। একটু বিশ্লেষণে মনে হয় আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের দুটি বিশিষ্ট অবদান হলো: দেশাত্মবোধের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি সেই 'মন্ত্রে'র আবেদন। তাঁর বাণীর আবেদন সেদিনকার তরুণ মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে বাংলার জাতীয় আন্দোলন যখন সন্ত্রাসবাদী রূপ নিল, তখন বিবেকানন্দের বাণী সেই তরুণ মনে প্রেরণার অন্যতম উৎস বলে গণ্য হয়েছিল। অবশ্য এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচারে আমাদের মত-পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই [illegible]-আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ সম্বন্ধে নেতাজী [illegible]চন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতির সঙ্গেও মতপার্থক্যের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তিনি বলেছিলেন: "যদিও স্বামিজী নিজে কোনও রাজনৈতিক বাণী দেন নি, তবুও যাঁরা তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। অন্তত

পক্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলা দেশের সম্পর্কে সেই ব্যাপারে বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা।"

এখানে 'আধ্যাত্মিক পিতা', এ কথা বলার অর্থ—বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ছিলেন না বা রাজনৈতিক বাণীও দেন নি। তবে তাঁর বিশেষ ধরণের আধ্যাত্মিকতা থেকেই তাঁর রাজনীতি উৎসারিত হয়েছিল বলে তিনি 'আধ্যাত্মিক পিতা'। তাই তাঁর আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

সমসাময়িক মামুলি রাজনীতির প্রতি বিবেকানন্দের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তার কারণ দুটি। প্রথম, তিনি তখনকার রাজনৈতিকদের দেশের জন্য আত্মত্যাগের, নিষ্ঠায় ও তাদের দেশাত্মবোধের গভীরতায় বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য এ কথা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য না হতেও পারে। দ্বিতীয়, তখনকার রাজনৈতিকদের চিন্তার গণ্ডী ছিল শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ। এ কথা আবার তিনি তখনকার সমাজ সংস্কারকদের সম্বন্ধেও সত্য বলে মনে করতেন। কোটি কোটি অজ্ঞ, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এঁদের রাজনীতি বা সমাজসংস্কার ছিল না। বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদানের পর ইওরোপ আমেরিকা ঘুরে ১৮৯৭ সালে যখন মাদ্রাজে ফিরে এলেন তখন তিনি তাঁর "আমার সমরনীতি" নামক বক্তৃতায় বললেন :

"লোকে স্বদেশ হিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশের হিতসাধনে বিশ্বাসী এবং সে সম্বন্ধে আমারও একটি আদর্শ আছে।···হে ভাবী সংস্কারকগণ, স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেবঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি লোক শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তাহা

হইলে তোমরা স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান, আমি ধর্ম-মহাসভার জন্য আমেরিকা যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য করিবার কোনো সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম। ধর্ম-মহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে তাহার খবর নেয় কে?"

বিবেকানন্দের এই দেশাত্মবোধের ধ্যানধারনা সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে 'স্বামিজী ও দেশাত্মবোধ' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে বলেছেন: "যে ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনা-পরম্পরা হইতে ইউরোপে ন্যাশানালিজম, পেট্রিয়টিজম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়া জাতীয় চরিত্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে সেরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। অথচ ঐ শব্দগুলি আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় শোনা যাইত এবং উহারই বাঙ্গলা তর্জমা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং দেশাত্মবোধ। এগুলি বিলাতী রাষ্ট্রনীতির অভিধান হইতে ধার করা মুখস্থ বুলি মাত্র—ঐ সকল সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় দেশব্যাপী এমন কোনো আন্দোলন শিক্ষিতবর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, লোকসাধারণকে ডাকও দেন নাই। এই সীমাবদ্ধ এবং আবেদন নিবেদনের রাজনীতি ভদ্রলোকের আন্দোলন। ইংরাজ শাসন ও পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় যে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল সেদিনের ভারত ছিল সেই ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ।"

সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলেন: "ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবাসীরা যখন ভিক্ষার দ্বারা অধিকার অর্জনের জন্য ব্যস্ত, তখন আর এক অংশে যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় নাই এমন নয়। কিন্তু সে স্বদেশ ইংরাজের পুঁথিগত স্বদেশ, বিদেশী আইডিয়ার ছাঁচে ঢালা অবাস্তব কল্পনা নয়। বহুকাল বহু সাধনায় মানুষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম ও কর্ম দ্বারা যে দেশকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বদেশ। তাহার সহিত তাহার জনমণ্ডলীর সহিত নাড়ীর যোগ অনুভব করিবার একটা সাধনা আছে। বিবেকানন্দ সচেতন মন দিয়া সেই সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বদেশের সমগ্ররূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'ভদ্রসমাজ ও উচ্চবর্ণের গণ্ডীর বাহিরে লক্ষ কোটি নর-নারীর দুঃখ, ক্লেশ, অবুদ্ধি, কুসংস্কার, হীনতা ও তামসিক জড়ত্ব এ সব কিছু লইয়া যে মানুষ' তাহাদেরই তিনি ভালবাসিলেন। সেই ভালবাসার আলোকে তিনি দেখিলেন অধঃপতন ও আত্মবিস্মৃতি যতই গভীর হউক না কেন, 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও' পূর্বপুরুষগণের শক্তি প্রসুপ্ত রহিয়াছে। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিবে, জাগ্রত ভারত আবার বিশ্বমানবের জয়যাত্রার সহিত পায়ে পা মিলাইয়া চলিবে।"

অর্থাৎ বিবেকানন্দ দেখলেন যে এ যুগের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজসংস্কারক বা রাজনৈতিকদের আদর্শ বা গুরু হলেন ইউরোপের বার্ক, সেরিডন, মিল, বেন্থাম বা ইতালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা গারিবল্ডী, মাৎসিনী অথবা ফরাসী বিপ্লবের নেতা রোবস্‌পীয়র। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেও এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য এ সবের আধুনিককালীন ধারণা সেখান থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু তিনি আরও দেখলেন যে দেশের অশিক্ষিত অগণিত জনগণ যে আদর্শ তখন আঁকড়ে ধরে আছে তা হচ্ছে ভারতের প্রাচীন বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত, শাস্ত্র পুরাণ, মুনি-ঋষিদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আদর্শ। অবশ্য এই ঐতিহ্যের মধ্যে মানবতাবোধ থাকা সত্ত্বেও ছিল অনেক কুসংস্কার, অযৌক্তিকতা, অসাম্য ইত্যাদি। এ সবের সমালোচনা ইতিপূর্বেই সমাজসংস্কারকরা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সেই সময় বিদেশী ইংরাজ এবং খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা এ দেশের ধর্ম, শাস্ত্র, পুরাণ, সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ ও অপমান করছিল, সেই হেতু বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থন প্রয়োজন মনে করলেন। তা না হলে দেশের মানুষের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখা যায় না, আর তাদের হৃদয়ও জয় করা যায় না। তাই তিনি যুক্তি-সাম্য-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ভারতের এই ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মধ্যে যা কুসংস্কার, অযৌক্তিকতা, অসাম্য তার যেমন একদিকে সমালোচনা করতে লাগলেন—তেমনি আবার অন্যদিকে তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তার মানবতাবোধকেও সমর্থন করলেন। সেই কাজে মাঝে মাঝে হয়তো তার চিন্তায় দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, সেই হলো সেদিনকার পরিবেশে তাঁর 'আধ্যাত্মিক-রাজনীতি'র পথ গ্রহণের কারণ—তাই তাঁর বাণীর অর্থ সব সময়েই যুগপৎ আধ্যাত্মি ও রাজনৈতিক। আর সেই হলো তাঁর নব্য-বেদান্তের যথার্থ ভাষায় [illegible]

'কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাবার' ডাক। তা ছাড়াও বিবেকানন্দ বললেন: "বেদান্ত কেবল জল্পনার বিষয় হয়ে থাকলে চলবে না, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এর প্রকাশ সত্য হয়ে উঠতে হবে। জটিল শাস্ত্র-পুরাণের জট ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনের নীতি সন্ধান করে নিতে হবে। যোগের গোলক ধাঁধাঁ থেকে পথ কেটে বের করে নিতে হবে প্র্যাক্‌টিক্যাল মন দিয়ে।" বলা বাহুল্য এই হলো তাঁর "প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে"র দৃষ্টি।

বিবেকানন্দের এই "আধ্যাত্মিক-রাজনৈতিক" দৃষ্টির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার' নামক বই-এ বলেছেন: "বিবেকানন্দের জীবনের ভিত্তি ছিল ভারতের অতীত গৌরবের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; এ দেশের ঐতিহ্যে তিনি গৌরব অনুভব করতেন—অথচ জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি আধুনিক কালোপযোগী মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এক হিসাবে তাঁকে ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুস্বরূপ বলা চলে।"

বিবেকানন্দের রাজনীতি সম্বন্ধে নেহেরু আরও বলেছেন: "বারংবার তিনি বলে গেছেন যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, সমাজে সাম্য আনা দরকার, জনসাধারণকে পঙ্কশয্যা থেকে তুলে ধরা দরকার। 'বেঁচে থাকতে হলে, জাতীয় জীবনে উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন—চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা। যেখানে এই স্বাধীনতা নেই সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।' 'এই অগণিত জনগণ, এরাই ভারতবর্ষের আশা ভরসা। ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কিছু আশা করি না, কারণ তারা দেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে মৃতকল্প।'. বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পটভূমিকায় পাশ্চাত্য জগতের প্রগতিকে প্রতিষ্ঠা করতে—to make a European society with India's religion'। 'সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে, কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্ম সাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।' ধীরে ধীরে বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিকতার দিকে অগ্রসর হন: 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে সব সমস্যা একটা বিশেষ কোন দেশ বা জাতির সমস্যা ছিল, আজ সেই সব সমস্যার সমাধান নিছক জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যাগুলি ক্রমেই বৃহদাকৃতি ধারণ করছে, বিচিত্ররূপে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই কেবল এই সমস্যা সমাধান

করা চলবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এই হলো এ যুগের দাবি।'

পূর্বেই বলেছি সমসাময়িক রাজনীতিতে বিবেকানন্দের কোনো শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। কারণ সে যুগে ১৮৮৫ সালে হিউম সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল শুধু 'আবেদন নিবেদনে'র ভিক্ষার রাজনীতি। এই প্রতিষ্ঠানে তখন সমাগম হতো শুধু ধনী উকিল ব্যারিস্টার জমিদার ব্যবসায়ীদের। সেই কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন তখন ছিল ধনীলোকদের 'তিন দিনের তামাশা'র আড্ডা। বাংলা দেশ থেকে যাঁরা কংগ্রেসের তখন সভাপতি হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বোস, রমেশচন্দ্র দত্ত, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি। এঁরা কেউই সেদিন জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলতেন না। এঁরা সবাই ছিলেন 'নরম পথে'র পন্থী। উনিশ শতকের শেষাশেষি অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যে একটি চরমপন্থী দল গড়ে উঠতে থাকে—মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে ও বাংলায়। বাংলা দেশের এই চরমপন্থীদের একাংশই বিশ শতকের গোড়ায় সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করে। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপরই বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে অনুভূত হতে থাকে। জীবনের শেষ দিকে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টির রূপান্তর দেখতে পাই। বিবেকানন্দের ছোটভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ—প্যাট্রিয়ট্-প্রফেট্' নামক বই-এ বলেছেন যে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের পর যখন বেলুড়ে ফেরেন সেই সময় তিনি ১৯০২ সালে জনৈক তরুণকে (অধ্যাপক কামাক্ষ্যা মিত্রকে) বলেন: "ভারতে এখন বোমার প্রয়োজন"।* তাছাড়া

বিবেকানন্দের 'আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক' দৃষ্টি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কর্তৃক জনৈক মুসলমান বন্ধুকে ১৮৯৮ সালে লিখিত একটি পত্র উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে তিনি লিখেছেন: "বাস্তবক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ প্রয়োগের একটি উত্তম উদাহরণ হলো সর্বজীবের মধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। এই সর্বভূতে সমদৃষ্টি হিন্দুসমাজে আসার এখনও অনেক দেরী।

অপরপক্ষে দেখতে পাই কার্যক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যদি অন্য কোন ধর্মমতাবলম্বী অনেকাংশে এই সাম্যাবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে তো সে হলো যারা ইসলামে বিশ্বাসী।...

আমাদের মাতৃভূমির একমাত্র ভরসা এই যে একদিন হয়তো আমরা এই দুই ধর্মমতের—হিন্দুত্বের ও ইসলামের—মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারব। বৈদান্তিক মাথা ও ঐস্লামিক দেহ—এর চেয়ে অধিকতর কাম্য আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে আমি যেন দেখতে পাই

এ প্রশ্নও অনেকের মনে থেকে যায় যে, কার প্রেরণায় বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' মধ্যে একাধিক সন্ত্রাসবাদী সন্ন্যাস নিয়েছিলেন; এবং বেলুড়ে 'রামকৃষ্ণ মিশনে' পুলিশের খানাতল্লাসী পর্যন্ত চলে। এ সব কথা আজ বিস্মৃত-ইতিহাস। কারণ পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' রাজনীতির ছায়াই শুধু এড়িয়ে যায় নি, বিবেকানন্দকে শুধু আধ্যাত্মিক ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করেছে। তবে বাংলা দেশে যতদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল, ততদিনই বিবেকানন্দের প্রভাব অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিবেকানন্দের রাজনৈতিক প্রভাব বাংলার জাতীয় আন্দোলনে বজায় ছিল।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অবশ্য একদল মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—যদিও সে আন্দোলনের প্রতি সমগ্র দেশেরই মৌন সমর্থন ছিল। পরাধীনতার গ্লানি দূর করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এই আন্দোলনের পথ। আর ফরাসী ইটালী, আয়র্লণ্ড ও রাশিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম-কাহিনী ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের বাণীর বলিষ্ঠ ও তেজস্বী দিকটিই এই আন্দোলনের মেজাজের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক অনিবার্য কারণে যখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অবসিত হয়ে গেল, তখন গান্ধীজির আন্দোলনে এবং পরবর্তী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে বিবেকানন্দের বাণীর গণ-আবেদনের দিকটি কেন যে জনমনে সাড়া জাগাতে পারল না সে প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া গেল না।

উনিশ শতকের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের সকলের মধ্যেই স্বাদেশিকতার ভাব অল্প-বিস্তর ছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সেই স্বাদেশিকতা এমন তীব্র ও উগ্র অনুভূতিতে বিবেকানন্দের পূর্বে আর কারও বাণীতে প্রকাশিত হয় নি। বিবেকানন্দ

ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সর্বদোষ লেশহীন ভারতবর্ষ, সমস্ত বিশৃঙ্খলা, সব কিছু সঙ্ঘাতের ঊর্দ্ধে উন্নতশীর্ষ অপরাজেয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে সে বৈদান্তিক, সঙ্ঘ সংগঠনের দিক থেকে সে ঐস্লামিক।"

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—'স্বামী বিবেকানন্দ—প্যাট্রিয়ট্ প্রফেট্' পৃঃ ২১২

অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকদের ধারাকেই সমর্থন করতেন। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির যুক্তিমূলক সংস্কার প্রচেষ্টারই তিনি আজীবন বাহক ছিলেন। তবে এই সংস্কার আন্দোলনকে তিনি দারিদ্রের মধ্যেও সঞ্চালিত করার আহ্বান জানান। সে যুগে ধর্মের নামে উচ্চ জাতিরা নিম্ন জাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করতেন। বিবেকানন্দ সেই ধর্মের নারায়ণকেই প্রমাণ করলেন দরিদ্রের মধ্যে প্রকাশমান—আর সেই দরিদ্রনারায়ণ সেবাকেই যুগের ধর্ম বলে প্রচার করলেন। এই কথা সে যুগে একটি বিশিষ্ট অবদান। তিনি বললেন: "ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায় বলে চারিদিকে কেন তুমি বৃথা অন্বেষণ করছ! তিনি তো তোমার সামনেই রয়েছেন। নিরন্নের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে, পতিতের মধ্যে, অজ্ঞানীর মধ্যে, অস্পৃশ্যের মধ্যে তোমার নারায়ণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান রয়েছেন। একবার জ্ঞানচক্ষু মেলে তাঁকে দর্শন কর এবং এই সকল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করে তোমার ইষ্ট দেবতার প্রিয় কর্ম সাধন কর। তুমি এদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েছ বলে কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইও না। এদের সেবা করার অধিকার পেয়েছ বলে অপনাকে ধন্য বলে বিবেচনা কর।" বলা বাহুল্য এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবাই দুই-তিন দশক পরে গান্ধীজির 'হরিজন-সেবা'য় রূপান্তরিত হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন বিবেকানন্দ অবশ্য সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার ও দেশাত্মবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গুণগান করেছেন। কিন্তু সেটা করেছেন শুধু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে মানবিক গুণ টেনে বার করে দেখাবার জন্য। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে "ভারতের ধর্মের উপর ইউরোপীয় সমাজ গড়ে তোলা"। তাই বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে সর্বত্রই দেখি এক দ্বন্দ্ব: প্রাচীন আদর্শের প্রতি একটা 'পিছুটান' এবং নতুন সমাজ গড়ার জন্য আর একটা 'সম্মুখটান'। কিন্তু তখনকার "ইউরোপীয় সমাজ" অর্থাৎ স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার প্রতিই তাঁর প্রবণতা বা আগ্রহ ছিল বেশি। তিনি এ কথাও বলেছিলেন: "যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল—সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল"।

বিবেকানন্দের এই ধারণাকে বৈশ্য বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র বলা ছাড়া উপায় কি ?

কিন্তু এই কথাই শেষ কথা নয়। বিবেকানন্দ ইওরোপ, আমেরিকায় গিয়ে যেমন একদিকে এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঐশ্বর্য, সংগঠনশক্তি, বিজ্ঞান, কর্মপ্রবণতা (রজঃগুণের) প্রশংসা করতে লাগলেন—তেমনি আবার সেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখে মর্মাহত হলেন। তিনি সেখানে ধর্মমঠও দেখলেন। শোষক ও শোষিত দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র রূপ দেখেও তিনি ক্লিষ্ট হলেন। তাই তিনি বললেন : "আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হইও না। ধনীতন্ত্রীয় পাশ্চাত্য সমাজ যাহা শোষণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা গরীবকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় কলেবর স্ফীত করিতেছে, তাহা একদিন ফাটিয়া পড়িবে"।

তিনি আরও বললেন : "সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ একটি আগ্নেয়গিরির উপর রহিয়াছে। তাহা কালই ফাটিতে পারে এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারে। উহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অলিগলিরই সন্ধান করিয়াছে কিন্তু সমাধান পায় নাই।"

এই দ্বন্দ্ব-পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য সমাজ-সমস্যার বিবেকানন্দ-নির্দেশিত সমাধান হল 'সাম্য' প্রতিষ্ঠা। এই সাম্যদৃষ্টিতে যদি সব দেশের, সমাজের ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করা যায় তা হলেই সমাজে সুখ-শান্তি আসবে। সে সুখ-শান্তি আবার মানুষের অন্তরেও প্রতিফলিত হবে। পূর্বেই বলেছি বিবেকানন্দ তাঁর 'সামাজিক সাম্যে'র ধারণা পাশ্চাত্যের ফরাসী বিপ্লবাদর্শের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আর আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন ভারতের বেদান্ত থেকে। এই দুটিকে তিনি মিলিয়ে নিয়েছিলেন—তবে আত্মিক (subjective) বা আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টির প্রতি তাঁর চিন্তার প্রবণতা ছিল বেশি।

তবে সর্ব স্তরের সাম্য—কি আত্মিক, কি সামাজিক ও কি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার কথাই বিবেকানন্দ বলেছেন। এবং সেই সামগ্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পেই বোধহয় তিনি 'সমাজতন্ত্রে'র কথা বললেন।

এই 'সমাজতন্ত্র' কথাটি বিবেকানন্দ দু-একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি একবার ঘোষণা করেছিলেন এই বলে যে 'I am a socialist'। যতদূর জানা যায় ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি এই কথা বলেছিলেন।

বিবেকানন্দের পূর্বে ১৮৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' নামে একখানি পুস্তিকা

প্রকাশ করেন। যতদূর মনে হয় দুটি দেশী ও বিদেশী তরঙ্গাঘাতেই বঙ্কিম এই 'সাম্য' প্রবন্ধ লেখেন। একটি তরঙ্গ হলো তখনকার গ্রাম-বাংলার কৃষক সংগ্রামের তরঙ্গ—যেমন পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি। দ্বিতীয় তরঙ্গটি হলো ইওরোপীয় সাম্যমূলক চিন্তার তরঙ্গ। এই দুই তরঙ্গের ফলই বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তার উদ্ভব। কিন্তু যে ইউরোপীয় সাম্যচিন্তার সঙ্গে বঙ্কিম পরিচিত ছিলেন তা হচ্ছে রবার্ট ওয়েন, লুই ব্ল্যাঙ্ক, সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়ার প্রভৃতির সমাজতন্ত্রের চিন্তা। অর্থাৎ ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র ছিল তাঁর চিন্তা-তরঙ্গের উৎস। মার্কস এঙ্গেলসের সমাজতন্ত্র নয়।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাও দেশী বিদেশী প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, দেশের দুর্বিষহ দারিদ্র্য ও সামাজিক ভেদাভেদ দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত, বেদান্তের আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা; তৃতীয়ত, ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিতি—এগুলিই বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার নিয়ামক। তবে তাঁর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাও কাল্পনিক; কিন্তু তা বঙ্কিমের 'সাম্য' প্রবন্ধের ধারণার ঠিক অনুরূপ নয়। বিবেকানন্দ অনেক প্রগতিশীল চিন্তার অবতারণা করেছেন—অথচ অনেক উদ্ভট মন্তব্যও করেছেন। তবে বঙ্কিম তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধ পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর সমাজতন্ত্রের উপর।

তিন চার দশক পূর্বে 'অদ্বৈত-আশ্রম' কর্তৃক প্রকাশিত বিবেকানন্দের 'Caste, Culture and Socialism' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় বলা হয়েছে :

"True, Swami Vivekananda had an intimate knowledge of ·uch western movements as Anarchism, Nihilism, Socialism, and Commusism from their literature as well as from personal contacts. He met Peter Kropotkin at the Paris International Exhibition (1900) ; and Plekhanoff's party was then very active in England. These movements were then in their infancey ; and even their protagonists had no great hope for the causes they advocated. It was remarkable, therefore, for such an Orientalist as Swami Vivekananda to prophesy at that distant date that "Socialism of some forms was coming on

the boards," and that the "Shudras as Shudras would be the future ruling caste."

সেই সুদূর অতীতে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার অনেক পূর্বে—বিবেকানন্দের পক্ষে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই প্রশংসনীয়। তবে তিনি পিটার ক্রোপটকিনের কাছ থেকে কি খবর জানলেন তার সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তা ছাড়া মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন সম্বন্ধেও কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় বিবেকানন্দ মার্কস-পূর্ব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য এই ভূমিকায় 'কমিউনিজম' কথাটিরও উল্লেখ আছে—কিন্তু বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক রচনার মধ্যে তার কোনো উল্লেখ দেখি না।

উপর-উক্ত পুস্তিকাটিতে বিবেকানন্দের সব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সঙ্কলিত করা হয়েছে—তার মধ্যে 'I am a Socialist' প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে অনেক অপরিচ্ছন্ন, বাঁকাচোরা কথা থাকা সত্ত্বেও এতে বিবেকানন্দের বক্তব্য হলো : "সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা সর্বতোভাবে ভাল বলে আমি মনে করি না। কিন্তু নেই মামার চাইতে কানা মামা ভাল। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেগুলির দ্বারা সমস্যা মেটে না। একবার সমাজতন্ত্র নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা যাক না ; আর কিছু না হলেও ও একটা নতুন চেষ্টা ত বটে।" অর্থাৎ বিবেকানন্দের মত হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতন্ত্র শ্রেয়—তবে তা নিখুঁত সমাজব্যবস্থা নয়। বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের কোনো বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক ভিত্তি বা রাষ্ট্রিক কাঠামোর তত্ত্ব খাড়া করেন নি। তবে তিনি বলেছেন ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে। তাছাড়া তিনি বলেছেন জগতে পর পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যুগ আসবে। আর বৈশ্য যুগ উত্তীর্ণ হয়ে যখন শূদ্র যুগ আসবে—তখন তা শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজ হবে। শূদ্র বলতে তিনি মনে করতেন শ্রমিক, কৃষক এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের 'প্রলেটারিয়েট' এক ব্যাপক অর্থে 'সব মেহনতী মানুষ'। এই শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজে সকলের শিক্ষা, জ্ঞান ও ধনলাভের সমান সুযোগ থাকবে। তবে বর্তমান সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তা কোনো শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের মাধ্যমে দূরীভূত করার কথা তিনি বলেন নি। তিনি তাঁর শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য শুধু

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বেদান্তের আধ্যাত্মিক সাম্যজ্ঞান বিস্তারের কথাই বলেছেন। এর ফলেই সমাজের উচ্চশ্রেণীরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে, আর তার স্থানে উদয় হবে শূদ্র প্রাধান্যযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ—সেখানে অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হবে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্য।

বলা বাহুল্য সুদূর অতীতে এ চিন্তা-প্রয়াস নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল পদক্ষেপ। হয়তো দেশের মাটিতে উপযোগী পরিবেশের প্রস্তুতি হয় নি বলেই সে চিন্তা সুসংহত হয়ে একটি সম্পূর্ণ মতবাদের রূপ নিতে পারে নি। অসংলগ্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সমন্বয়ে তবুও তার যে সাম্যের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুঃখের কথা যে বিবেকানন্দের এই সামাজিক চিন্তা সেদিন জনমনে কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। তার কারণ হয়তো সেদিনকার সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকায় সে চিন্তা ছিল অত্যন্ত অবাস্তব—সেটা যেন শূন্যে হাওয়ায় ঝুলছিল। তবে উত্তরকালে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র কেন যে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না সে কথা বুঝতে পারা যায় না। হয়তো তার একটা কারণ হলো যে, যখন আমাদের দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যথার্থ শ্রমিক আন্দোলন শুরু হলো তখন ইতিপূর্বেই সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব সার্থক হয়ে গেছে। সেই আসল সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিতির পর বিবেকানন্দের সমাজ-তন্ত্রের প্রতি বোধহয় আর দেশের মানুষের কোনো আগ্রহ জন্মাল না। কিন্তু তবুও দেশের মাটিতে যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ইতিপূর্বে একটা নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তার প্রতি মর্যাদা দেখালে হয়তো দেশের জনচিত্তে সমাজতন্ত্র তাড়াতাড়ি শিকড় গাড়তে পারত। দরিদ্র-দরদী বিবেকানন্দ যে সমাজতন্ত্রীও ছিলেন, এ কথার প্রচার-প্রচেষ্টায় দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্তই হত বলে মনে হয়।

যতদূর মনে পড়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দু-দুবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা দেশের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। হয়তো সে প্রচেষ্টার উৎসাহ আতিশয্যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করেছিলেন। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও, তাঁর প্রচেষ্টা যে রাজনৈতিক মহলে কেন সার্থক হলো না তা দুর্জ্ঞেয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রুশ দেশে লেনিনের কথা। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আধ্যাত্মিক টলস্টয়কে 'ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক' বলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে

তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। কারণ শোষিতজনের প্রতি সহানুভূতিতে ও মানুষের মঙ্গলাকাজ্ক্ষায় রুশ হৃদয়ে টলস্টয়ের স্থান ছিল শ্রদ্ধার মণিকোঠায়। সেই হৃদয়কে নাড়া দিতে গেলে দরিদ্র-দরদী টলস্টয়ের অস্ফুট সমাজবাদী চিন্তাকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা তাই বোধহয় সমীচীন বলে মনে হয় নি।

অবশ্য আমাদের দেশে বিবেকানন্দ-চিন্তাধারার একদল উত্তরাধিকারী আছেন। মনে হয়, তাঁরা আজ উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিতের পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র-নারায়ণসেবী বিবেকানন্দকে ভুলতে চান। আধ্যাত্মিকতার অস্পষ্ট তত্ত্বালোচনায় বিবেকানন্দকে আরও দুজ্ঞের্য় ও দুবোধ্য করে তুলতেই তাঁরা আজ বেশি উৎসাহী। ফলে, বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রবন্ধের জন্য যে বইগু'লর উপর নির্ভর করতে হয়েছে :—

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'স্বামিজী ও দেশাত্মবোধ' (প্রবন্ধ পুস্তিকা)

Subhas Chandrs Bose—'Life and Writings'. Part I

Swami Vivekananda—'From Colombo to Almora'

Letters of Swami Vivekannnda.

পণ্ডিত নেহেরু—'ভারত-আবিষ্কার'

Bhupendra Nath Dutt—Swami Vivekananda—Patriot-Prophet

বিবেকানন্দ—'বর্তমান ভারত'

Swami Viʌəkananda's Works. Vol. III

Swami Vivekananda—'Caste, Culture and Socialism'.

নবজাতক ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

কড়া খাড়া লোম ঘাড়ে
মেটে সাদা শুয়োরের দল
ঘুরে ফেরে বেওয়ারিস মাঠে।
কুশ্রী জীব, কদর্য গড়ন ;
কাদা ঘাঁটে, নোংরা খায়,
জুগুপ্সা জাগায়।
ওরি মাঝে
দেখো দেখো, কী আশ্চর্য দুটি ছোট ছানা।—
গোলাপী ফুলের রং তুল্‌তুলে তুলো দিয়ে ঢাকা।
তুর্‌তুরে চার পায়ে নেচে নেচে চলে।
পায়ের পাখায় যেন মাটির আকাশে উড়ে যায়।
উড়ে যায় গান হয়ে,—শব্দহীন জীবনের গান

ওরা আগন্তুক,
মর্তের মাটির বুকে প্রাণের আনন্দ ওরা,
নাচের পুতুল।
দেখো দেখো
কী সুন্দর,
খোলা মাঠে খেলা করে নবজাত শুয়োরের ছানা॥

সব পাওয়ার ছড়া ॥ সলিল চৌধুরী

মনে কর সব পাওয়া গেল
ক্যাডিলাকে চেপে যাওয়া গেল
ফারপোয় বসে খাওয়া গেল
আতরের জলে নাওয়া গেল
মূলতানী টোড়ী গাওয়া গেল

যে মেয়ের পিছে ধাওয়া গেল
চোখে চোখ রেখে চাওয়া গেল
শয্যায় শেষে পাওয়া গেল

মনে কর সব পাওয়া গেল
যত কিছু ছিল চাওয়া গেল
.
মনে হবে হেরে যাওয়া গেল ॥

এইখানে শতকে, এখন ॥ শেখ আবদুল জব্বার

এইখানে শতকে, এখন
পরশ্রমজীবীদের অন্ধকার পথহাটা অতীতের ঐশ্বর্যের
সদম্ভ বিলাসে—
সংঘটিত গোপন ঘুণ, উৎকোচ, মুখোশ-বদল…
মানবব্যতীত নগরীকে বড় করবার হাজার প্রচেষ্টা মূঢ় তাদের শিরায়—
জন-মানসের পৃথিবীতে সৃজন করেছে এক গূঢ়-কূট কুয়াশার ভোর ;
যার ভরা তমসার তলে
পথে পথে হাত তুলে জ্বলে ওঠে শাল ও পিয়াল, অন্তহীন মূর্ত প্রতিবাদ—
নদীর জলের ঢেউ—মানুষের চেতনায়—সব তীর ভেঙে ভেঙে
গড়ে তুলে দিতে চেয়ে
হরিৎ-প্রদেশ
অন্ধকার, আরো বড় অন্ধকার ভাঙে আজ মুক্তপ্রাণ মানুষেরা জ্যোতির্ময়
বলয়ে বলয়ে।

পাখি প্রজাপতি আর নিসর্গের প্রিয়শোভা অন্ধকারে মিশে গিয়ে
অন্ধকার হয়ে গেছে,
এ ভোরে চতুর্দিকে চোখে চোখে বেদনা-শিশির,
এবং জীবন ঢের ব্যথার প্রহারে, চেতনার আরো বড় ঝড়ে
কী আলো চেয়েছে সে, কোন্ দূর দেশ, সংবর্তের গানের ভিতরে
নিজের শরীর আজ নিজেই খণ্ডিত করে নীতি-নিয়মের বিষ্ণুচক্র দিয়ে ;
আর ঢের গড়ে তোলা অন্ধ-শত নীতি-পীঠস্থান—
মানুষের হৃদয় ও মানুষের চেতনাকে বিকলাঙ্গ করে মানুষেরা
চাইছে অজেয় হতে, সময় ও মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজন হতে—অনশ্বরতার বোধ
তাদেরও বেঁধেছে বুকে
প্রিয়ার মতন।

যদিও বিপন্ন রাত্রি, নেকড়ে হাওয়ার দাঁত, আরো বড় গূঢ় অন্ধকার
তাদের হৃদয়ে এনে দিয়েছে বিধ্বংসী ঘুন,
তবু মানুষের প্রচেষ্টার অনেক আলোক পথে চোখ তুলে জ্বলে আছে,
বুলভার, বাতাসের বনে—অনেক গানের গলা রয়ে গেছে, ঝিঁঝির রেয়াজে
যেখান থেকে, মহাসাগরের ভোরে জাগবে নতুন আলো—
শুভ্রকোমল আলো
মহামুক্ত মানবিকতার।

উল্লসিত অতীতের উলঙ্গ পাশবিকতা থেকে
আজকের নবসূর্যে আলোকের যত রশ্মিপাত—শান্তির প্রসার আর
ঔজ্জ্বল্য প্রসার—
করে করে জন-জাতকের লোক-মানসের মানবিক ফুলগুলো ফুটিয়েছে
গাঢ় মমতায়,
সৌগন্ধের দীর্ঘপথ প্রান্তর প্রদেশে আজো তাই জন্মেষ্ণু
নবজাতকের লোভে উন্মুখ হয়ে আছে,
অফুরন্ত পৃথিবীর সবুজের লাবণ্যের সমারোহ পেতে।

নবীন এ বিপর্যয় উত্থিত বাস্তব থেকে, সর্বঘটে, মথিত সত্তার কেন্দ্রে
এবং নিসর্গেও প্রসারিত, প্রতিহত, প্রতিহত, প্রতিহত হতে হতে শেষে
অতীত প্রয়াণের বিম্বিত ম্লানিমার বুক চিরে কেবলই মানব জেগে ওঠে
সীমাহীন সময়ের রৌদ্রের ভিতরে।

এইখানে শতকে, এখন
চতুর্দিকে উজ্জ্বলতা তবু এই উজ্জ্বলতা পৃথিবীর নয়;
এখন নবীন ঊষা, তাই এই ঊষাভাস পৃথিবীর বলে মনে হয়!
এবং মানুষ আজো হৃদয়ের রোগে, বিশাল অস্তিত্ব চেয়ে একাকার
হতে যেতে যেতে
কেবলই শুনছে সেই মহাসাগরের গান;
যেখানে কড়ি পাহাড়, সজীব শঙ্খের স্তূপ, ফেনিল জলের ঢেউ,
মহামুক্ত সমবেত প্রাণের মাতন;

গড়ে দেয় মহাদেশ, সবুজ ঘাসের দ্বীপ, এনে দিতে সূর্যের সোনা-প্রস্রবণ।

দীক্ষিতের অভিজ্ঞান ॥ অশোক মুখোপাধ্যায়

কবে তাকে দেখেছিলুম
ঠিক মনে পড়ে না।
যেন এক রাত্রির অন্ধকারে
যখন ঝিঁঝিঁর শোকাহত ক্রন্দন
দিবসের মৃত্যুকে চিহ্নিত করছে।
কিন্তু যদি তাই হবে
এত দীপ্তি, এত ঐশ্বর্য কেন আমার স্মৃতিতে ?

না, মনে হয় তাকে দেখেছিলুম
দুপুরের অগ্নিঝোরায়,
যখন আমাকে দীক্ষিত করার জন্য
সে দু হাত বাড়িয়েছিল।

কিন্তু যদি তাই হবে
এত রমণীয়তা, এত আনন্দ কেন আমার চেতনায় ?

এখন আমি জানি
অন্ধকারে নয়, খররৌদ্রে নয়,
আমি কোথাও তাকে দেখিনি,
দেখব না,
তাকে দেখা যায় না।
আমার শোণিতে তার জন্ম,
আমার পৌরুষে তার পদচারণা,
আমার দীপ্র অঙ্গীকারে তার অবয়ব,
জনারণ্যের স্তব্ধতায়
তার কণ্ঠ।

কান পেতে শোনো
সে মাটির ওপর হাঁটছে ॥

বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব

দেবেশ রায়

"হ্যালো, হ্যাঁ আমি, হ্যাঁ।" পা চুলকোতে চুলকোতে কথাগুলো শুনতে লাগলেন বটা সান্যাল। গায়ের মোটা গরম চাদরে প্রায় পা পর্যন্ত ঢাকা। শোনার সময় তার মুখরেখার কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। পথ দিয়ে মাইক ফুঁকতে-ফুঁকতে গেল, তখন বটা সান্যাল বার কয়েক পরপর জিজ্ঞাসা করলেন "অ্যাঁ, কি? ধুত্‌তোরি।"—মাইকটা একটু অস্পষ্ট হতেই আবার প্রশান্ত হয়ে বললেন—"বলো।" তারপর কড়ে আঙুল দিয়ে খালি কানটা চুলকোতে লাগলেন।

"আই-টি-পি-এ-তে (ভারতীয় চা-শিল্পপতিদের সংস্থা) ফোন করেছ? অ্যাঁ, আচ্ছা, নিমাইদাকে একটা ফোন, আচ্ছা, আমি-ই করব, ম্যানেজারকে একটা ফোন করে, আচ্ছা দাঁড়াও নিমাইদা কী বলেন আগে, আচ্ছা দরকার নেই, পে-ডে কবে, আজ মঙ্গলবার, এখনো বুধ-বিষ্যুদ-শুক্কুর, বুধ-বিষ্যুদ দুদিন বাকি আছে, বাগানে ফোন করে বলে দাও, যে, শুক্কুরবারে এবার পেমেণ্ট নাও হতে পারে," ফোনটা কানে রেখেই বোতাম টিপে দিলেন সান্যাল। বোতাম ছেড়ে একটা নম্বর চাইলেন, তারপর এই কথাগুলি বললেন, "কে? ও, আমি বটাদা বলছি, নিমাইদা কোথায় রে? একটু দে তো, বল্‌ যে, আমি চাইছি"—ফোন ধরে রেখেই চিৎকার করে বললেন, "ঠাকুর এক কাপ চা দাও।"

যে ঘরে বসে বটা সান্যাল কথা বলছিলেন, সে ঘর থেকে সম্মুখে বড় রাস্তা এবং পেছনে রান্নাঘর সমান দূরত্বে। "হ্যালো, হ্যালো, নিমাইদা, আমি বটা বলছি। ব্যাঙ্ক তো আজ বলে দিল—"

"........"

"হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক, কদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তবে একেবারে বন্ধ করে দেবে ভাবি নি, এখন করি কি? দুদিন বাদে বাগানের পে-ডে, হ্যাঁ-হ্যাঁ তা করে দিতে বলেছি, কিন্তু এ-সপ্তাহ না-হয় গেল, তারপর?"

"........."

"না, এখন ইউনিয়ন কিছু করতে পারবে না। আই-টি-এ-তে (বিদেশী চা-শিল্পপতিদের সংস্থা) ফোন করেছিলেন না কি ?"

"...... .."

"দেখলেন, সায়েব ব্যাটারা টাকা পায় ঠিকই, আর ওদের বাগানগুলো তো যুদ্ধের একেবারে সামনে।—আচ্ছা, রাত্রিতে কথা হবে—নিমাই দা, ফ্যামিলি ট্যামিলি শিফ্‌ট্‌ করতে—"

"........."

"হেঁ হেঁ হেঁ আচ্ছা আচ্ছা, আ—চ্ছা" অপর দিকের রিসিভার রাখার শব্দ শোনা যাবার পর বটা সান্যাল ফোনটা নামিয়ে রেখে, হাতটা ফোনের ওপর রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইলেন, সিনেমার বিজ্ঞাপন লাগানো গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আবার মাইক, ঠাকুর এসে সেক্রেটারিয়েট টেবলটার ওপর চা রেখে চলে গেল, কিছু চা কাপ থেকে ডিসে ছল্‌কে পড়ল, দু-এক ফোঁটা ছাই-ছাই রঙের রেক্সিনের ওপর। হাতে যে চা লেগেছিল, যাবার সময়, ঠাকুর পর্দায় মুছে গেল। ফোনটা তুলে খুব অন্যমনস্কভাবে একটা নম্বর বললেন সান্যাল। "নরেন আছে নাকি ?"...। "নরেন, শুনছ তো সব ? নাও সম্পত্তি সামলাও এবার। শালা সর্বস্ব যাবে—কী ?" "......।" "রাখ্‌ তোর রসিকতা। পরশুদিন পে-ডে। এবার না-হয় পেমেণ্ট বন্ধ করলে, সামনের বার ? কী, তার পরের বার ?" "... ...।" "অ্যাঁ তাই নাকি ?" ফোনে মুখ রেখে বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন সান্যাল, "আমাদের বাগানে তো সে পথও নেই, ইউনিয়নও তো কোম্পানির, কাকে পুলিশে ধরাবি ? হ্যাঁ শোন, নিমাইদার বাগানের কী ব্যাপার জানো ? ও। না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। তবে কথাবার্তা শুনে মনে হলো যে ওঁকে এখনো সমস্যাটা ফেস্‌ করতে হয় নি ?" "......।" "না, না, আমি তুলনা করছি না। তা তো ঠিকই, ওঁদের তো আর অভাব নেই। দরকার পড়লে নিজেদের পকেট থেকেও বাগান চালাতে পারবে, আমাদের-ই বিপদ। আচ্ছা, বিকেলে আসিস কিন্তু—।" আগের দু জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে যে দমে যাওয়া ভাবটা এসেছিল সেটা তৃতীয় জনের সঙ্গে বাক্যালাপের পর কেটে গেল। সেই আরামে চায়ের কাপটা তিন চুমুকে খালি করে দরজায় দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন বটা সান্যাল। রোদ এসে পড়েছে লম্বা শরীরটাতে। চেঁচিয়ে

ডাকলেন—"বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ।" নীরবতার শেষে, বড় রাস্তা থেকে এই বাড়ির সীমানায় ঢুকলে ডানপাশে ও বাঁ-পাশে যে ঘরগুলো আছে তার একটা থেকে, একটি যুবক কম্বল গায়ে বেরিয়ে এলো। "কী রে, টাউনের ট্রাকগুলো ছেড়েছে ?"

"না, ছাড়বে কোথায়, আরো সব নিচ্ছে—"

"প্রাইভেট গাড়ি নেবে নাকি কিছু শুনেছিস—"

"জিপ নিতে পারে, কার-টার নিয়ে কী করবে ?"

"গাড়ি এখন বের করবি না—বুঝলি ? কিছুতেই না—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবি খারাপ আছে—"

"বড়মা বলছিলেন আজ সিনেমায় যাবে—"

"আহা-হা, সিনেমায় যাবে ? সব বড়লোক, সুখের পায়রা সব, রিক্সা করে যেতে বলবি, গাড়ি বের করবি না—"

বটা সান্ন্যাল সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরগুলির একটি থেকে বিশ্বনাথ বেরিয়ে এসেছিল, তার বারান্দায় গিয়ে হেলান দেওয়া বেঞ্চে বসলেন। ওখানে বসলে কোমর পর্যন্ত রোদ আসে। লোকজনও এখন আসবে।

এই বটা সান্ন্যাল একজন শিল্পপতি। চা-শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে, তিনি তার পতিত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমানে চার-ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যে কথোপকথন করলেন তার প্রেক্ষিতে: চীন-ভারত যুদ্ধ, ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাগানকে টাকা দিতে সঙ্কোচ, অথচ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দেশী মালিক নিমাই ঘোষ এবং সাহেব কোম্পানিগুলি টাকা পাচ্ছে, বাগানের ট্রাক সব মিলিটারি নিয়েছে, ফলে চা-বাক্স স্টেশনে পৌছচ্ছে না।

"কী বাবু এবারের শীতটা যে বৃথাই চলে গেল" বলে উপেন নাপিত এসে মেঝেতে উবু হয়ে বসে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাত পরস্পরের ওপর রেখে বসল। বটা সান্ন্যাল তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উপেন বুঝতে পারছিল সান্ন্যাল তাকে দেখছেন না, তবু বলে চললো—"বাবু, যুদ্ধটা বেশ জোরই লাগে বলে পসন্দ হয়। সংবাদপত্রের বিবৃতিতে মনে হয় প্রায় গরু-খেকো বাঘের মতো চীনাগণ উদ্যত। তবে সব বোধহয় সত্যি নয়—"

"কী উপেন, বুড়ো বয়সে কী জেল খাটবার ইচ্ছে হয়েছে ?"

"কেন বাবু ?"

"এই যে বলছ, খবরের কাগজের সব কথা সত্যি নয়—"

"না না ছি ছি বাবু, কলিকালের ভাগবত হচ্ছে সংবাদপত্র, তাকে অবিশ্বাস করার ন্যায় মহাপাপ ছি ছি—"

"হ্যাঁ, তোমার এতো কথা বলার বদভ্যাস, যে কবে যে জেলে যাও—"

"তা গেলে যাব বাবু, আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে উপেনের চলে যাবে। আর যদি জেলেই যাই তবে পাপী-তাপী—কমিউনিস্ট চোর ডাকাতগণকে ইষ্টনাম শোনাতে পারব—দেখবেন, ওখানেও আমি অষ্টপ্রহর করবো—"

"এই বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ" আবার বিশ্বনাথ এসে দাঁড়ালো, "যা তো মণ্টুবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তো"—বিশ্বনাথ চলে গেলে উপেনের দিকে তাকিয়ে সান্যাল বললেন, "দেখো উপেন, তুমি না ইলেকসনের সময় কমিউনিস্ট ছিলে, এখন আবার—"

"বাবু, ঐ-টাই একটু রহইস্য"

"কী উপেন, তোমার আবার রহইস্য কি ?" নারায়ণবাবু এসে বেঞ্চে বসতে বসতে বললেন।

"রহইস্যটা হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ মেনন, দেশরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে অপসারণ করবার পক্ষে কী যুক্তি ছিল ? না, তিনি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট, কী বাবু, তাই না ?"

"তুমি দেখি সাংঘাতিক পণ্ডিত, তা হলোই বা, তাতে কি ?" নারায়ণবাবু বললেন।

"হলোই বা কি বাবু, বলুন আমার কথা ঠিক কি না, কৃষ্ণমেনন কংগ্রেসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট, ঠিক কি না—"

"যা যা বক্‌বক্ করিস না—" বটাসান্যাল এবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "তোর অতসব দিয়ে দরকার কি ?"

"দরকার আছে বাবু বলেন বাবু, আপনি বলেন, ঠিক কি না—"

"তুই যা তো উপেন—" আবার ধমক দিলেন বটাসান্যাল। উপেন বলল—"আপনি আগে বলেন বাবু", বলে নারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বললাম তো হ্যাঁ" নারায়ণবাবু বললেন। সম্মুখ দিয়ে এক চাকর যাচ্ছিল তাকে বটাবাবু বলে দিলেন, "এককাপ চা দিয়ে যাস্ তো—"

"এই দেখুন, আপনি এখানকার কংগ্রেসের নেতা, আপনিও এরূপ বললেন।

তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে যদি প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট থাকতে পারে, কমিউনিস্টের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী থাকতে পারবে না কেন? আমি কমিউনিস্টের মধ্যে সেইরূপ প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী ছিলাম, নির্বাচনের সময়—"

"আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, তোমার ঐ যাত্রাদলের বিবেকের মতো কথাবার্তাগুলি থামাও তো। ব্যাটা একেবারে বাংলার প্রোফেসর। যা এখন, কাজ আছে—" বটাসান্যাল উপেনকে থামিয়ে দিলেন।

"বাবু, যে কারণে আসা, সেইটি নিবেদন—"

"নিবেদন করতে হবে না, বল—"

"গত বৎসর শীতকালে নবগ্রহ সম্মেলন উপলক্ষে কমিটি করলেন, সপ্তশতী যজ্ঞ করলেন, আমরা একমাসব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তন গেলাম। এবার কি কিছুই হবে না বাবু?"

নারায়ণবাবু হেসে উঠলেন। বটাসান্যাল বললেন—"যা, যা, এখন ওর কীর্তন গাইবার সময়,—যেদিন বোম পড়বে, সেদিন বুঝবে—"

বিশ্বনাথ যাকে ডাকতে গিয়েছিল সেই মণ্টুবাবু এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু দূরে। তার দিকে তাকিয়ে বটা সান্যাল বললেন "এরিয়ার বিলের ফাইলটা একটু আনুন তো।" মণ্টুবাবু অদৃশ্য হলেন।

"সেটাই তো সমস্যা বাবু, লোকে আপনার নামে নিন্দাবাক্য করবে তা শোনার আগে যেন আমার দেহরক্ষা হয়—"

বটাসান্যাল বুঝলেন উপেনকে নিরস্ত করা যাবে না। একটা পা বেঞ্চির ওপর তুলে বললেন, "ব্যাটা পণ্ডিত—"

উপেন বলে চললো—"বাবু, কুলোকে কুকথা বলবে যে—গতবছর যুদ্ধ নাই, দাঙ্গা নাই, বন্যা নাই, আগুন নাই, তবু সান্যাল মশাইয়ের দল অষ্টপ্রহর করল শান্তির জন্য—আর এইবার যে এতো যুদ্ধ, এতো দাঙ্গা, এতো হত্যা—সান্যাল মশাইয়ের কমিটির দেখাই পাওয়া যায় না—সে আমার সহ্য হবে না—"

"ওঃ সহ্য হবে না—সান্যাল মশাইয়ের দল! আমি তোদের অধিকারী, না?—"

"বাবু আপনি ঢাকী, আমরা ঢাকের চামড়া। যাক্ বাবু, আমি উঠি, আপনি তো বললেনই বাবু এ অধম যাত্রাদলের বিবেক। আপনাকে সব জানিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য।" দুই হাত মাথার ওপর তুলে আড়মুড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বলল—"তাছাড়া বাবু এই শীত—সারাদিন কাজকর্মের

শেষেও সারারাত গান গাই, শরীরটা ওম্ থাকে, দশে মিলে রাত জাগতে কোনো ব্যথা লাগে না, আর বাড়িতে যে কাঁথাটা বাঁচে সেটা কেউ গায় দিতে পারে, আপনারা হাত ঝাড়লে বাবু, আমাদের কোঁচর ভরে যায়-- ”

“তা মাড়োয়ারিদের কাছে যা না, ওরা যদি চাল দেয়, বাকি খরচ না হয়—”

“বাবু চালের মন সাড়ে তিরিশ, আজ সকালে, কাল বিকালে ছিল আটাশ বারো—এই বাজারে কেউ চাল দেয় ?”

“আরে ব্যাটা সবার কাছে তাড়া খেয়ে আমার কাছে এসেছ—”

“আপনিও তো তাড়িয়েই দিলেন বাবু—ভেবে দেখেন, সংবাদ দেবেন দরকার হলে, একটা অষ্টপহর জমতো কিন্তু খুব বাবু, ধরেন, মোটে সাতদিন।”

“যা যা” বটা সান্যাল নারায়ণের দিকে তাকালেন। উপেন বোধহয় গেল। “নারায়ণবাবু, আপনারা বিপদ বাড়াচ্ছেন। আপনি কংগ্রেসের এ রকম একজন লোক হয়ে ফট্ করে বলে দিলেন যে মেনন—” বটাসান্যালকে বাধা দিয়ে নারায়ণবাবু বললেন—“রাখুন, ও ব্যাটা মনে রাখতে গেছে—” “আপনি নাপিতের বুদ্ধির কাছে হেরে গেলেন মশাই। ও যতই অষ্টপ্রহর কেত্তন গান করুক আর আপনার আমার কাছে এসে বক্তৃতা মারুক ওদের কলোনিতে ও এক মস্ত পাণ্ডা—”

“আচ্ছা, কমিউনিস্ট-ই হোক্ আর যাই হোক্, এখন আর তেল খাটানো চলবে না, আর মশাই দেশের লোককে তো অত বোকা ভাবলে চলে না, মেনন সত্যিই অন্যায় করেছে, বলেছে, তাকে সরিয়েছি আমরা। দেশের থেকে তো একজন মানুষ বড় নয় মশাই। সে নেহেরু-ই হোক্ আর যাই হোক্—”

“থামুন মশাই থামুন, আপনি আমার সঙ্গে এ সব কথা বলবেন্ন না। এরপর তো বলবেন পাকিস্তান ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গে আরো কষে জড়িয়ে পড় এই তো। আপনাদের কী মশাই। আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে পলিটিক্স করছেন, তখন আর কারো কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে করবেন। জানেন” হোঁচট খেয়ে থামলেন বটাসান্যাল, তারপর বললেন, “জানেন কলকাতার এক ভদ্দরলোক আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে তাদের কোম্পানিকে আর ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে না,—অথচ ব্রিটিশ কোম্পানি টাকা ঠিকই পাচ্ছে—”

“তা ব্যাঙ্কের ব্যবসা, ব্যাঙ্ক বুঝবে—যেখানে লগ্নী ধরলে—”

“বাদ দেন, বাদ দেন, ব্যবসা-পত্র তো আর করছেন না, কী করে বুঝবেন কী ব্যাপার, বলেন—”

"আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম।"

নারায়ণবাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হলেন বটাবাবু।

"পরশুদিনের পরদিন তো মিটিঙ, মানে শুক্রবার" বটাসান্যালের মনে পড়ল এই শুক্রবারের ব্যাপার নিয়ে সকাল থেকে, পে-ডে, ইত্যাদি, "তা মিটিঙটা ঠিক কংগ্রেসের নামে করা ঠিক হবে না। সবাই মিলে হচ্ছে এইরকমভাবে করাই এখানকার সিচুয়েশনে উচিত হবে। সুরেনদা, নিমাইদা, ভোলাবাবু—এঁদের সবারই এই মত। সেজন্য আমরা নিজেরা ঠিক করেছি চার-পাঁচজন মোটামুটি নাগরিক গোছের লোক নিয়ে মিটিঙটা আহ্বান করব।"

"নিমাইদার সঙ্গে তো আমার আজ সকালেও কথা হয়েছে, উনি তো কিছু বললেন না—"

"না, একটা ব্যাপার আছে। মানে কে কে সভার কনভেনর হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দুটো পরামর্শ আছে। একজন মাড়োয়ারিকে, এবং অন্য পার্টির মোটামুটি একজনকে রাখতে হবে। সেটা ঠিক হয়েছে শর্মা আর ফনিবাবু। এখন আমাদের মধ্যে কে কে যাবে? কেউ কেউ বলছিলেন নিমাইদা আর ভোলাবাবু-র নাম দিতে। তাতে, কারো কারো, ধরেন আমারও, আপত্তি। মানে ভোলাবাবু আর নিমাইদা দু-জনই কংগ্রেসের সঙ্গে এতো জড়িত যে আমরা যেটা করতে চাইছি—সেটা ঠিক হবে না। সেজন্য আমরা বলছিলাম, আপনি আর ভোলাবাবু যদি হন তবে সব দিকই বজায় থাকে—"

বটা সান্যাল সোনার দোকানির মতো ওজন করে কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু পুরনো রীতিতে ধাতস্থ দোকানীর মতো নতুন রীতির হিসাবনিকাশে কী রকম বেসামাল হয়ে পড়লেন। চীন-ভারত যুদ্ধের মতো একটা ঘটনায় মিটিঙ হবে, সেই মিটিঙে তাঁকে কনভেনর করতে চাইছে। অথচ গেল বছর একটা স্কুল কমিটির মেম্বার হতে চেয়েছিলেন তিনি, নমিনেশনই পেলেন না। কবে ছ, সাত, কী আট বছর আগে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নমিনেশন পেয়েছিলেন, তাতে গু-হারা হেরেছেন। এখন এরা এতো···বটা সান্যাল সন্দিগ্ধ হলেন। শর্মা, ফনিবাবু, ভোলাবাবু, এই তিনজনের নামের সঙ্গে তার নাম আসতেই পারে না, অথচ···। তাহলে ব্যবসায় তারও লাভ হচ্ছে এই সময়।

"দেখুন, নারায়ণবাবু, আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে—আচ্ছা

আপনি একটু বসুন, আমি আসছি," বলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে কে বক্তৃতা করবে ?"

নারায়ণবাবু চারজনের নাম বললেন। "এদের মধ্যে কংগ্রেস কে মশাই ?"

"আরে ঐ হলো। বোঝেন সবই। এরা তো কংগ্রেসই ছিল বা রিটায়ার্ড গবমেণ্ট..."

বটা সান্যাল চলে গেলেন। যেতে যেতে ভাবলেন নারায়ণবাবু টের পেয়েছেন যে তিনি নিমাইবাবুকে ফোন করতে যাচ্ছেন। টের পাক। নিমাইদাকে না জিজ্ঞাসা করে তো আর রাজি হওয়া চলে না।

"হ্যালো। নিমাইদা। হ্যাঁ, আমি বটা। শুনুন, নারায়ণবাবু এসে বলছেন পরশুদিনের কী একটা মিটিঙ হবে না, ওতে ভোলাবাবু, শর্মা, আর ফনিবাবুর সঙ্গে আহ্বায়ক হতে" তারপর চারটি নাম করে বললেন—"এঁরা বক্তৃতা দেবে—"

"......।" অপর পক্ষের রিসিভার নামাবার শব্দের পর বটাসান্যাল রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। নিমাইদা বললেন রাজি হতে। তারপর সেই ফোনের ওপর হাত রেখে মিনিট কয়েক ভাবলেন, এই পদের জন্য এতো সব বড় বড় প্রার্থী থাকতে তাকেই পদস্থ করার পেছনে কী কোনো অভিসন্ধি আছে, বোকা বলে নিজের মহলে তার দুর্নাম আছে, অন্যেরা বুদ্ধিবলে যে পদের বিপদ এড়িয়ে যাচ্ছে তিনি কি বুদ্ধিদোষে সেদিকেই যাচ্ছেন। বটাবাবু একটু দ্বিধা সঙ্কোচে পড়লেন। ভেতরে বাথরুমে গেলেন। ফেরার সময় দেখেন ছোটমেয়ে কলে হাত ধুচ্ছে। "এই বেণু, ধর্ তো" বলে দুটো আঙুল মেলে দিলেন, মেয়েটি একটি ধরল। হ্যাঁ। বাইরে যেতে যেতে বটা সান্যাল ভাবলেন যে নিমাইদা রাজি হতে বলেছেন, এখন রাজি না হলে নিমাইদা খেপে যাবে, এদিকে ভয়ও করছে।

"আমাকে এ সব প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে না আনলেই পারতেন নারায়ণবাবু। গেলবার সপ্তশতী যজ্ঞ কমিটির সেক্রেটারি হতে আমার তো কোনো আপত্তি ছিল না। আসলে ধর্মকর্মের কাজ নিয়েই থাকতে ভালোবাসি।"

"আরে মশাই, এও তো ধর্মকর্মের মতোই, স্বর্গাদপি গরীয়সী, কই চা দিতে বললেন—"

"এই চা দিয়ে যা" চিৎকার করলেন বটাসান্যাল "তা যান, নামটা লাগিয়ে যা করার করবেন, তবে দেখবেন মশাই,"

"আচ্ছা-আচ্ছা, কাজ আর কী, বিকেল নাগাদ কিছু পোস্টার সিনেমা হাউসের ঐ যারা পোস্টার লাগায় তাদের দিয়ে দেব, আর কিছু লিফলেট আর মাইক দিয়ে ছেলেছোকরাদের লাগিয়ে দেব। তবে শুক্রবারদিন সকালে গাড়িটা লাগবে"

"গাড়িটা আবার শুনছিলাম খারাপ আছে—এই বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ—"

কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশ্বনাথের আগমন, "গাড়িটা কি চলবে?"

"না খারাপ আছে, ও-সব ঠিকঠাক করতে হবে," ইঙ্গিত বুঝে কথা বলে বিশ্বনাথ যোগ করে দিল "দু চারদিন লাগবে—"

"তা তিনদিন তো এখনো হাতে আছে, লাগবে তো শুক্রবার সকালে" বলে উঠে নারায়ণবাবু "চলি এখন, ও চা আর আসলো না আজ" বলতে বলতে চললেন। বিশ্বনাথ একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ বটাবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

মণ্টুবাবু-র অভ্যাস আছে প্রয়োজনের সময় ছাড়া অদৃশ্য অথচ ঘনিষ্ঠ থাকার। সুতরাং নারায়ণবাবু-র প্রস্থানের পর তিনি একটা ফাইল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কাজটা এখনই না চুকিয়ে ফেলতে পারলে এরপর বটাবাবু স্নানাহার করতে যাবেন, অর্থাৎ বেলা দেড়টা বাজবে। একটা অবশ্য বিকল্প ছিল এই যে, মণ্টুবাবু একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে পারতেন, কিন্তু দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে যৌগিক আসন করতে করতে স্মৃতিকথা বলার এক অভ্যাস আছে বটাবাবু-র, পারতপক্ষে তার পাল্লায় কেউ পড়তে চায় না। কিন্তু ফাইল নিয়ে এসে বটাবাবুকে যেরকম তন্ময় হয়ে বসে থাকতে দেখলেন, তাতেই খানিক আত্মস্মৃতির ভাব দেখে প্রমাদ গণলেন। সেই কারণেই ফাইলটা নিয়েই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মণ্টুবাবু— "বটাদা, এরিয়ার তো সব্বার নামেই আছে—"

"অ্যাঁ? সবার নামেই বিল করুন, হ্যাঁ, সবার নামে"

"ভারতী, মংলাঝোড়া, সিম্‌সিম্—এদের নামেও?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সবার নামে।" এরপর খানিকক্ষণ নীরবতা। বটাবাবু-র লুব্রিকেটিং তেল, মেশিনারির স্পেয়ার পার্টস, এবং স্টেশনারি জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবসা আছে। বটা সান্যাল ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী কথাটির সংজ্ঞা যদি এই হয় যে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলার জাঁতাকলে পিষে রস বের করা। তার এই ব্যবসায়ী

চরিত্রটি যখন শিল্পপতিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তাঁকে প্রায় তান্ত্রিক পুরাণ বর্ণিত সেই উদ্ভট দেবতাদের মতো মনে হয় যারা নিজের মুণ্ডু নিজে চিবিয়ে, সেই চর্বিত-অংশ দিয়ে নতুন মুণ্ডু বানিয়ে আবার তা চিবোয়—এবং এইভাবে স্বমুণ্ড-চর্বন এবং স্বমণ্ড-নির্মাণের চক্রাকার খেলা খেলতে থাকে। অর্থাৎ ডুয়ার্স অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগানের তেল, স্পেয়ার পার্টস ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির একমাত্র সরবরাহকারী হচ্ছে সান্যাল এ্যাণ্ড সন্স, যার ডিরেক্টর হচ্ছেন বটা সান্যালের কলেজ পাঠরত পুত্র, বড় কন্যা, এবং স্ত্রী। বটাসান্যাল সব কোম্পানিকে বাকি টাকা শোধ করার চিঠি দিচ্ছেন। মুশকিল বাধলো-যে তিনটি কোম্পানির নাম মণ্টুবাবু করলেন তাদের নিয়ে। ওগুলো নিমাইদার। নিমাইদা যদি বুঝে ফেলেন চারপাশের অবস্থা বুঝে বটা সান্যালও নিজেকে সামলাচ্ছে। ঐ তিনটি কোম্পানীর বিশ বিশটা বাগান, তাছাড়া নিমাই ঘোষের সঙ্গে দড়ি বেঁধে-ই এতোদূর পর্যন্ত এসেছেন বটাসান্যাল। বটা সান্যাল উঠলেন, "রায় ঝোড়াকেও দেবেন" বলে ভেতরের দিকে রওনা হলেন। রায় ঝোড়া সান্যালের নিজের বাগান।

ঘণ্টা দুই পরে মণ্টুবাবু ফাইল নিয়ে বটাবাবুর অপেক্ষায় বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। বটাবাবু-র খাওয়া হয়েছে, এইবার একটি পান খেয়ে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি এসে বিরাট সোফাটার ওপর বসবেন। এবং তারপর বটা সান্যালের জীবনী, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সান্যাল-মুখাৎ বাণী শ্রবণ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কমপক্ষে আড়াইটা তিনটে, আবার আসতে হবে সন্ধ্যাবেলায়।

যে ঘরে বসে সকালবেলায় বটাসান্যাল ফোন করছিলেন, সেই ঘরেই মণ্টুবাবু বসে।

ঘরটা বেশ বড়, কিন্তু, বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি বিরাট সোফা, দুটি কৌচ, এবং চারটি ছোট টেবিলের ভিড়ে ঘরটিকে ছোট দেখায়। ঘরের দেয়ালগুলি পনের ইঞ্চির। ছিল একটি মুসলমান বাড়ি, দাঙ্গার পর সান্যাল পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে নেন। পেছনে বিরাট জমি। সামনে বড় রাস্তার ওপরের দোকানপাট থেকে মাসে প্রায় হাজার টাকার ওপর ভাড়া পান। বাড়িটি কেনার পর প্রচুর শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও সংস্কার হয়েছে, কেননা দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে একটি শিশু ও একটি বৃদ্ধাকে খুন করা হয়। বহু পরিবর্তনের পরও বাড়িটার বাইরের চেহারায় কোনো বদল আসে নি।

বাইরের এই ঘরটার দেয়ালে, জানলা দবজাব ওপব, কযেকটা ছবি। একটি রামকৃষ্ণ পবমহংসেব, একটি ছবি নেতাজাব—প্রাচীনকালেব বাবগণেব মতো আকৃতি, কোমরে তলোয়াব, একটি ছবি সান্যালেব মৃত পিতাব তৈলচিত্র, মূল্য একশত সত্তব টাকা, একটি ছবি সান্যালেব মৃত ভ্রাতাব তৈলচিত্র, মূল্য একশত বিবাশি টাকা, দুটি ছবি—একজন কেন্দ্রীয মন্ত্রীব সঙ্গে নিমাই ঘোষ এবং উভযেব মাথার ফাঁকে পশ্চাদ্বর্তী বটা সান্যালেব উৎকণ্ঠ মুখ, একটি ছবি—সান্যালেব জামাতাব। দবজায় পর্দা ঝুলছে কুঁকডে মুকড়ে, তেলচিটে ও বিবর্ণ।

বটা সান্যাল প্রবেশ কবলেন, "কী খবর মণ্টুবাবু?" যেন মণ্টুবাবুকে তিনি আশাই কবেন নি। বটা সান্যাল সোফাব ওপব বসলেন, তাবপব বীরাসন হলেন, তাবপব হাত বাডিযে প্যাকেট থেকে একটা সিগাবেট বের করে ধবালেন। এখন বটা সান্যালেব সম্মুখে দেযাল, পেছনে মণ্টুবাবু, এবং সান্যাল ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ঐ ভাবে কথা বলবেন, মণ্টুবাবুকে শুনতে হবে, হুঁ দিতে হবে মণ্টুবাবুব বহুদিন ইচ্ছে হযেছে বলে, কথা বলতে হলে এদিকে মুখ কবে বসুন।

মণ্টুবাবু হাত বাডিযে দিলেন, বিল। সিগাবেট ধবা আঙুলেব সঙ্গে বুডো আঙুল জডো কবে কাগজগুলো ধবলেন সান্যাল। মণ্টুবাবু পেন খুলে এগিয়ে দিলেন, সান্যাল ধবলেন, মণ্টুবাবু মুহূর্তেব জন্য ভাবলেন জীবনীটা বোধহয় আর শুনতে হলো না, কিন্তু সান্যাল পেনটা খোলা অবস্থাতেই পাশের ছোট্ট টেবিলে নামিয়ে বেখে প্রথম বিলটার ওপর চোখ বোলালেন—"বুঝলেন মণ্টুবাবু, এই শহবে জন্মেব পব থেকে আছি, পঞ্চাশ বছর, কতো দেখলাম।" মণ্টুবাবু গিয়ে পেছনেব সোফায বসলেন। সাহস থাকলে চোখ বন্ধ করতেন [illegible] হয়ে গেছে মণ্টুবাবুব, খুব দবিদ্র, বাবা ক্লার্ক, দাদা, মৃত ছবির [illegible] নির্দেশ, পডাশুনা, কলকাতা, বি. এ, ব্যবসা, চাকরি, ব্যবসা, চাকরি, [illegible] পব এই শহরে প্রত্যাবর্তন—

"এটা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল মণ্টুবাবু যে এই শহরে যদি [illegible] গাড়ি নিয়ে ফিরব। আর ফিরেওছিলাম তাই। [illegible] একটা ছোট্ট এজেন্সি নিয়ে, পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে [illegible] পারলাম—বলুন"

ইন্সিওরেন্স। ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা দিয়ে [illegible]

ব্রাঞ্চ। লাইফ। মোটর, ফায়ার। নিমাই ঘোষ। ঘোষ কনসার্নের লেজুড় হয়ে এখন মোটর-ফায়ার ইনসিওরেন্স, তেল-মেশিনের সাপ্লাই, চা-বাগান—এই তিনদিকের ব্যবসা।

"সেদিন আমাকে কেউ পাত্তা দেয় নি মণ্টুবাবু, আর আজ পরশুদিন যে পাব্‌লিক্ মিটিঙ হবে তার কন্‌ভেনর করতে আসে আমাকে ?"

"আপনি কি পরশুদিনের মিটিঙের কন্‌ভেনর হয়েছেন—"

"হ্যাঁ,"

"আর কে কে ?"

বটাসান্যাল বললেন, এবং বলতে বলতে বিকেলে দেয়ালে-দেয়ালে তাঁর নাম-ছাপা পোস্টার মনে মনে দেখলেন। চারজনের মধ্যে তাঁর নামটাই সবচেয়ে শেষে দেবে বোধহয়, তা দিক।

"কেন ?"

"না, এমনি।" মণ্টুবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন।

"কিছু শুনেছেন নাকি ?"—মণ্টুবাবু দেখলেন এই লোকটি হাতে কাজের কাগজপত্র নিয়ে কতো অন্যমনস্ক হবার ভান করছে। অথচ এতোক্ষণ প্রত্যেকটি বিলের প্রত্যেকটি অঙ্ক খতিয়ে দেখেছে। এবং এখন মণ্টুবাবুর কাছ থেকে কিছু তোষামোদ শুনতে চায়। মণ্টুবাবুর কী রকম প্রতিশোধ স্পৃহা জাগলো।

"না, শুনব আর কি ? ক-দিন ধরেই শুনছিলাম চেষ্টা হচ্ছে, তবে, আপনার কাছে আসবে ভাবি নি—"

বীরাসন থেকে নেমে এলেন বটা সান্যাল। বিল কয়টি অতিক্রুত সই করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী শুনেছেন।"

এতো দ্রুত লোকটি সেই হাতের কাজ সেরে নতুন কাজে ঢুকল,—দেখে মণ্টুবাবুর ভালো লাগল। বিলগুলো গুছোতে-গুছোতে বললেন—"না, তেমন কিছু নয়, এখন তো অবস্থা খুব গোলমেলে, কে কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। শুক্রবারের মিটিঙে যারা বক্তৃতা দেবে তারা তো কংগ্রেসের নন, অথচ কংগ্রেসের।' এ মিটিঙে না থাকলে ক্ষতি হতে পারে, থাকলেও ক্ষতি হতে পারে ; না-থাকলে ভালো হতে পারে, থাকলেও ভালো হতে পারে। মানে অনেকে ভাবছেন, এরাই শেষে কংগ্রেসের নেতা হবে, আবার অনেকে ভাবছে এদের গোলমাল থামলেই গবমেণ্ট শাস্তি দেবে। তাই কেউ-ই সরাসরি

থাকতে চান না। শর্মা আর ফনিবাবু তো কংগ্রেসের বাইরে, ওঁদেরই দলের। তাই ওঁরা রাজি হয়ে গেছেন। নিমাইবাবু রাজি হন নি এটা তো আগেই জানা গেছে। ভোলাবাবু রাজি হয়েছেন সেটা আজ সকালে শুনলাম—"

"এতো ব্যাপার নাকি? তবে আমাকে কেন?"

"মানে, আপনি থাকলে নিমাইবাবুর সম্মতি আছে এটা বোঝা যায়—"

"হুঁ" সান্যাল মণ্টুবাবুকে থামিয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা এতোক্ষণে তাঁর বোধগম্য হয়েছে। মণ্টুবাবু কাগজগুলো হাতে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন, "গুডইয়ার কোম্পানির খবর শুনেছেন নাকি?"

"কাল রাত্রিতে নিমাইদা বলছিলেন ওরা নাকি বেচবে না জানিয়েছে—দেখুন না একটু ফোন করে।" ফোনের দিকে এগোলেন মণ্টুবাবু, "আচ্ছা থাক্। আপনি যান্, বিলগুলো পাঠিয়ে দিন—"

মণ্টুবাবুর প্রস্থানের পর রিসিভার তুলে একটা নম্বর চাইলেন।

"হ্যালো, আমি সান্যাল বলছি, আচ্ছা, ঐ গুডইয়ার ট্রানজাকশনের কী হয়েছে বলতে পারেন?"

"………।"

রিসিভারটা নামিয়ে ধীর গতিতে এসে সোফায় বসলেন বটা সান্যাল। এই ভয়টাই তিনি পাচ্ছিলেন। গুডইয়ার কোম্পানি-র একটা বাগান বিক্রি ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল, দু-একদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কথা, সেটা ক্যানসেল্‌ড্ হয়েছে, অর্থাৎ গত ন-বৎসর ধরে ধীরে ধীরে সাহেব কোম্পানিগুলো যে বাগান বেচে দিচ্ছিল, তা বন্ধ হলো, সাহেবরা আরো জাঁকিয়ে ব্যবসা করবে। নিমাইদা আর ভোলাবাবু-র বাগান বাদে আর সব বাগানে টাকা দেওয়া ব্যাঙ্ক বন্ধ করেছে। বেয়াল্লিশ সাল থেকে নিমাইদার সঙ্গে ব্যবসা, আজ নিমাইদা যেন ছেড়ে দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এ-রকম চললে নিমাইদা বা ভোলাবাবুর একজন তার বাগানটা কিনে নিতে চাইবেন। সেইজন্যই ভোলাবাবু নিজের সঙ্গে বটাসান্যালের নাম যোগ করেছেন। সেইজন্যই নিমাই ঘোষ নিজের নামের বদলে বটাসান্যালকে বেচে দিয়েছেন। আর বটা সান্যাল দেখলেন তার নিজের হাতে একটা ছুরি, নিজের বুকে তিনি ধরেছেন, কিন্তু তাঁর হাতটা ধরে তাঁরই বুকের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন নিমাই ঘোষ, ভোলাবাবু আর দুইজনের সন্নিহিত মুখের পেছনে উৎকণ্ঠ ও সহাস্য একটি সাহেবের মুখ। বটা সান্যাল ছুরিটা ভোলাবাবু, নিমাইদা আর সাহেবটার দিকে যদি না ঘোরান তাহলে তাঁর অবধারিত মৃত্যু।

মণ্টুবাবু ও উপেন নাপিতের কথা বটা সান্যালের মনে [illegible]। তারা বোধহয় ছোরাটা ঘোরাতে সাহায্য করতে পারে।

কনস্টানটিন সার্গেভিচ স্ট্যানিস্লাভস্কি স্মরণে

প্রভাতকুমার দত্ত

গত ১৭ই জানুয়ারি রাশিয়ার অবিস্মরণীয় নাট্যপ্রতিভা স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মের একশত বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সংস্কৃতিপ্রেমিক বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে এটি বিশেষ আনন্দের দিন। কারণ স্ট্যানিস্লাভস্কি এমন একটি প্রতিভা যাকে বিশ্বজনীন ছাড়া আমরা আর কিছু নামে অভিহিত করতে পারি না। তাঁর অবদান শুধু যে রাশিয়ার মঞ্চকেই সমৃদ্ধ করেছে তাই নয় বিশ্বের প্রতিটি অগ্রসর দেশের মঞ্চই তাঁর দ্বারা লাভবান হয়েছে। আমরা যাকে 'স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম' বলি তা কেবলমাত্র রুশদেশে নয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি প্রতি দেশেই অনুসৃত হতে দেখছি। এখানে কমিউনিজম-ক্যাপিটালিজমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নাটকের কতকগুলি মূলগত সমস্যার উপর স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর তীব্র সন্ধানী মনের আলোকপাত করেছিলেন যা সর্বকিছু মতবাদের ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলছেন আমরা God save the Tsar কিম্বা Internationale যে সংগীতই করি না কেন আমাদের দেখতে হবে গানগুলি সুগীত হচ্ছে কিনা, গায়করা ঠিকমতো স্বরসাধনা করেছেন কিনা, গানকে প্রাণবন্ত করার মতো দক্ষতা তাঁদের আছে কিনা। স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম' সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। এই 'সিস্টেম' সৃষ্টি সুঅভিনয় এবং নাটক সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করার জন্য। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের নবীন অভিনেতা ও নাট্য প্রযোজকদের নিজেদের যথার্থ প্রস্তুত করে তোলার জন্য এই সিস্টেমের চর্চা অপরিহার্য। তাই আজকাল লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস প্রতি স্থানেই 'স্ট্যানিস্লাভস্কি স্কুল অফ্ ড্রামার অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। সেইজন্যই আমরা বলছিলাম রুশ নাট্যগুরুর প্রতিভা সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন।

স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর প্রতিভা জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন এমন যদি আমরা মনে করি তাহলে বিশেষ ভুল করা হবে। প্রতিভা বাইরে থেকে

তৈরি করা জিনিষ একথা তিনি অলীক বলে মনে করতেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাট্য-প্রযোজনায় স্ট্যানিস্লাভস্কি একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, জন্মসূত্রে কোনো বিশেষ গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করুন আর নাই করুন, প্রত্যেককেই নিজের প্রতিভার স্ফুরণের জন্য কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই আর্ট থিয়েটারে নামী-অনামী প্রত্যেক অভিনেতাকেই রিহর্সালে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হতো। স্বভাবদত্ত প্রতিভার মধ্যে অনেক আলগা ও অস্পষ্ট জিনিস থাকে। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তা শাণিত না হলে সে জিনিস পরিণত প্রতিভারূপে গণ্য হতে পারে না। স্ট্যানিস্লাভস্কি যে 'সিস্টেম' দিয়ে গেছেন তা তার সারা জীবনের গভীর সাধনার ফল। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬৩ সালে যখন রাশিয়ায় দাসপ্রথার প্রভাব একেবারে অপসৃত হয় নি; ১৯৩৭ সালে যখন তিনি মারা যান তখন রাশিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অনেকটা অগ্রসর। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: "From the lard candle to the electric searchlight, from the tarantas to the aeroplane, from the sailboat to the submarine, from the pony express to the radio, from the flinthook to the Big Bertha, from bolshevism and communism, I have lived an interesting life in an age of changing values and fundamental ideas." এই interesting life-ই হচ্ছে নাট্যগুরুর আত্মিক সংগ্রাম, সাধনা ও অভিজ্ঞতার জীবন। পরিবর্তমান আদর্শ ও বিশ্বাসের জগতে তিলে তিলে আঘাত সংঘাতের মধ্যে এই প্রতিভাটি বিকশিত হয়েছে। প্রতিভা পড়ে পাওয়া জিনিষ নয়; জগৎ জীবন ও আত্মপ্রচেষ্টার সম্মিলিত সৃষ্টি।

স্ট্যানিস্লাভস্কি যখন নাট্যজগতে প্রবেশ করেন তখন মস্কোয় Imperial Art Theatre-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। ইম্পিরিয়াল থিয়েটার তাদের প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবধারা নিয়ে যাবতীয় নাট্যপ্রচেষ্টাকে আগলে রেখেছিলেন। তখন নাট্যশালাগুলি মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর খেয়াল মেটাত এইমাত্র। অভিনেতাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। শুধু দু-একজন খ্যাতনামা অভিনেতাদের যা একটু সম্মান দেওয়া হতো। অভিনয়ের ভঙ্গি ছিল সেকেলে। অস্বাভাবিক স্বর চড়িয়ে মেকি আবেগ নিয়ে মঞ্চে অভিনয় চলত। অভিনেতারা মিনে করা মুখ আর অদ্ভুত সব পোশাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টি

করতেন। মঞ্চসজ্জা ছিল একেবারে রীতিবদ্ধ; সেখানে নতুনত্ব এনে ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের নীতির উপর টেক্কা দেওয়ার কারুর কোনো অধিকার ছিল না। নাটক নির্বাচনে ঐ বড়লোকের খেয়াল পরিতৃপ্তিকেই মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সামাজিক ভাবধারা ও চিন্তাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হালকা নাটকগুলিই ছিল ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের একমাত্র মূলধন। নাট্যশালায় উচ্চ কোটির দর্শকেরা যখন খুশি আসতেন যেতেন যেন নাট্যশালা নিছক ফুর্তি করার জায়গা। অথচ নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভাস্কির ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি নাট্যশালাকে মনে করতেন school of life যেখানে প্রগতিশীল ভাবধারা ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ উপস্থিত থাকবে এবং যা মানুষের আত্মাকে দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিনতা থেকে মুক্ত করে উর্ধ্বে তুলবে। ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের কাঠামোয় সে সুযোগ মোটেই উপস্থিত ছিল না। ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের ভেতরে থেকে তাকে যে স্ট্যানিস্লাভস্কি ক্রমে ক্রমে সংস্কার করবেন তাও সম্ভবপর নয়। কারণ রক্ষণশীল মহল তাঁর ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নন। একমাত্র উপায় নিজের থিয়েটার স্থাপন করে সেখানে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো।

১৮৯৭ সালের ২২শে জুন স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবনে একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে মস্কোর The Slavic Bazaar নামক রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে নেমিরোভিচ-দানচেনকোর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এই মণিকাঞ্চন যোগ স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবনকে নব সার্থকতায় মণ্ডিত করে। দানচেনকো ছিলেন নাট্যকার এবং মস্কো ফিলহারমনিকের পরিচালক যেখানে তাঁর কাজ ছিল নতুন ,অভিনেতা তৈরি করা। আশ্চর্য এই, তাঁর নিজের অভিনয় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি মঞ্চে কখনও নামেন নি। রিহার্সালে নির্দেশক হিসাবে তাঁর কুশলতা ছিল অপূর্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রুশীয় মঞ্চের অবস্থা সম্পর্কে দানচেনকো স্ট্যানিস্লাভস্কির মতো ঠিক একই পথে ভাবিত ছিলেন। তিনিও একথা বিশ্বাস করতেন যে রুশীয় মঞ্চ তার বিরাট ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কতকগুলি প্রাণহীন 'টেকনিক্যাল ক্লিশে'র মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দানচেনকোর পক্ষে স্ট্যানিস্লাভস্কিকে খুঁজে নেওয়া মোটেই অসুবিধাজনক হয় নি। স্ট্যানিস্লাভস্কি অভিনেতা, মঞ্চপরিচালক এবং একটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালকরূপে ইতিমধ্যে জনসমক্ষে বিশেষ পরিচিতি

লাভ করেছিলেন। The Slavic Bazaar রেস্তোরাঁর সাক্ষাৎকার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল ১৮৯৮ সালের ২৭শে অক্টোবর যখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের পর্দা প্রথম উত্তোলিত হলো। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় দানচেনকো ও স্ট্যানিস্লাভস্কি পরস্পরের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনার সব দায়িত্ব স্ট্যানিস্লাভস্কির। সাহিত্যগত প্রশ্ন ও সংগঠনের সমস্ত ভার দানচেনকোর উপর ন্যস্ত হলো। নাট্যজীবনে এই দুজন বিরাট প্রতিভা তাঁদের নির্দিষ্ট কার্যবিভাগ থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল এতই সুগভীর।

এই মস্কো আর্ট থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই স্ট্যানিস্লাভস্কি নতুন অভিনেতার দল সৃষ্টি করেছিলেন, নাট্যপ্রয়োগ বিদ্যার বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং নবদৃষ্টিসম্পন্ন বিরাট দর্শকমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। এ কাজে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তাঁর বিপক্ষে। নগরের শাসক, সেন্সর ব্যবস্থা, চার্চের কর্তাব্যক্তি, ধনী ব্যবসায়ী সবাই চেষ্টা করেছেন পরিবর্তনের ন্যায়সঙ্গত গতিকে রোধ করতে। আর্ট থিয়েটারের অভিনয় বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ সেন্সর কেটে দিয়েছে, থিয়েটার বয়কট এমনকি অভিনেতাদের শারীরিক ক্ষতির ভয় দেখানো হয়েছে। স্ট্যানিস্লাভস্কি কিন্তু কিছুতে বিচলিত না হয়ে অবিরাম নিষ্ঠায় তাঁর কাজ করে গেছেন। আর্ট থিয়েটারের দরজা খোলার পর ক্রমান্বয়ে মহৎ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে ছিল সেক্সপিয়ার, শেকভ, ইবসেন, গোর্কী, টলস্টয় প্রভৃতির নাটক। মহৎ নাটক দিয়েই নাট্যপ্রয়োগ বিদ্যায় মহৎ নীতি নির্ধারণের পথে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এক একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে তিনি কি বিচিত্র প্রয়াস না করেছিলেন! ইবসেনের যে নাটকটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন সেটি হলো An Enemy of the People যার ডাঃ স্টকম্যান চরিত্রে তিনি নিজে নেমেছিলেন। এটি একটি socio-political নাটক। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রচুর ত্যাগ করে ডাঃ স্টকম্যানের একা বিদ্রোহ ঘোষণা এর মূল উপজীব্য। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: In my repertoire Dr., Stockman is one of those few happy roles that captivate by their inner strength and charm। ডাঃ স্টকম্যান প্রথমে মানুষের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাদের আপ্রাণ ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু সেই মানুষগুলিই তাঁকে আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করে চলে গেল, তাদের

দুষ্ট মনের পরিচয় তাঁকে ব্যথিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে ক্রমশ তিনি একা হয়ে পড়ছেন। নাটকের শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল "He who stands alone is the strongest"। তৎকালীন রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ স্টকম্যানের সত্যের পক্ষে লড়াইয়ের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রাশিয়ার অধিবাসীরা জারশাসনের অত্যাচারে অত্যাচারিত। এই অবস্থায় তারা ইবসেনের এই চরিত্রটিকে তাদের 'হিরো' হিসাবে গ্রহণ করেছিল। স্ট্যানিস্লাভস্কি এই চরিত্রটির রূপায়ণে সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি আগে থাকতে ভেবে নেন নি যে তিনি একটি socio-political চরিত্র অভিনয় করতে যাচ্ছেন। কি ভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক: "For the spctators the 'Enemy of the People' was a social-political play, for me it was one that belonged to the line intuition and feelings. Through them I grasped the spirit and passion of the role and the characteristic features of the life depicted by the play ; the 'trend' of the play revealed itself to me by its own power. As a result, I found myself on the social-political line—from intuition via reality and symbol to politics." ডাঃ স্টকম্যান চরিত্রের inner image ও outer image দুটো দিক আছে। প্রথমটিকে ঠিকমতো ধরতে না পারলে দ্বিতীয়টিতে আসা সম্ভব নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি চেয়েছিলেন নিজেকে মন ও আত্মার দিক থেকে ডাঃ স্টকম্যান-এর সংগে একীভূত করে ফেলতে। এর জন্যই তিনি নাটকের সামাজিক-রাজনৈতিক আবেদনটিকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিনয়ে অভিনেতার সূক্ষ্মতম অঙ্গ সঞ্চালনে পর্যন্ত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। বক্তৃতামঞ্চে ডাঃ স্টকম্যানের দর্শকের প্রতি অঙ্গুলি প্রক্ষেপনের ভঙ্গিটি তিনি বার্লিনে এক বিশিষ্ট বন্ধুর আঙুল নাড়ার পদ্ধতি দেখে রপ্ত করেছিলেন। এই চরিত্রের রূপায়ণে তিনি তাঁর পা দাবানোর ভঙ্গির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বিখ্যাত এক রুশীয় সংগীতকারের পদসঞ্চালনের।

এরপর আমরা আসছি গোর্কীর The Lower Depths নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে। ক্রিমিয়াতে সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে থাকতে গোর্কী মুখে মুখে স্ট্যানিস্লাভস্কি-দানচেনকোকে নাটকের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথমে নাটকটির নাম ছিল The Lower Depths of Life। পরে দানচেনকোর পরামর্শ অনুসারে শুধু The Lcwer Depths রাখা হয়। এই নাটকে স্ট্যানিস্লাভস্কি Satin-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। Satin-এর চরিত্রটি বেদের (Tramp) জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। বেদের ধর্ম হচ্ছে সন্ত্রাস, খুন, জখম, চুরি। এদের জীবনকে ঘিরে একটা ভয়াল সৌন্দর্য এবং রোমান্টিসিজমের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে স্ট্যানিস্লাভস্কি ভাবলেন এই আবহাওয়ার চাক্ষুষ পরিচয় দরকার। তাই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মস্কোর khitrov market অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোকেদের একটি গুপ্ত আড্ডা পরিদর্শনে গেলেন। সেখানকার লোকেদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশলেন। নিজেকে তাঁর অনুপ্রাণিত মনে হলো। নাটকটির মূল তাৎপর্য তিনি ধরতে পারলেন। সেই মূল তাৎপর্য হলো freedom at any cost অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা যার জন্য নিজের অজান্তে মানুষ জীবনের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। বাস্তব-অভিজ্ঞতার জন্য দৃশ্যপট আঁকা ও মঞ্চসজ্জার কাজ সহজ হয়ে গেল। কিন্তু স্ট্যানিস্লাভস্কি বিপদে পড়লেন Satin চরিত্রটির রূপায়ণে। Satin-এর বক্তৃতা ও স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের সামাজিক আবেদনটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। অথচ এর উপরে যদি বেদের জীবনের রোম্যান্টিসিজম আরোপ করা যায় তবে জিনিসটা একেবারে নিছক নাটুকেপনা হয়ে যাবে। নাটকের ভাব ও রোম্যান্টিসিজমকে নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে Satin চরিত্র ঠিক রূপ দেওয়া সম্ভব হলো না। স্ট্যানিস্লাভস্কি বুঝতে পারলেন চরিত্রের অন্তর্রূপকে আগে ধরা দরকার বাকি যা কিছু পরে এসে যাবে। গোড়াতেই নাটকের tendency নিয়ে মাতামাতি করতে গেলে নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছু হবে না। স্ট্যানিস্লাভস্কি এইভাবে নিজেকে শুধরে নিলেন। তাহলে দুটি নাটকের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারছি তিনি কিভাবে তাঁর পরীক্ষা চালাতেন।

১৯০৫ সালে যখন ডিসেম্বর বিপ্লব পরাজিত হয় তখন চারিদিকের হতাশার মধ্যে স্ট্যানিস্লাভস্কি পর পর কতকগুলি 'সিম্বলিষ্ট' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। নাটকগুলি ছিল মেতারলিঙ্ক, আন্দ্রিভ, হামসুন, মেরেজকোভাস্কি প্রভৃতির। ১৯১০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনি রুশীয় লেখকবৃন্দ পুশকিন, তুর্গেনীভ, শেড্রিন, দস্তয়েভস্কির বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেন। এমন কি ১৯১৭-১৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নাটক চিত্রা, ডাকঘর ও

রাজা-র (?) রিহার্সাল আরম্ভ হয়। গৃহযুদ্ধের দরুণ শেষ পর্যন্ত এ নাটকগুলি আর অভিনীত হয় নি। যাই হোক একটা কথা বোঝা যায় যে স্ট্যানিস্লাভস্কির repertoire ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটিই মহান নাটক এবং সেজন্যই সেগুলিকে মঞ্চে রূপায়িত করার দায়িত্ব বিরাট। স্ট্যানিস্লাভস্কির কৃতিত্ব হলো এইখানে যে তিনি প্রতি নাটকের বেলায় নতুনভাবে চিন্তা করেছেন যাতে তার dramaturgy সম্পর্কে গবেষণার কাজটা তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

স্ট্যানিস্লাভস্কি অভিনেতার দক্ষতা ও মর্যাদার প্রশ্ন একই সঙ্গে ভেবেছিলেন। ইম্পিরিয়াল আর্ট থিয়েটারের আমলে অভিনেতাদের অনেকটা 'ক্লাউনে'র মতো মনে করা হতো। নাট্যশালা হচ্ছে নিছক আমোদের জায়গা। যাঁরা ধনী পৃষ্টপোষক তাঁরাই সর্বেসর্বা। নাটক আরম্ভ হয়ে যাবার পর বিশ্রী শব্দ করে যখন খুশি তাঁরা আসবেন যাবেন। ফলে যাঁরা সত্যি সত্যি নাটকের শিল্পরূপ উপভোগ করতে আসতেন তাঁরা বঞ্চিত হতেন। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর দশ বছরের মধ্যে একশ্রেণীর দর্শকের এই আচরণ তিনি একেবারে পালটে দিলেন। আর্ট থিয়েটারে পর্দা ওঠার পর নাট্যগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। শুধু ভালো নাটক নয়, নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারাও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির দর্শকসমাজ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। এরপর অভিনয়ের দিনে সময়ে আসার প্রশ্ন। একদিন স্ট্যানিস্লাভস্কি মস্কোর এক থিয়েটারের গ্রীনরুমে উঁকি দিয়ে দেখেন মহা গণ্ডগোল। প্রায় আটটা বাজতে চলেছে অভিনয় এখনি শুরু হবে অথচ 'হিরো'র ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তিনি অনুপস্থিত। মঞ্চ পরিচালক বিমূঢ়ের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। অন্যান্য অভিনেতারা ইতস্তত করছেন; ভাবছেন নতুন কোনো নাটকের জন্য মেক-আপ নেবেন কিনা। এমন সময় ঠিক ৭-৫৫ মিনিটে 'হিরো' এসে উপস্থিত। সবাই খুশি কারণ অভিনয় হবে। আমাদের 'হিরো' দু-এক মিনিটে মেক-আপ সেরে নিয়ে হুড়মুড় করে স্টেজে নেমে পড়লেন। এই ধরনের অভিনেতা সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কি বলছেন "He comes to the theatre with a costume in his suitcase, but without any spiritual baggage. What can he do in his dressing-room from 5 to 8 P.M.? Smoke? Tell jokes? Why, its better to do that in a restaurant." স্ট্যানিস্লাভস্কি আরো বলছেন এই অভিনেতারা হয়ত শরীরকে তৈরি করেছেন,

মুখে ঠিকমতো রঙ মেখেছেন কিন্তু এই অবস্থায় তাঁদের যদি প্রশ্ন করা হয় "You 've got your costumes on and you are made up, but have you washed, costumed and made up your soul ?" তাহলে উত্তর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হবে নঙর্থক। স্টেজে নামতে হলে অভিনেতাকে শুধু বাহির নয় ভিতর থেকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। Talent-এর দোহাই দিয়ে এক মিনিটে নিজেকে ভিতর থেকে তৈরি করে নেওয়া যায় না। অভিনয়ে actor's mood এবং creative mood এ-দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। Creative mood-টাই হচ্ছে আসল; এছাড়া শিল্পসত্যকে ধরা একেবারে সম্ভব নয়। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর থিয়েটারে অভিনেতাদের খেয়াল মতো আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে স্ট্যানিস্লাভস্কি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মূল রচনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে দুটি গ্রন্থ—An Actor Prepores ও Building a Character বিশ্বের নাট্যবিদদেব কাছে নাট্য-শাস্ত্রের গীতারূপে পরিচিত। এই গ্রন্থগুলিতে স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর বিখ্যাত 'সিস্টেম' ব্যাখ্যা করেছেন। অভিনেতাকে শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকে একটি বিশেষ দিন ও ক্ষণে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার জন্যই এই সিস্টেমের প্রবর্তন করেন। শিল্পী, সঙ্গীতকার, কবির যে অবস্থা অভিনেতার তা ঠিক নয়। শিল্পী-সঙ্গীতকারেরা অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু অভিনেতার তা চলবে না। পূর্ব থেকে ঘোষিত দিন ও ক্ষণে তাঁকে দর্শকের সামনে উপস্থিত হতেই হবে। তাই স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন: An actor cannot wait for inspiration to visit him. He must be the master able to wield it." তাঁর সিস্টেম অনুপ্রেরণাকে সময়ের কাঁটায় বিদ্ধ করায় সহায়তা করে। স্ট্যানিস্লাভস্কি তাঁর সিস্টেমের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: "My 'system' falls into two main parts : 1) the actor's inner and outer work on himself; 2) inner and outer work on the role. Inner work on oneself consists in developing psychic technique which enables the actor to work up a creative mood in which he finds inspiration. Outer work on oneself consists in preparing one's body apparatus to incarnate the role and fully bringing out its inner life. Work on

a role consists in studying the spiritual content of the drama, the core around which its is built and which determines its meaning as well as the meaning of each of its roles." তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যানিস্লাভস্কি তরুণ অভিনেতাদের দুইভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একটি হচ্ছে নিজেকে তৈরি করা অর্থাৎ নিজের দেহ মনকে অভিনয়ের উপযোগী করে তোলা। এর জন্য অভিনেতা অনুপ্রেরণাকে বশে আনার বিদ্যা আয়ত্ত করবেন এবং স্বর, ছন্দজ্ঞান ও বাচনভঙ্গী রপ্ত করবেন। অপরটি হলো যে ভূমিকা অভিনেতা রূপায়িত করছেন সে বিষয়ে নিজেকে তৈরি করা। আমরা আগেই বলেছি স্ট্যানিস্লাভস্কি এ ব্যাপারে intuition and feelings-এর পথকে গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য 'সিস্টেম' সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা কোনো মনগড়া সৃষ্টি নয়। তাঁর সমগ্র জীবনে নিজের এবং অগণিত ছাত্রদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা স্ট্যানিস্লাভস্কি অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই 'সিস্টেম'টি রচিত। সেকারণে নাট্যগুরু দাবী করেছেন যে তাঁর এই 'সিস্টেম' নাট্যজগতের প্রত্যেকেরই অনুধাবন ও চর্চা করা উচিত। শুধু অভিনেতারা নন, নাট্যপ্রযোজক ও নাট্যকার সকলেই এর থেকে প্রচুর শিক্ষালাভ করতে পারেন। স্টানিস্লাভস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন: "The method of acting that I have discovered allows the actor to create images, reveal the life of human spirit and naturally incarnate it in a beautiful artistic form on the stage." অভিনয়ের এই সমস্ত গুণাবলী প্রত্যেক দেশের নবীন-প্রবীন অভিনেতাদের কামনার বস্তু। সে হিসাবে 'স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম' বিশ্বসংস্কৃতির পরম সম্পদ।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কির যে উৎসাহ ছিল তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯১৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রা, ডাকঘর ও রাজা নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই এবার আমরা আলোচনা করব বাংলার নাট্যজগৎ স্ট্যানিস্লাভস্কির শিক্ষা থেকে কি করে লাভবান হতে পারে। বাংলা থিয়েটার এক সময় নানা নোংরামিতে পূর্ণ ছিল। আগেকার দিনে বাংলা নাটকে মঞ্চ প্রযোজক ও পরিচালকের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না, কয়েকজন প্রখ্যাতনামা অভিনেতার খেয়াল মতো অভিনয় পরিচালিত হতো। প্রধান অভিনেতারা বিশেষ 'ম্যানারিজম্' নিয়ে

অভিনয় করতেন। নাট্যশালাগুলি ছিল নিছক আমোদের স্থান। প্রতি নাটকেই প্রায় হালকা গান ও নাচ থাকত। দর্শকরা অনুরোধ জানালে মঞ্চে নাচ বেশী সময় দেখানো হতো। হালে অবশ্য সিনেমার চাপে বাংলা নাট্যশালা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। অভিনয়-পদ্ধতি অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মঞ্চসজ্জাও অলৌকিক আড়ম্বর বর্জন করে সহজ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আলোক-সম্পাত দ্বারা নাটকের আবেদন আজ অনেক বাস্তবানুগ। তবু কলকাতার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত থিয়েটার, যেখানে একই নাটক একাদিক্রমে শত শত রজনী অভিনীত হয়, সেখানে নাটক সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই বাংলানাটকের বর্তমান নির্ভরস্থল হল শৌখীননাট্য-প্রচেষ্টা যা এখন কলকাতায় ও মফঃস্বল সহরগুলিতে অজস্র ফুলেপল্লবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। নাটক নির্বাচন ও তা মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে সর্বত্রই একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আমাদের চোখে পড়ছে। বাংলার শৌখীন নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম' ভালোভাবে চর্চা করলে তাঁদের আদর্শবাদকে আরো ফলপ্রসূ করে তুলতে পারবেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতায় সরকারী নাট্য আকাদেমীতে স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম চর্চার এখনও কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নি। যতদূর জানি An Actor Prepares এবং Building a Charactor এ দুটি গ্রন্থ আকাদেমীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয় নি। অথচ রুশীয় নাট্যবিদের থিয়োরীর সর্বজনীনতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। যাই হোক বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে দু'একটা আশঙ্কার ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করছি। এক সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে অভিনেতার প্রাধান্য ছিল। এখন তার উল্টোটা করার চেষ্টা হচ্ছে অর্থাৎ পরিচালকের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে কিন্তু আমরা স্ট্যানিস্লাভস্কির শিক্ষার বিপক্ষে যাচ্ছি। কারণ আধিপত্য এলেই খানিকটা dogmatism-এর ভাব এসে যাবে। Dogmatism স্ট্যানিস্লাভস্কি একেবারে পছন্দ করতেন না। অভিনেতাদের creative mood অধিগত করার ব্যাপারে পরিচালকের অতি-আধিপত্য কখন কখনও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। আজকাল বাংলা-মঞ্চে আলোর মারপ্যাচের এক জোর প্রচেষ্টা চলেছে। বলা হচ্ছে নাটককে বাস্তবানুগ করে তুলতে হলে এবং ফিল্মের আবেদনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে এ জিনিস অপরিহার্য। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় নাটক দাঁড়ায় অভিনেতাদের অভিনয় গুনে। আলো সাহায্যকারী একটি শক্তি মাত্র। হালে কিন্তু

আলোকসম্পাতের ব্যাপারটা অভিনয়কেও ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। আলো দিয়ে সাময়িক অভিনবত্বে দর্শককে আমরা ভোলাতে পারি। কিন্তু তাতে তাঁদের অভিনয় উপভোগ থেকে অনেকটা বঞ্চিত করব। এ অধিকার বোধ হয় কারুরই নেই। স্ট্যানিস্লাভস্কি যাকে living their role not acting বলেছিলেন তা তো আলোর কারসাজির দ্বারা হয় না। মস্কো আর্ট থিয়েটারে অতি সাম্প্রতিক অভিনয়ে দেখা গেছে যে সেখানে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অভিনয় করে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আলো নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করাটা কি উচিত? আমাদের একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের যত ব্যবস্থাই হোক না কেন অভিনয়কে সবার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। তা না হলে স্ট্যানিস্লাভস্কি 'সিস্টেম'কে আমরা কোনো কাজেই লাগাতে পারবো না।

সুঅভিনয়, প্রযোজনা, এবং দর্শক গড়ে তোলা—এই ত্রিবিধ কাজ স্ট্যানিস্লাভস্কি একই সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। আজকে এই ১৯৬৩ সালে যদি আমরা নাট্যশালার উন্নতি কামনা করি, মানুষকে শিক্ষা দিতে চাই ও তাকে দৈনন্দিনতার আবিলতা থেকে মুক্ত করতে চাই তবে আমাদের এই ত্রিবিধ সমস্যার কথা ভাবতে হবে। বর্তমান আলোচনার আমরা উপসংহার করতে চাই স্ট্যানিস্লাভস্কিরই কথা উদ্ধৃত করে: When I look back on the road I have .traversed, on my life in art, I want to compare myself to a gold seeker who first has to roam the wilderness to find a streak of gold, then wash tons and tons of sand and rock to get a few grains of the valuable metal. And like a gold seeker, it is not my labours, my quest and privations, my joys and disappointment that I can bequeath to my descendents, but the gold vein that I had found. এই gold veinই হচ্ছে তাঁর 'সিস্টেম'। স্ট্যানিস্লাভস্কির প্রতি নাট্যপ্রিয় বাঙালির সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হবে যদি আমরা কলকাতায় যত ছোট করেই হোক এই 'system' অনুশীলনের স্থায়ীকেন্দ্র স্থাপন করতে পারি। শতবার্ষিকীতে এই মহান নাট্যগুরুকে আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করি।

নিহত সূর্যের জন্যে ॥ রাম বসু

আলো অন্ধকারে বোনা পীড়িত হৃদয়
মৃতের মুখের জ্যোতি অবারিত স্মৃতি
আর যা সম্ভব ছিল সব নীরবতা
পাহাড়ের নিচে হ্রদ, রক্তমাখা তীর
গির্জার সোপান কিংবা মূঢ়তা আমার।

এখানে দাঁড়াও পান্থ! হে দেবতা তুমি
নিহত সূর্যকে ধর তার নগ্ন ওষ্ঠের ওপর।

তৃষার্ত, প্রস্তুত হও। দুর্বলতা লুকিয়ে রেখো না
দাক্ষিণ্যকঠিন বজ্র। হাহাকারে সঙ্গতি, সুষমা
ধোঁয়ার সুন্দর ডিঙা ভাখো যায় নক্ষত্রের দিকে
যে শূন্যে বেলের কুঁড়ি কুণ্ঠাবতী গন্ধের ভিতরে
সময় হয়েছে তার এইবার সম্পূর্ণ হওয়ার।

নিহত সূর্যকে তুমি হে দেবতা তোল
তার তপ্ত অন্ধকার ওষ্ঠের ওপর।

বিকার, মুকুট নেই; অনুতাপে শান্ত দৃশ্যাবলী
ডিঙা যায় ডিঙা যায় মহাশূন্য কাঁপে দীনতায়
শব্দ, কৃষ্ণ-সহোদরা, হও দীপ বর্জিত দেউলে
গর্বিত হওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। নীরবতা
জীবনের হে অন্ধ দেবতা! শেষ মাধুর্যের প্রতি
এখনও বিশ্বাস আছে; তাই দেখব যা কিছু দেখার

নিহত সূর্যকে তুমি অনিবার্য বিভা
তুলে দিয়ো নগ্ন তপ্ত গন্ধের ওপর।

ঘোর শব্দে, আলোড়নে ॥ চিত্ত ঘোষ

চোখের সম্মুখে ধ্রুব উচ্চতা পতিত :
পতনের ঘোর শব্দে, আলোড়নে
আমরা ভেঙে গিয়ে এক মথিত চরিত্র।
পশ্চাতে সম্মুখভূমি, পশ্চাদ্‌ভূমির
উজ্জ্বল গরিমা বাষ্প, ধুলো হতে চায়।
সময়ে ফাটল, দীর্ঘ ভয়াবহ চিড়।
উচ্চতম শিলাভাগ নিম্নতম অতল পাতাল।
বরফের সাদা বনে হননের শব্দ শুধু :
স্মৃতির পুরনো পথ, অবিস্মৃত পুরনো পথিক
সেদিনের সে-হৃদয় বিদ্ধ, অন্যদিনে
হত্যা, প্রতিহত্যা, শব।
আমাদের অস্থিতে মজ্জায় স্নায়ুদেহে
তীব্রতম ধাক্কা ও ঝাঁকুনি।
টান লাগে মূলে, যেন ছিঁড়ে যায়
যেন বুঁজে আসে
প্রবাহের মুখ।
পাথর গড়ানো দিন, পাথর চাপানো রাত্রি
পাথরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
স্মৃতি স্বপ্ন কোমলতা কঠিন পাথররূপ নেয়।
ক্রোধ জ্বলে যেন গ্রীষ্মে পাথরের বনে।

উঠে আসে, নেমে যায় গভীর নিম্নের দিকে স্থির উন্মোচনে
সজ্জিত ঘৃণার ক্লেদ-মুখ।
প্রভূত জঞ্জাল, জল পার হয়ে হয়ে
হৃদয় ধ্বনির নিচে ছায়া খুঁজে খুঁজে
শব্দের মন্ত্রের দিকে হেঁটে যেতে চেয়ে
শুদ্ধ চেতনার শীর্ষে
দুর্গম উচ্চতা ভেঙে সীমান্তের দিকে
প্রত্যয়ের স্বচ্ছতায়, কুয়াশায়
প্রত্যহের বিঘ্নে ও বাধায়
চিরদিন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অধিকার পর্বতের প্রতিধ্বনি হয়॥

স্বদেশে, বিদেশে ॥ তরুণ সান্যাল

১

আমি যদি কবিতা না লিখি তাহে কিবা আসে যায় :
কবিতা লেখে না ফুল পাপড়ি ও স্তবকে···পঙ্‌ক্তি মিলে,
সমুদ্র তরঙ্গভঙ্গে বালুরেখায় কই ছন্দোস্পন্দে নীলে
ব্যঞ্জনা লেখে না শব্দে, শুধু ধ্বনি নিরবধি শব্দ হতে চায়,
শব্দ কিংবা শব্দবন্ধে কে-বা লেখে স্পন্দিত নিখিলে···
উহারা কবিতা স্বতঃ, উহাদের বিরাম বিদায়
উন্মোচনে লম্ফ, ধূপছায়া কম্প, রীতি তিলে তিলে
ভঙ্গুরে রেখেছে শিল্প বস্তুবোধে নিত্য কবিতায়।

আমাকে কবিতা কারা লেখাবারে চাবুক চালায়,
বিষয় : সত্যেরে ঘৃণা, রীতি : আত্মহননে, জ্বালায় :
আমাকে লেখাতে চায় মৃত্যুর বনামে ভীতি, ক্রোধ,
ঘৃণা উন্মোচনে ছেঁড়ে চোখের মণিরও প্রিয় প্রীতি···
···কোটি শব্দ সমবায়ে এত ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিরোধ···
হায়, ঐ শব্দপুঞ্জ আছিল যে কবিতার পরম নিভৃতি ॥

২

ঘুমাও নির্জনে প্রেত, জাগিয়ো না, কেননা অত্যাপি
ঘৃণা সঙ্কুচিত হয়ে কামানের নল নয়, ফুলে সঙ্কুচন···
কেননা তমসা পোড়া গন্ধকে স্ফুরণ নয় : স্বতঃ নির্বাচন
হোক পুষ্পাধারে, যথা কোমল শিশিরে স্বচ্ছ বাপী।
চতুর্দিকে ঘৃণা হায়, কেমন আবিল হতে চায়
যেন ঘোর ধূম্রজালে প্রচ্ছদ পরাতে চায় চতুর তস্কর
গৃহস্থ যেনবা ঘুমে, কিংবা হয় যদিবা জাগর
দিগ্‌ভ্রান্ত, বন্ধু যেথা বর্শা বজ্র সে লক্ষ্যে নাচায়!

নিদ্রা যাও প্রেত, যাও কবরে, শ্মশানভূমে শুয়ে ;
পুনর্বার স্বচ্ছদৃষ্টে দেখি ভ্রাতা বান্ধবের মুখ,
দেখি প্রিয়জন চায় ফোটাবারে স্পর্ধিত মুকুল
বিশশালা কল্পনায় শোষণ ঘৃণার কালি ধুয়ে ;
এসো সাম্য, সম্ভাবনা, অনাবিল আবিশ্ব···উন্মুখ—
জাগিয়ো না প্রেত, আছি প্রতীক্ষায় ফোটাবারে ফুল ॥

একটি সোনালী শামুক

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

এখন শীতের ভোরে মাঠগুলো ন্যাংটা বাচ্চার মতো গ্রামের কোলে গুটিসুটি শুয়ে রয়েছে। তাতে সারারাত ধরে খসতে থাকা কুয়াশার নিচে মাঠগুলোর হলুদ শরীর সত্যি নীল ও নিথর দেখাচ্ছিল। এবং শিশিরে পা চুবিয়ে চুবিয়ে ওরা যখন বেহুলার পাড়ে এসে দাঁড়াল ওদের পায়ে প্রচুর ঘাসের ফুল জড়িয়ে গেছে। ফলে দুটিতে পরস্পর পা দেখতে দেখতে মুচকি হাসল। পা সাফ করার জন্যে ভেজা ব্যানার বনে বারকয় ঘষল। যদিও পুরুষটিকে এখুনি বেহুলার ভাপওঠা হিমজলে ডুবতে হবে।

মেয়েটি এ সময় বেহুলার স্রোতবর্তী জলের মুখ দেখছে পলকহারা চোখে। কিছু কথা বলে দৃশ্যটা পুরোপুরি বর্ণনার ইচ্ছে। অথচ বলতে ঠোঁট দু-খানি একটু কেঁপেই থেমে যাচ্ছে। যেন বলার কিছুই নেই, 'দেখছো তো চেহারাখান্ !'

রতু বরাবরই বৌর চোখ দেখে সব টের পায়। রতু হাসবার চেষ্টা করছে —জলে কিছু অমায়িকতা দেখল সম্ভবত। রতুরও ঠোঁট দুটি কেঁপে দাঁতে দাঁতে ঘষা খেয়ে হাসিটা একসময় ভেজা নেকড়া হয়ে নেতিয়ে পড়ল, ঝুলতে থাকল বিশ্রীভাবে। রতুর বলতে ইচ্ছে: 'অনেক শীত আমি দেখেছি রে ওলাং। এবং শীতের জল।' কিংবা: 'জলের ভেতর সবসময়ই স্বপ্নের আরাম।' কিন্তু কেবল বলতে পারল, 'সেবার ডুবে ডুবে এক ঝাঁক ঝিনুক তুলেছিলাম।' ওলাং এখন ঝিনুক খেতে খুবই ভালবাসে বলে এটুকু সশব্দে প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয়েছে। তাছাড়া শীতের পর মাঠের নিঃসঙ্গ শিমুলের মন্দারের ডালে ডালে একদিন থরে থরে লাল ফুল ফুটবে, জানোয়ারের খুরে ওড়া ধুলোর রাশি গরম হতে হতে ফুলগুলোকে ম্লান করতে থাকবে, হয়তো খরার আমেজ ঠোঁটে ঠোঁটে বয়ে আনল সবে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে ক্লান্ত হাওয়ারা, তখন ওলাং তলপেটে হাত রেখে ককিয়ে উঠবে, এবং ওলাং-এর নিশ্চিত বাচ্চা হতে চলেছে, ওলাং গোগ্রাসে ঝিনুকের মাংস পুড়িয়ে নুনলংকা মাখিয়ে

ভয়ানকভাবে মাথা নেড়ে চিবুবে। 'পোয়াতীর পক্ষে এমন সুপথ্যি আর নাই বাছা' ওলাং-এর মা তরঙ্গবালা বলে গেছে। ঝিনুকের চেহারার সঙ্গে এই বুড়ীর কেশভরা জটা, পুরু সিঁদুরের ছোপ কপালে, ভর উঠলে প্রচণ্ড দুলুনি—সবগুলো চমৎকার থাপ খেয়ে গেছে রতুর মনে। তাই গায়ের ছেঁড়াফাটা তুলোর বস্তরখান উদোম করতে করতে আর একবার কথা বলতে চাইল রতু, 'শাউড়ী বুলেছিল, না?'

'যেমন শাউড়ী তেমুনি জামাই!' ওলাং শরীর কাঁপিয়ে হাওয়ালাগা তিরতির স্রোত হচ্ছে। অর্থাৎ উল্লাসটা শীতের হামনদিস্তায় এমনি করে ছানা হল।

উদোম গায়ে দাঁড়িয়ে গামছাটা ঠেসে লেংটি বানাচ্ছে রতু। পাছার হাড়ওঠা তালতুটো দেখতে পাচ্ছে ওলাং। ফাটাফাটা খস্‌খসে কালো কালো ছোপ। চামড়ায় অগুনতি ছোট ছোট বুজকুড়ি ফুটছে যেন। রতু না হনুমানটি। ওলাং-এর বারবার হাসতে ইচ্ছে করে। হাসলে বরং শীতও কিছু কমে যাওয়া উচিত। 'পালোয়ানটো বেহুলাকে ডরায় না সত্যি। অবাক যাই বাপু।'

রতু ঘুরে ওর মুখ দেখল। ওলাং কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাত রেখেছে। বেহুলার জল আর রতুর শরীর এই নিয়ে বুঝি কিছু ভাবছে। রতু টানটান হয়ে হাত দুখানি দুপাশে ঝাঁকি দিল। তারপর পা দুখানি। 'সার্কেসের বাজী দেখাব ওলাং, চোখ বুজে থাকিস্।' তারপরই ঘুরে পুবমুখো তাকিয়ে ডিমের কুসুমের মতো থলথলে সূর্যটা দেখে নিয়ে পাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওলাং সত্যি চোখ বুজেছে। বেহুলার ভারী জলে আচমকা কাঁপন। কাঁপন আর শব্দ। শব্দটাও যেন ভারী আর ঠাণ্ডা মনে হয়েছে। রতু ডুবে রয়েছে এখনো। ওলাং-এর হৃদপিণ্ডে সেই কাঁপন আর শব্দ—মোটা মোটা বুজকুড়ি ভাঙছে, গড়ে উঠছে। রতু কি আর উঠতে পারবে—ওলাং হাই তুলে সোজা হতে হতে দুবার ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। বুজকুড়িগুলো জানিয়ে দিচ্ছে রতুর অন্তবর্তী যাতায়াতটা। ওলাং মাছের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আজ অবশ্যি এত সকালে ঝিনুক তোলার জন্যে নামেনি রতু। অন্তত একটিও সোনালী শামুক তুলবে জলের নিচে থেকে। এ-বছর মাঠে বান ওঠে নি বলে এই অতিকায় শামুকগুলো, পৈ পৈ খুঁজে মিলবে না। অনেক

খুঁজেছে ওলাং। শামুকটা সেদ্ধ করে ভেতর থেকে মাংসগুলো বের করে নেবে। স্বাদ মন্দ না, রতু তো বলে 'অমিত্যের তুল্যি।' কিন্তু আসলে ওর খোলটাই দরকার। খোলের কিনারাটা বড্ড ধারালো হয়ে থাকে। ফলে মাঠে মাঠে ফসলওঠা জমি থেকে অগোছাল ধানের শীষ কুড়োতে ভারি কাজ দেয়। লম্বা খড়ের ডগা থেকে ওর সাহায্যে শীষগুলো কচ্ করে কেটে নেওয়া সোজা। ধানের পাহারাদার 'জাগাল'দের হিংস্কুটে কিপ্‌টে গেরস্থ আর চাষীদের চোখ এড়িয়ে শীষ কুড়নো সহজ হয়ে ওঠে। এখন শীতের প্রারম্ভে সবখানে মাঠচরা মেয়েরা আগেভাগে কেবল কয়েকটি সোনালী শামুক সংগ্রহে তৎপর। ওলাং পোয়াতী বলে ওর জলে ডুবতে মানা। এবং শুধু মানাটার জন্যেই নয়, ওলাং-এর কেমন ভয় করে। 'পেথম পোয়াতী—অধিক বয়েসে মা হচ্ছিস ওলাঙ্গিনী, এগুলো মেনে চলবি', মা তরঙ্গ ওকে একদফা ফিরিস্তি দিয়ে গেছে। জামাইকেও খবরদারী নিতে বলেছে বুড়ী। 'ওরে বাস্ রে, খোদ্ মা শেতলার কন্যে, ওনার বাক্যি অমান্যি করি কী সাহসে', রতু কপালে হাত ছুঁইয়ে হা হা হাসে। অথচ এও যেন আসল কারণ নয়। রতু এবং ওলাং দুজনেই ভেবেছে ওদের একটি মহৎ কোনো পরিণতি প্রতিমার মতো বানানো হচ্ছে, তাই মনটা যেমন, শরীরও তটস্থ রাখতে হয়। 'পালন-টালন করে চলিস ওলাং' রতু সব সময় বলে থাকে। এদিকে ওলাং-ও তলপেটে একটা জীবিতের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ভাবে। ভাবে আর ভয় করে। 'মাগো, জলে ডুব দিলে বুঝি পুক্‌ড়োটার দমবন্ধ হয়ে যাবে!' এবং 'আমি যদি দুঃখু পাই, বাচ্চাটাও কি আর না পারে এট্টু?'

'আহা রে, একই নদী দু ধারায় বইছে ওলাং!' শব্দগুলোও নদীর জলের মতো ছল ছল বাজে ঘুমে জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে রোদে আর হাওয়ায়। ওলাং দুঃখকে এড়িয়ে হাসির ঘর গড়েছে। রতুও। এখন এই দুরন্ত দামাল শীতের রাতে পরস্পর শরীর শুঁকে সেই অনিবার্য পরিণতির ঘ্রাণগুলো একটু একটু নিতে চেয়ে হাসির ঘরের কাচগুলো পলকে পলকে উজ্জ্বল হতে দেখে। ফুটো চালের ফাঁকে একটি কি দুটি অবোধ তারা। পুরনো কানিচটা কাঁথার ওপর তাদের সম্ভাবিত তাপটুকুও টের পায়, অনুভূতি তখন এতখানি প্রখর। 'একটি পুকড়ো থাকলে আমার দুঃখু দূরে যেত ওলাং।' রতু ওর তলপেটে হাত বুলিয়ে বলেছিল। 'বাপে পোয়ে ভাগচাষ করতুম, একখান হাল একজোড়া বলদ গরু। বাছুর কিনলে পয়সা কম লাগে, বুঝলি?' ওলাং চোখ বুজে

বলেছিল, 'পুকড়োটা একদিন বড়ো হবে। বাছুর দুটো মাঠে মাঠে চরিয়ে তাজা করে দেবে। সত্যি বুলেছি কিনা ?' 'ঠিকই বুললি ওলাং।' ওরা টের পেয়েছে, একটা সুদিন আসছে, তৈরি হয়ে থাকা ভালো। কিছু ধান সঞ্চয় করা দরকার।

সূর্য আরো একটু উজ্জল হলে শিশিরভেজা ধানগুলো জমিতে জমিতে ডাঁটো হবে। এবং রতু তখন মাঠে উঠে যাবে ধানকাটার মুনিস হয়ে। চাষারা এই মরশুমে যেন পাগলা হাতি হয়ে ওঠে। যত জেদী তত হিংসুটে। মাঠে মাঠে কাস্তের ফলায় রোদের ঝিলিক, ধানকাটার খস্ খস্ সর্ সর্ শব্দ। দ্রুততা আর ব্যস্ততা। চলল নাগাদ এক প্রহর রাত অব্দি। আর, রাতটা যদি জ্যোৎস্নার হয়, সবসময় কান পাতলে শোনা যাবে খামারে খামারে ঝাড়াই মাড়াইয়ের ধুপধাপ খড় খড় আওয়াজ। 'এট্টা সুরেল গপ্প বুলছেন মাঠঠাকুর'—রতুর আবিষ্কৃত উপমা। ওলাং গর্বিতা। 'এত জানে বাপু মরদটো।'

ওবেলার দিকে সময় করা মুশকিল রতুর পক্ষে। শীতের ভোরটা কেবল ফাঁকা। অথচ কয়েকটি দিন একঘেয়ে অনুযোগের পর রতু প্রস্তুত হতে পারল। 'তুই খুজেছিস্ ?' 'মিথ্যে বুলছি নাকি ? মরশুমটা ইদিকে বয়ে যাচ্ছে চোখের পর দে খালিখালি। রাত্তিরে চোখের পাতাটি বুজিনে গো—ভাবনাতে।' ওলাং প্রায় কান্নার ঢঙে বিড়বিড় করেছিল। বীনাদিরা উদিকে দু হাঁড়ি ধান জমিয়েছে।' 'তুর নখে ধার নাই ? শীষ ছিঁড়তে পারিস নে ?' রতু ধমকাল। ওলাং অমনি চেঁচিয়ে একশো। হাত দুখানি বাড়িয়ে রতুর চোখের কাছে মেলে ধরল আঙুলগুলো। 'ছাখো মিন্‌সে, আমার নখগুলার দশা ছাখো ! যন্তনায় মরে যাই সবসময়।' ওলাং-এর চোখ ছল ছল। আঙুলের ডগাগুলো হাতের চেটোয় নিয়ে পরখ করল রতু। 'আঃ ইগুলার যে মিত্যু হচ্ছেন রে বাপু !' রতু পস্তাল ওর ফাটাফাটা কালচে ঘেয়ো নখগুলো দেখে। 'কালই ভোরবেলা দয়ে ডুববো দেখে নিস্। এট্টা শামুক তুলবই তুর জন্যে।'

রতু এতক্ষণে ভুস্ করে ভেসে উঠেছে পানকৌড়ির মতো। 'পাতালপুরীতে আগুন জ্বলছে-এ-এ-এ !' কথাগুলো কাদার দলার মতো ছড়িয়ে পড়ছে বেহুলার আকাশে হিমময় হাওয়ায়।

'পেলে গো ?'

আবার ডুবেছে। ওলাং জলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

লাল রোদটা রোঁয়াওঠা ভেড়ার বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। কেননা হাওয়া

এল উত্তর থেকে মন্দ মন্দ এবং কুয়াশারা মিলিয়ে গেছে কিছু কিছু। ডিমের কুসুমটা গলে গলে সবকিছুতে মাখামাখি। অল্প একটু গরমের সুখ—হয়তো সবটুকুই ঐ তরল আলোটা দেখতে পেয়ে। আকাশের হলুদ দাঁতে দূরে উলুকাশের জঙ্গল ঘাসফড়িঙের মতো ছটফট করছে। একদল কাক বেহুলার আকাশে। ওলাং কাকগুলোর কুচকুচে চিকন ডানাগুলো দেখল মুখ তুলে। অন্যসময়ের মতো অমঙ্গলের চিহ্ন খুঁজল না এতে—বরং এখন সবকিছুই সুন্দর আর সহজ মনে হয়।

অথচ রতু ক্রমাগত ডুবছে আর উঠছে—ওলাং-এর সুন্দরটুকু এখানে এসে বারবার মরে যাচ্ছে। সুতরাং ওলাং টের পাচ্ছে সবসময়ই হাসির ঘরের বাইরে ধারাবাহিক একটা পীড়াবোধ থেকেই যায়—কখনো টের পায়, কখনো না। এবং যখনই টের পায় আরোগ্য খোঁজে। ওলাং রতুর শরীরের রক্তগুলোকে স্পষ্ট জমে যেতে দেখল। 'বেহুলার পাতালে মরদটো মানিক খুঁজছে, আহা রে', ওলাং-এর গলার নিচে থেকে এই দরদগুলো জিভ অব্দি পৌছে ওলাংকে কাতর করল। ওলাং মুখ তুলে চারপাশে শুকনো খড় খুঁজছে। রতু উঠে এলে ওকে চাঙ্গা করতে হবে আগুনে সেঁকে তাতিয়ে। রতু আবার ভেসে উঠতেই ওলাং চেঁচাল, 'থাক্ গে বাপু, উঠে এস'। কিন্তু রতু আবার ডুবেছে। যা জেদী আর ডাকাবুকো মানুষ। অগত্যা হাসতে ইচ্ছে করে ওলাং-এর।

আশেপাশে প্রচুর ব্যানাবন। কোথাও সর আর নলখাগড়া। সবই কাঁচা আর শিশিরে চবচব করছে। একটু দূরে পাহারাদার 'জাগাল'দের কুঁড়েটা। ওখানে আগুনের ধোঁয়া শীষ দিয়ে উঠছে সাপের লেজের মতো। এবং খড়ও মিলতে পারে দু আঁটি। ওলাং পরবর্তী কোনো ভাবনা না নিয়ে দ্রুত এগোল কুঁড়েটার দিকে।

কুঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে পুবমুখো বসে রোদ পোহাচ্ছে দুটি জাগাল। একটু থমকে দাঁড়াল ওলাং। বেহায়া জাম্বুটাও রয়েছে তাহলে। ওর কালোকুচ্ছিত চেহারা, থ্যাবড়া নাক, হাসের মতো থপথপিয়ে হাঁটা, ও মোটা মোটা দাঁতের কর্কশ হাসিগুলো পলকে পলকে বোধে পরিচিত চেহারা পাচ্ছে। সেদিন ওলাং-এর ধানকুড়োন ঝুড়িটা কেড়ে নিয়েছিল। এত তৈরি চোখ ছোঁড়াটার। আকাটা ধানের শীষ লুকিয়ে কাটতে গিয়ে এই ঝামেলা। একেবারে আচমকা ওর চ্যাপটা থাবায় ওলাং-এর ঝুড়ি, ওলাং লজ্জায় ভয়ে ঘেন্নায় কাঠ। ওলাং ফিসফিস করে বলেছিল, 'ইটো কী হলো জাগালের পো ?'

জাম্বু প্রচণ্ড হাসল। 'ছিজ কল্লাম গো গুণীনের বেটি। মাঠের পুলিশ আমি, জানো না বুঝি?'

ওলাং নতমুখে ঘামছে। কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে। রতু হয়তো ঘেন্নায় চেঁচাবে, 'তুই চুন্নী ওলাং?'

ওলাং বিড়বিড় করে বলল, 'ঝুড়ি ছ্যাও।'

'কেনে, তুমার জননীটো তো বশীকরণ মন্তর জানে, তুমায় এট্টু শেখায় নি? ঝেড়ে ছ্যাও না একখান, গলে জল হয়ে যাই মাইরি!'

ওলাং রেগে লাল। 'ঝুড়ি দেবে কিনা বল?'

'উঁহু।' জাম্বু লাঠিতে এক পা তুলে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে ছিল।

'সব শীষ তো লুকিয়ে কাটি নি। কুড়িয়েছি না?' ওলাং-কে কিছু নরম আর সপ্রতিভ হতে হলো।

'লতুন বৌর গলায় যেন মধু ঝরছে। আহা! আরো এট্টু লরম হও দিকি।'

ওলাং ফিক্ করে হেসে উঠল ওর ভঙ্গি দেখে।

'এই লাও।' জাম্বু ঝুড়িটা ফেলে দিয়েছিল। 'লতুন বৌ বুলে মাপ কল্লাম জেনো।'

ওলাং পালিয়ে বাঁচে।......

জাম্বু ঘাড় ফিরিয়েই ওলাংকে দেখতে পেয়েছে এবার। এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এস গো লতুনী।'

ওলাং হাসল। 'এট্টু আগুন ছ্যাও তো জাগালের পো।'

'এত ভোরে মাঠে বেরিয়েছো, গতরটা যে ননীর তা জানো না?' জাম্বু মিষ্টি হতে চাচ্ছে। 'সেঁকবে বুঝি?'

'যাও!'

'আগুনে কী সেঁকবে?'

'লোকটো বেউলেতে ডুবছে ছ্যাখো গে। এট্টু তাত লাগবে না?'

'আহা-হা, কাণ্ডটা ছ্যাখো।' জাম্বু মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে। পাশের জাগালটি বুড়ো মানুষ। বসে বসে কাশছে। ওর ঝুলেপড়া চোখের পাতার নিচে তারা দেখা যায় না। 'মরদটো মল মোনের দুঃখে বেউলেয় ডুবে, ইনি তাই আগুন খুঁজছেন। ব্যাপারটা তলিয়ে ছ্যাখো কেষ্টদা।' বুড়ো কী বলতে চেষ্টা করছে, বোঝা যায় না। উদ্দাম কাশির তোড়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। ওলাং কষ্টটা দেখতে পারছে না।

'ছাও না বাপু, দেরি হলে মুখ করবে।'

'উই যে বুঁদিতে জ্বলছে, চোখ নাই তুমার?' জান্তু খড় পাকিয়ে তৈরি বুঁদিটা দেখিয়ে দিল। 'এট্টুখানি ভেঙে লাও। নৈলে আমরা আবার উপোসে মরব।'

ওলাং বুঁদির ডগাটা মোচড় দিয়ে ভেঙে নিচ্ছে। বুড়ো একবার দেখল। কী যেন বলল। বুড়ো হয়তো ভাবছে তার জীবনেও এমন অনেক সকাল এসেছিল। ওলাং বসে থেকেই জান্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাট্টি খড়ও দিতে হবে কিন্তু।'

'খড়?' জান্তু জাগাল মাথা নাড়ছে। 'সম্বচ্ছর মাঠ আগুলে দুপন খড় পাইনে। মাপ করো লতুন বৌ।'

'দুটি আঁটি নেবো। বেশি না।' ওলাং সাহসিকা হয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে পালার দিকে। বুড়ো আবার দেখল। তারপর কাশতে থাকল চোখ বুজে। জান্তুর চোখে পলক নেই। থমকে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে, 'কোথেকে এরা সব আসে', এবং 'অনেক কষ্টর দব্য লতুনী, লোকটোর দশা দেখছ? আমিও একদিন বুড়িয়ে যাব এই মাঠে।'...জান্তু তারপর বোবা হয়ে গেল।

'কী দেখছ জাগাল?' ওলাং দু আঁটি খড় বগলে পুরে মিষ্টি হাসল।

জান্তু এবার নড়তে পারছে। শীতের মাঠে যেন একটা আকস্মিক কিছু ঘটে গেল। কাল সারাটি রাত বড়ো কষ্টে গেছে। শীত আর স্বপ্ন। ওরা ওকে সারারাত ধরে দলেপিষে একাকার করেছে। জান্তু বড়ো বড়ো চোখে ওলাং-কে দেখছে।

'বুললে না তো?' ওলাং জান্তুকে কিছু তোয়াজ করতে চায়।

'তুমার রূপ।' জান্তু শব্দ করে হাসল। 'মাঠকন্যের রূপ দেখলে শীতের হাওয়া গায়ে লাগে না।'

'ইস্!'

'আবার এসো লতুনী।'

'কেনে?'

'এমনি বুলছি।'

'যাও!'

'আর এট্টু হেসে যাও না বাপু, রাত্তিরটায় বড্ড শীত ছিল। আম্মো এট্টু গতরখান সেঁকে লিই।'

ওলাং আরো মিষ্টি করে হাসল। ওলাং চলতে চলতে শুনল জান্তুর স্বর: 'বেশ খানিক তাত পেলাম গো কেষ্টদা। যা এট্টু সোস্থ হওয়া গেল। ঠিক বুলিনি ?'

'বড্ড বোকা এই ছোকরা জাগালটা। ভারী ঠকিয়েছি।' ওলাং গল্পটা রতুকে একটু ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে শোনাবে। 'আবার এসো।' 'আসবো বৈকি, মানুষের দোরে কাজ বাধলেই মানুষ আসে।' ওলাং-এর মনে জান্তু আর ওলাং এমনি করে কথা বলছে পরস্পর। দুটিতে ফিস্‌ফিস্ করছে। 'তারপর লতুনী, তার পরেরটা ?' 'তারপর কী ? কিচ্ছু না, কিচ্ছু থাকতে নাই।' 'শুধু এইটুক ?' 'হ্যাঁ গো জাগাল, হ্যাঁ। তুমি এট্টুখানি তাতলে, আম্মো তাতলাম, ব্যস্, নটেগাছটি মুড়ুলো।' 'তা বটে বাপু, বসুমতীর পিঠে যা শীত চলেছেন !' ওলাং-এর জান্তু আশ্চর্য শান্তিতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রতু বেহুলার জল থেকে কখন উঠে গুটিসুটি বসে রয়েছে রোদে পিঠ দিয়ে। ওলাং-এর পায়ের শব্দ শুনে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল।

'পেয়েছ গো ?' ওলাং খড়গুলোর বাঁধন খুলে এলোমেলো ছড়াতে থাকল। 'এসো দিকি ইদিকে। বড্ড কাহিল হয়ে যেয়েছো বাপু। আগুন পোয়াবে এস !'

রতু কথা বলতে পারছে না হয়তো।

'ওম্মা, জমে বুঝি পাথরটি ?' ওলাং এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। 'আহা, কী হিম ! ওঠ, ওঠ, গতরখান তোলো দিকি। নাকি ইখেনেই জ্বালবো ? ইখেনে কতো নোংরা যে'…ওলাং নাকে কাপড় ঢাকছে কিছু নোংরা দেখে।

রতু গুঁড়ি মেরে অল্প অল্প দুলছে শুধু। লোকটার হল কী—ওলাং অবাক। ওলাং অবাক হয়ে বেহুলার স্রোতশায়ী হিম জলে বুজকুড়িগুলো তখনো ভাঙতে থাকা দেখতে পাচ্ছে। ওলাং খড়গুলো রতুর পিঠের কাছে বয়ে আনছে। রতু উঠে দাঁড়াল।

ওলাং ওর কঠোর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কী হয়েছে, বুলবে না ?'

রতু একটু কাশল। তারপর ধোঁওয়াওঠা আগুনের শিখাগুলো দেখল। 'ওলাং ?'

'হুঁ।'

'অনেক শীত আমি দেখেছি রে, গতরটা অনেক থোয়ায়রে গড়া।' রতু কি

কেঁদে ফেলবে। ছি, ছি, এমন যুবোজোয়ান মরদটার গলায় শীতের দাঁত বসে কেমন হয়ে ওঠে দেখি। ওলাং ওর গায়ে তুলোর ছেঁড়া চাদরটা চাপিয়ে দিল।

'এবার বসো তো এট্টু।' ওলাং হাসতে থাকল। জাম্বুর গপ্পটা বলবে ভাবল।

'জাগালের কাছে খড়গুলা মাগনী মিলল, তাই না? আমার দুটি চোখ রয়েছে ওলাং।'

আঃ আঃ, আচমকা বেহুলার হিম দহ ওলাং-এর চারপাশে। ওলাং ডুবে যাচ্ছে। ওলাং বুক চেপে ধরে ককিয়ে উঠেছে। ওলাং-এর পিঠের কাছে রতুর উদোম শরীর—চাদরটা খসে পড়েছে কখন। রতু ওকে তীব্রদৃষ্টে খুঁটিয়ে দেখছে।

'একা ছাড়াপাখির মতো মাঠে মাঠে উড়িস, আমার শংকা হয়।'

ওলাং উঠে দাঁড়াল। জলন্ত খড়গুলো তুলে নিয়ে বেহুলায় ছুঁড়ে ফেলতে গেল। রতু ওর হাত চেপে ধরেছে। রতুর বুকের কাছাকাছি শিখাগুলো দুলছে। রতু কিছু ভাবছে শিখাগুলো দেখে।

কাঁপানো গলায় ওলাং বলতে পারল, 'আমার পেটে একটা পুকড়ো রয়েছে, আমি ভুলি নে—ভুলবো না ইটো জেনে রাখো তুমি।' এবং খড়গুলো স্খলিত হয়ে ওদের পায়ের নিচে হু হু জ্বলে উঠলে প্রচুর উষ্ণতা ক্রমান্বয় স্পর্শ দিয়ে দিয়ে একটু করে অন্যবিধ বোধ জাগাতে জাগাতে কখন কোন এক সময়ে দুজনে আরো ঘন হয়ে বসে রতু ওলাং-এর সুমুখে একটি সোনালী শামুক তুলে ধরতেই দুজনে স্পষ্ট দেখল শামুকটার পিঠে গোলাকার গুটিকয় বৃত্তরেখা—রেখার উৎস খুঁজতে খুঁজতে আগুনটা যখন প্রায় নিবু নিবু, ওদের শরীরে পর্যাপ্ত তাপ সঞ্চারিত হয়েছে, রতু হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছিস্ ওলাং, গোল আঁকগুলো দেখতে অনেক মনে হয়, কিন্তুক মোটে একটি ছাড়া দুটি না।'

দুজনে শামুকটা শীতকালীন নিস্তেজ রোদে মেলে নিশ্চিত আরামে আবার হাসতে পারল।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

গোপাল হালদার

একশত বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন। একশত বৎসর পরে আজ যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করি তখন স্মরণ করি তাঁকে একশত বৎসরের ইতিহাসের আলোকে। চির নবায়মান ভারত-জীবনের এক বীর্যময় অভ্যুদয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ; বিশ্বজীবনের মহান রহস্যের এক জটিল পরিচয় ও আশ্চর্য নির্দেশ সে জীবনে আভাসিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন মাত্র ৪০ বৎসরের। পূর্ণ ৪০ বৎসরও নয়—ইং ১৮৬৩-এর ১১ই জানুয়ারি থেকে ইং ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত। এরই মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন। নিছক ব্যক্তি-জীবনের কথা রূপেও তা একটি চমকপ্রদ কাহিনী। আর তার তাৎপর্য বুঝলে দূর-দূরান্তরের মনীষীকেও প্রীতিতে, শ্রদ্ধায় মহৎ অনুভূতিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে হয়। তার প্রমাণ রমঁ্যা রলাঁ।

নিশ্চয়ই বিবেকানন্দকে নানা দিক থেকে দেখা চলে। কারণ, বহুমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা, আর তাঁর ব্যক্তিত্ব আপনার বিকাশের দাবিতেই দলের পর দল ছাড়িয়ে পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে। তার প্রত্যেকটি খণ্ডই তাঁর ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য, পরিণতির অবলম্বন ও আশ্রয়। তাই বহুদিক থেকে তাঁকে দেখা সম্ভব, আর সে দেখার প্রয়োজনও আছে। একই কালে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী : "জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ।" আবার, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শিষ্য : "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম?" শুধু সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নয়, চিরাগত পূজায় ও জীববলিতেও তাঁর আপত্তি নেই। অথচ তাঁরই মুখে শুনি, "কারও আদেশে বিশ কোটি দেবদেবীতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার অপেক্ষা যুক্তিকে অনুসরণ করিয়া যদি মানবজাতি নাস্তিক হয়, তাও ভালো।" তিনি অসামান্য কর্মযোগী, অতি প্রবল এক সন্ন্যাসী মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা। অথচ এই তাঁর পরম উপলব্ধি : "আমার

জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ ঘুচে যায়, আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় একেবারে লয় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।" সেই মুখেই লোকসেবার দাবিতে আবার শুনি, "মুক্তি নাই বা হলো। দু'চারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা।" এবং "যার পেটে ভাত নেই তার আবার ধর্ম কি?" তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আবার তিনিই স্বদেশপ্রীতির উদ্‌গাতা, তিনিই জাতীয় আত্মশক্তির মন্ত্রের বীর্যবান সাধক; "ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ" এই তাঁর ঘোষণা। "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মতো এই হবে আমাদের মূল সত্য—এই আমাদের দেবী ভারতমাতা। অন্য সব ফাঁকা দেবতারা আমাদের মন থেকে বিদায় নিন্। এই একমাত্র দেবতা যে জীবন্ত—আমার স্বজাতি,—তাঁর হস্ত সব দিকে, তাঁর পদ সব দিকে, সব দিকে তাঁর কর্ণ—সে সকলকে ব্যপ্ত করে আছে।" একদিকে শুনি, "এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই।" অন্যদিকে "জড়বাদ (মেটিরিয়ালিজম্) এক অর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত করেছে—জীবনের দুয়ার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে, জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিনষ্ট করে, যা মুষ্টিমেয় লোকের কবলিত ছিল আর যারা তা প্রয়োগ করতেও ভুলে গিয়েছিল সেই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারকে সকলের আলোচ্য করে।" "এখন চাই লৌহের মতো পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ুতন্ত্রী"। তিনি পলিটিক্‌সে বীতশ্রদ্ধ। অথচ তিনিই তার প্রিয়তম শিষ্যাকে আপন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনায় উৎসর্গ করে যেতে কুণ্ঠিত হলেন না। ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাস মোহে যিনি ঘৃণা করেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাছ থেকে চাইলেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা—চাইলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব—"আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এই হল এ যুগের দাবী।" আবার সেই সঙ্গেই মানুষের অধিকারের পূর্ণতর বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি চাইলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবাতেই ধর্ম, তারপর একেবারে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন—বললেন পৃথিবী-জোড়া শূদ্র-অভ্যুদয়ের প্রয়োজন ও অবশ্যম্ভাবিতা।

এই বিচিত্র প্রতিভাকে এসব কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখাও সম্ভব, বহুদিক থেকে দেখা কিন্তু ততোধিক প্রয়োজন। তা হলেই সেই ব্যক্তিস্বরূপকে সমগ্র করে, অখণ্ড প্রকাশরূপে দেখা সম্ভব হয়। আর সেই প্রয়োজনও সার্থকভাবে সম্পাদিত হতে পারে যদি ইতিহাসের প্রকাশমান

পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে দেখি। বিবেকানন্দের পরিচয় তখনি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতের নবজাগরণের রূপ

একশত বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তখনকার দিনের মোট রূপটা আজ সাময়িকতার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের চক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ তখন শাসনের ঔদ্ধত্য ও শোষণের নৃশংসতা নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত দেশ ও শোষিত জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলছে জাতীয় চেতনা, জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে যেমন সাম্রাজ্যবাদের পর্ব, তেমনি এ দেশের ইতিহাসে জাতীয় চেতনারও উন্মেষ কাল। ভারতবর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল ইতিহাসের এই দ্বৈত রূপ। বিশেষ করে তা প্রত্যক্ষ হয়েছিল বাঙলা দেশে, কলকাতায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। ঠিক ইং ১৮৬০-এর সময়ে বাঙালী জীবন আধুনিক যুগের প্রস্তুতি-পর্ব (ইং ১৮০০—১৮৫৮) ছাড়িয়ে প্রকাশের পর্বে (ইং ১৮৫৯—) উত্তীর্ণ হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ভারতের তথা বাঙলার নবজাগরণের ধারা তার মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের মতোই বিবেকানন্দের জন্ম। বিবেকানন্দেরও কৈশোর ও বাল্যের উপর দিয়ে নবজাগরণের ধারা জোয়ার তুলে চলে যায়। তাঁর যৌবন প্রত্যক্ষ করে সেই নবজাগরণের যৌবনজলতরঙ্গ —যার সম্বন্ধে তখনো এই অনুভূতি তাঁর চারিদিকে দেখা দিয়েছে "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?"

● আমাদের সেই নবজাগরণের মধ্যে অভাব-অপূর্ণতাও অনেক ছিল। না হলে 'ভারত' ও 'পাকিস্তানে'র উদ্ভব হলো কিরূপে ? দেশের সাধারণ মানুষের শোষণ-জ্বালায় ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে সেই নবযুগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সক্রিয় ভাবে সাড়া দিতে পারল না কেন ? কি কারণে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে তাদের প্রয়াস এমন খর্বিত রইল ? অভাব ছিল সেই নবযুগের মধ্যে, ছিল সেই সঙ্গে তাতে আভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্বও। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই ভারতীয় নবজাগরণের এই জটিলতা ও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; যাঁরা সেদিন আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রসর—পরবর্তী কালের নিকষে যাঁদের বলতে পারি 'লিবারল বুর্জোয়া' ভাবে প্রভাবিত, সামন্ততন্ত্রের বিরোধী—

তাঁরাই অধিকাংশে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে দেখি তখন অচেতন, আত্মশক্তিতে আস্থাহীন। আবার, যারা সবচেয়ে বেশি জাতীয় আত্মমর্যাদায় প্রবুদ্ধ—পরবর্তী কালের নিকষে যাদের বলতে পারি 'ন্যাশনালিষ্ট'—স্বাধীনতার প্রয়াসে উৎসাহী—তারাও প্রায়ই জাতীয় গৌরবের নামে সামন্ততন্ত্রের মোহগ্রস্ত, আত্মপ্রবঞ্চিত, আধুনিকতা অপেক্ষা অতীতের পুনরুজ্জীবনে তাদের অধিক আগ্রহ। সত্য বটে, যে কোনো বড় আন্দোলনের মধ্যেই এরূপ জটিলতা ও অন্তর্বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বকে সার্থকভাবে নিরসন করাতেই আন্দোলনের সার্থকতা। একথাও ঠিক, পরাধীন জাতির নবজাগরণের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, হয় না। একটা অন্তর্বিরোধকে ভেতরে-বাইরে পোষণ করেই আমাদের নবজাগরণের চেতনাও অগ্রসর হয়েছে। তবু সত্য এই যে—সে অগ্রসর হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে যায় নি। হয়তো ইতিহাসের ক্রমবর্ধিত ঘাত-প্রতিঘাতে তাও অনিবার্য ছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদও নিজের নিয়মেই হয়ে উঠেছিল 'ইতিহাসের এই অচেতন অস্ত্র—ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে তা নিঃশেষ করে দিয়েছে। আর আপনার অনিচ্ছায়ও এই বিপর্যস্ত শোষিত জাতির চেতনায় জাগিয়ে তুলেছে আত্মবিকাশের স্বপ্ন—বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাত্রা আয়ত্ত করার অভিলাষ—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮১৭) পর থেকে যা ক্রমশই ব্যাপক ও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই বুর্জোয়া মতাদর্শকে সেদিন 'পাশ্চাত্ত্য' বলে গণ্য করা হয়েছে, এখনো হয়। কারণ পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে, বিশেষ করে ইংলণ্ডেই, বুর্জোয়া ভাবনা ও ব্যবস্থার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই ভাবনার ভাবুকদের নাম তাই এদেশে যেমন হয়েছে 'পাশ্চাত্ত্যপন্থী' ('অক্সিডেন্টালিস্ট', রুশ দেশে যেমন নাম হয়েছিল 'ওয়েষ্টার্ণাইজারস্',), তেমনি তাদের প্রতিপক্ষীয়দের নাম এদেশে হয়েছিল 'প্রাচ্যপন্থী' ('ওরিয়েণ্টালিষ্ট', রুশ দেশে যাদের সগোত্র ছিল 'স্লাভেফিল', 'রুশোফিল্' গোষ্ঠী)। আজ অবশ্য আমরা জানি যে এই মতাদর্শ কোনো দেশের বা জাতির সম্পত্তি নয়। তা ইতিহাসেরই পরিণতি, সমাজ-বিকাশের একটা বিশেষ পর্ব। তাই তাকে 'বুর্জোয়া মতাদর্শ' বলাই বিজ্ঞান-সম্মত,। অন্তত 'পাশ্চাত্ত্য' বলা অপেক্ষা 'মডার্ন' বা 'আধুনিক' বললে (কিম্বা 'ফিউডাল' বলা অপেক্ষা 'মিডিয়েভাল বা 'মধ্যযুগীয়' বললেও) ততটা বিভ্রান্তির কারণ থাকে না। হয়তো স্বামী বিবেকানন্দের দিনেও থাকত না।

বিবেকানন্দের জন্মের পূর্বেকার প্রায় চল্লিশ বৎসরে এই 'পাশ্চাত্ত্য' ভাবধারা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন জিজ্ঞাসা—যুক্তিবাদী বিচার, 'মানুষের অধিকার' সম্বন্ধে অনুভূতি, ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, মানব-মহিমায় আস্থা প্রভৃতি বুর্জোয়া মানবিক মূল্যমান—এই পরাধীন জাতির বিশেষ বাস্তব ও মানসিক অবস্থায় বেঁকে-চুরে নানা পথে এসে এই 'প্রাচ্য' দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে আলোড়িত ও উদ্বেলিত করে তোলে—নানা কর্মেও তাদের চঞ্চল করে দেয়। 'পাশ্চাত্ত্য' বলেই ভারতীয় নবজাগরণের মধ্যেও নানা জটিলতা ও আবর্ত সৃষ্টিও ছিল তাই অনিবার্য।

জাগরণের ত্রিধারা

ইউরোপে বুর্জোয়া মতাদর্শ বা আধুনিক যুগধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল তার সমাজ থেকে। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লবের তিন-তিনটি বৃহৎ পর্ব পেরিয়ে তা পরিণতি লাভ করে। আমাদের দেশে তা এল বাইরে থেকে আগন্তুকরূপে ; সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। তদুপরি একেবারে একসঙ্গে আমরা তার পরিণতরূপকে দেখলাম উনিশ শতকে, একই কালে আমরা তার তিন চার শত বৎসরের দানের সম্পূর্ণ ফলভাগী হবার জন্য পাগল হয়ে উঠি। আমাদের নবজাগরণের প্রবাহ-মধ্যে তাই সেই রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক চেতনা ও উদ্যোগ, রিফর্মেশনের ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার, আর ফরাসী বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধ এই ত্রিধারা মিশ্রিত হয়েছে, আবর্ত সৃষ্টি করেছে, আবার বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে-হতেও সেই নব-জাগরণের মধ্যে সংযুক্ত থেকে নবজাগরণের সমগ্র প্রবাহকেই প্রবলতর করে তুলেছে। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই কালটিকে সমগ্রভাবে দেখলে আমরা এই জটিলতা বুঝতে পারি। রামমোহন একই কালে রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক চেতনার বাহন, রিফর্মেশনের সংস্কার-আন্দোলনের পুরোধা, ফরাসী বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় অধিকার-বোধের সমর্থক। এই ত্রিধারা তার পরে যতই বিকশিত হলো ততই কতকটা বিশিষ্ট হলো, কারণ বিকাশ অর্থই বিশিষ্টতা-অর্জন। তাই রামমোহনের পরে এই ত্রিধারার সামঞ্জস্য আর কারো মধ্যে অমন করে পাওয়া গেল না—পাওয়ার কথাও নয়। রামমোহনের যুক্তিবাদ ইয়ং-বেঙ্গলের ও বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের ধারা বেয়ে একদিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে রামমোহনের সংস্কার-প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সমুজ্জল হয়ে

ওঠে। আর তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনা ইয়ং-বেঙ্গল, যুবক দেবেন্দ্রনাথ ও রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্জের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এলেও যে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও দুর্বল থেকে যায়—১৮৫৭-এর দিকে তাকালে তা অস্বীকার করা যায় না। এই ত্রিধারার থেকে তথাপি কেউ একেবারে বিযুক্ত নয়—প্রত্যেকেরই জীবনে এক বা দুইধারা মুখ্য, অন্যটি গৌণ। এবং এই ত্রিধারার সম্মেলন ঘটে আবার স্বদেশীর যুগে, বিবেকানন্দের প্রেরণায় (যখন বিবেকানন্দ মরদেহে আর নেই), এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—যখন রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭-এর পরে) পূর্ণতর পরিণতির পথ তার সম্মুখে নির্দেশ করেন,—সেই পরিণতি অবশ্য এখনো অনায়ত্ত।

পাশ্চাত্যপ্রেরণার প্রবাহ

বিবেকানন্দের জীবন-কালেও একই সময়ে দেখি এই ত্রিধারার প্রবল বিকাশ। বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন—তাঁর বাল্য ও কৈশোর মধুসূদন-বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকাশে উজ্জ্বল। তাঁর যৌবন রবীন্দ্রনাথের সমুদিত আলোকচ্ছটায় প্রদীপ্ত। অন্য দিকে, ঠিক সেই সময়েই সংস্কার আন্দোলন তার শেষ গৌরবের পর্বে প্রবেশ করছে—কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (ইং ১৮৭৫-এর সময়ে) তা ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য ও আত্ম-সংস্কারের ও আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করছে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণর সাধনায়। তৃতীয়ত, জাতীয় মেলা ও ভারতসভাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় চেতনা আপনাকে রূপায়িত করবার দিকেও অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দের কৈশোর ও যৌবনে জাগরণের সকল ধারাই তাই উজান বইছিল। তাতেই বিবেকানন্দের জীবনে এত বৈচিত্র্য, এত জটিলতা, এত অপাত দ্বিধাদ্বন্দ্বও স্থান পেয়েছে।

তথাপি ইং ১৮৯৩ থেকে ১৯০৩ থেকে পর্যন্ত কালটিকেই বলা যায় বিবেকানন্দের জীবনকাল—তার পূর্বেকার জীবনটা তাঁর পূর্বজীবন, প্রস্তুতির জীবন। সেই দশ বৎসরে তিনি সম্পূর্ণ সুসংগঠিত অদ্ভুতকর্মা পুরুষ, সেই দশ বৎসরে স্পষ্টতই তিনি সন্ন্যাসী ও সুসংগঠিত ধর্মান্দোলনের নেতা। সেই দশ বৎসরে কিন্তু বাইরের রাজনীতিতেও একটা প্রবল পরিবর্তন ঘটছিল,—ইং ১৯০৪-১৯০৫-এর পৌছে—তাতে আর সন্দেহ রইল না। সে পরিবর্তন কী? বলা যেতে পারে, ভারতীয় রাজনীতি লিবারলদের প্রভাব কাটিয়ে তখন (১৮৯৩—১৯০০) জাতীয়তাবাদীদের হাতে আপনার দায়িত্বভার দিচ্ছিল। তিলক ও অরবিন্দের আবির্ভাবে তাই সূচিত হয়। আসলে 'জাতীয়মেলা'র মধ্যেই ছিল এই রাজ-

নীতিরও বীজ। শুধু কি রাজনীতিতেই? সাহিত্যে ও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র পর্বে প্রবেশ করলেন এই কামনা নিয়ে 'এবার ফিরাও মোরে'। স্বদেশচিন্তায়, সমাজ-চিন্তায় সাহিত্যক্ষেত্র থেকেও তিনি আত্মশক্তির মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর জীবনেও এটা স্বাজাত্যের পর্ব।

ধর্মান্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন তার পূর্বে (১৮৭৫) মোড় ঘুরে গিয়েছিল (১৮৭৫—৯০) এই ভারতীয় আত্মমর্যাদার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনায়। আসলে ভূদেব ও বঙ্কিমের মধ্যেও কি ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের সেই আত্মসংস্কারের প্রয়াস দেখা যায় না—রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির 'ধর্মসভা'র প্রচেষ্টা থেকে যা স্বতন্ত্র? যা হিন্দু কাউন্টার রিফর্মেশনেরই তুল্য? শাস্ত্রকে বুদ্ধির দ্বারা, যুক্তির দ্বারা শোধনের চেষ্টা রামমোহনও অবজ্ঞা করেন নি, দেবেন্দ্রনাথও না। কিন্তু সংস্কার আন্দোলন আপনারই গতি নিয়মে সেই মধ্য পথে আবদ্ধ থাকতে পারে নি, যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে,—'ইয়ং বেঙ্গলের' মতো দুঃসাহসে নয়, কেশবচন্দ্রের মতো সৎসাহসেই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই সৎসাহসের বশেই ভক্তিপ্রবণ কেশবচন্দ্রকে পিছনে ফেলে গেল (১৮৭৮)—'সাধারণ' হবার শুভ যুক্তিতে। কিন্তু এই যুক্তিবাদের স্রোত শুধু শাস্ত্র ও আচার-বিচারকেই ভাসিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকে নি—ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় মর্যাদাবোধকে অনেকটা ক্ষয় করে দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ এগিয়ে চলে। বুর্জোয়া জীবনাদর্শের নামে পাশ্চাত্ত্য আচার-নিয়ম, সমাজ-রীতিকে বরং ব্রাহ্মকর্তৃত্ব অনাবশ্যক মূল্য দিয়ে বসে। ভারতীয় সাধারণ মানুষের থেকে ও সাধারণ জীবনযাত্রার ঐতিহ্য থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ তাই প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ফলে, ভূদেব ও বঙ্কিমের মধ্যে যার আভাস দেখি সেই জাতীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ, জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা ধর্মে ও সমাজে আত্মসংস্কার ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে শতাব্দীর শেষ পাদে মাথা খাড়া করে উঠল। তার একটা উদ্ভট চেষ্টা থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিতেও তখন (১৮৭৮) দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে উত্তরভারতে 'আর্যসমাজে'র আন্দোলনে, আর বাঙলা দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। বুর্জোয়া মতাদর্শকে পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির সঙ্গে এক করে দেখাতেই ব্রাহ্মসমাজ নরেন্দ্র দত্তকে তৃপ্ত করতে পারে নি—হিউম্, মিল স্পেন্সারের যুক্তিবাদও যেমন তাঁকে সম্পূর্ণ অবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। অথচ রামমোহনের অদ্বৈত-ভাবনা, সংস্কার-ভাবনা, বিবেকানন্দ হয়েও তিনি তুচ্ছ করতেন না। তিনি ত্যাগ করলেন

ভারতীয় লিবারল্ বা 'সংস্কার'বাদীদের ভূমিভ্রষ্ট নিরলম্বতা, গ্রহণ করলেন সেই জাতীয় ঐতিহ্য, সাধারণের সঙ্গে একাগ্রতা, জাতীয় আত্মসংস্কার ও জনসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্রত। বিবেকানন্দের সঙ্গে কিন্তু ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে যোদ্ধবেশে আবির্ভূত হলো 'এ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজম্', যা শুধু ভারতীয় ন্যাশনালিজম নয়, সেই সঙ্গে কতকাংশে হিন্দু রিভাইভালিজম্ও। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যুগাবতার, বিবেকানন্দ তার দিগ্‌বিজয়ী মহারথী।

মূল কথা, নবজাগরণের ধারা শতাব্দীর শেষভাগে (ইং, ১৮৭৫-১৯০০) মানুষের অধিকারবোধ ও জাতীয় অধিকারবোধ, জাতীয় সংস্কৃতিবোধ ও জাতীয় ধর্মবোধরূপে জাতীয় চেতনায় প্রাণবন্ত সবল রূপ পরিগ্রহ করছিল। বিবেকানন্দ নবজাগরণের বিচিত্র ভাবনারই মধ্য দিয়ে এসে এই নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রধান উদ্গাতা রূপে সেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে (ইং ১৮৯৩—১৯০০) দণ্ডায়মান হলেন—একেবারে যোদ্ধবেশে—ডাক দিলেন নবোদ্বুদ্ধ ভারতকে 'অভীঃ। বীর্যবান্ হও! তুমি অমৃতের সন্তান।' তাঁর প্রধান প্রেরণা এই স্বাজাত্যের প্রেরণা।

বিবেকানন্দের বাণীরূপ

এই বিবেকানন্দই মৃত্যুর পরেও ইং ১৯০৫ থেকে প্রায় ১৯৩০ পর্যন্ত বাঙলার ও ভারতের জীবনে জীবন্ত, নবজাগরণের বীর্যবান সাধক। স্বকাল ছাড়িয়ে তিনি এরূপে ভাবীকালের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হন কী প্রাণ-মন্ত্রের উদ্গাতা-রূপে তা আমরা দেখলাম। তাঁর মধ্যে সেই ত্রিধারার সংযোগ যথেষ্ট না থাকলে তা সম্ভব হত না, এইটুকুও সেই সঙ্গে বুঝবার।

নবজাগরণের সেদিনে (ইং ১৮৭৫-১৯০০) সাহিত্যক্ষেত্রে বিবেকানন্দ পদার্পণ করেন নি। কিন্তু তাঁর চিত্ত যে রসসম্পদে ঐশ্বর্যবান্ ছিল তা তাঁর যে কোনো লেখা ও যে কোনো বক্তৃতা পড়লেই অনুভব করা যায়। আরও বেশি অনুভব করা যায় এ কথা—তিনি সাহিত্যশিল্পী, বাঙলা ভাষার উপর ছিল তাঁর অসামান্য ক্ষমতা। সঙ্গীতে শিল্পে সাহিত্যে বিবেকানন্দের অনুরাগের কথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু বাঙলা ভাষার যে তিনি অসামান্য লেখক এ কথাটা অনেকেই বিস্মৃত হন। বিশেষ করে চলতি বাঙলায় এমন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না। সে যুগে 'য়ুরোপ যাত্রীর

ডায়েরি' ও জলধর সেনের 'হিমালয়' ছাড়া আর কোথাও এমন অকুণ্ঠিত কথিত ভাষার ব্যবহার মনে পড়ে না।

> বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁর সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।…চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও কি একটা কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, সে ভাষা কি দর্শনবিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?…ইত্যাদি

বিবেকানন্দের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে এই দাবি তুলেছিলেন স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী, বার বৎসর পরে প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'। যুক্তির দিক থেকে এ বিষয়ে এর চেয়ে নতুন ও বেশি সঙ্গত কথা তাঁরও জানা ছিল না! আর ভাষার দিক থেকে বলা যায় বিবেকানন্দের থেকে বলিষ্ঠ বাঙলায় আর কেউ লিখতে পারেন নি। 'পত্রাবলী', 'ভাববার কথা', 'পর্যটকের পত্র', প্রভৃতি মূল বাঙলা লেখায় চলতি বাঙলার যে স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠ রূপ দেখা যায় তা আর চলতি বাঙলা ফিরে পায় নি। ধরা যাক্ ওস্তাদী গানের কসরতির সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কথা:

> গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধুম। সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল, ছত্রিশ নাড়ীর টান চায় রে বাপ!

কিম্বা স্থাপত্য সম্বন্ধেই ধরা যাক্ তাঁর কথা যিনি নিবেদিতার গুরু:

> বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গী। থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রের কি ধুম!

> মনের অশান্তি, তার মানে কোনো কাজ নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর। নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক্, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ।

এ ভাষা গঙ্গার জল—কলের নয়, ক্লোরিন মিশ্রিতও নয়। কারণ,

> যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে জাতীয় জীবনে যেমন-যেমন বল আসবে, তেমন-তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

কিম্বা সেই সুবিদিত বজ্রগম্ভীর প্রার্থনা :

> "তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালো মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।"...ইত্যাদি।

এ তো ভাষা নয়। এ জীবন্ত মানুষ—ভাষার এ পৌরুষ সেই পুরুষ-প্রবরের ব্যক্তিস্বরূপ থেকেই উদ্ভূত। The style is the man. তাই সাধু বা চল্‌তি যে রীতিতেই যখন তিনি কলম চালিয়েছেন তখনি তাতে ফুটেছে এই বজ্রনির্ঘোষ।

বিবেকানন্দের ধর্মসাধনা

এতখানি রসবোধ, শিল্পবোধ ও প্রকাশশক্তি সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ যে কেন মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ হলেন না, এই খেদ বা বিস্ময়ও তাই সহজেই জন্মে। হয়তো তার মুখ্য কারণ এই যে রসপিপাসা অপেক্ষা সত্য-জিজ্ঞাসাতেই তাঁর রুচি ছিল বেশি। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল পৌরুষের প্রাধান্য। তাই নবজাগরণের সাহিত্যোৎসবে তিনি যোগ দিলেন না, 'মানুষ-গড়ার ধর্মে' আত্মনিবেদন করলেন।

আর নবজাগরণের অন্য প্রকাশ—রাজনৈতিক প্রয়াস ? 'পলিটিক্‌সে'র প্রতি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রবল বিরাগ। তার বিরুদ্ধে আপনার মত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি—"পলিটিক্‌স্ আমি ঘৃণা করি।...আমার পলিটিক্‌স ভগবান।" অতএব, নবজাগরণের নানাবিধ ভাবনা-কল্পনা বিবেকানন্দের বিচিত্র সত্তায় মিলিত হলেও নরেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারেই পেয়েছিলেন প্রধানত আপনার সাধন-ক্ষেত্র। এমন কি, সেই ধর্ম-সাধনারই প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব স্বীকার করেছিলেন সমাজ সংস্কারেরও দায়িত্ব। এই বিশেষ ক্ষেত্রেই তিনি উত্তীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনো মতবাদ প্রচার করেন নি, কাউকে দীক্ষা দান করেন নি,

বিবেকানন্দকেও না। একদিকে ভারতের চিরাগত ধর্মসাধনা সেই প্রায় 'নিরক্ষর' পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আশ্চর্য-রূপে আধুনিক যুগাদর্শ সেই মানবিকতা, সেই 'যত জীব তত শিব', 'যত মত তত পথ', ওই ভারতীয় ধর্ম প্রস্থান ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। বিবেকানন্দ তাই তাঁরই সেই আলোকে একই কালে ভারত-ঐতিহ্য ও যুগাদর্শ লাভ করেন, আত্মাবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। নবজাগরণের এই বিশেষ সাধক নরেন্দ্রনাথকে এরূপে বিবেকানন্দে পরিণত করেন—যুগাদর্শকে ভারতীয় আধারে স্থাপন করে। বিবেকানন্দের আত্মবিকাশের পথে আর যা প্রয়োজন ছিল তা হলো এই ভারতীয় আধারের সঙ্গে নিবিড়তর ও ব্যাপকতর পরিচয় ও যুগের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষের সেই করুণ মহান রূপকে তিনি চিনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাবসানের পরে, ইং ১৮৮৭-১৮৯৩ পর্যন্ত কালে, ভারত পর্যটন করে। বিবেকানন্দের দ্বিতীয় গুরু যদি কেহ থাকেন তবে সে এই ভারতবর্ষের জনসাধারণ। কিন্তু আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল—আরও উপলব্ধির—তৃতীয় এক গুরুর। জটিলতর বুর্জোয়া জীবনের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ে তা তিনি লাভ করলেন ইং ১৮৯৩ থেকে ইং ১৮৯৬ পর্যন্ত, এবং পরেও (ইং ১৮৯৯-ইং ১৯০০) আমেরিকা ও ইউরোপের জীবন্ত সমাজ দর্শন করে। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-সাধনার যেমন ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা রচিত—অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেই সাধনা তেমনি পূর্ণাঙ্গ ও নিজস্ব হয়ে উঠেছে তাঁর স্বদেশপ্রীতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে ও লোকসেবার ও দরিদ্র-নারায়ণের ভাবনার বিকাশে; আর তাঁর সার্বজনীন মানবিকতার, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধের এবং সর্বশেষে 'শূদ্র' বা শোষিত সাধারণের প্রীতি মমতায় ও আস্থায়। শুধু অধ্যাত্ম সাধনায় বিবেকানন্দ হয়তো দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ হতে পারতেন। ইং ১৮৯৯তে কাশ্মীরে বীরভবানীর মন্দিরের অভিজ্ঞতার পরে সেই অদ্বৈতবাদী সাধক সেই সিদ্ধিতেও গিয়ে পৌঁছেছিলেন, মনে করা যায়। ১৯০০ সালের কালিফোর্নিয়ার অবিস্মরণীয় দীর্ঘ ইংরেজী পত্রে সেই কথাই শুনতে পাই:

> আহা, কি স্থির প্রশান্তি। চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি, মধুর শান্তি, যেন যা কিছু দেখছি, শুনছি সকল ছেয়ে রয়েছে…

আমার মনের এখনকার অবস্থা ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি।...

বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজীবনের এইটিই পরম স্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জলন্ত স্বদেশপ্রীতি, বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অনুভূতি ও শোষিত মানবতার প্রতি প্রাণভরা মমতা, এই তিন ভাবনা তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে পরিপোষণ না করত, তাহলে বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হতে পারতেন না—ভারতের অনেক 'মুক্ত পুরুষে'র মতো আর একজন মুক্তপুরুষ হয়ে থাকতেন।

বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অদ্বৈতবাদকেও বিবেকানন্দ এই তিন আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই আপনার বিশেষ অধ্যাত্মপ্রস্থান রূপে গ্রহণ করেছিলেন ও প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় এমন কিছু ছিল না যাতে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ অনিবার্য ছিল। বরং দ্বৈতবাদই তাতে বেশি গ্রাহ্য হবার কথা। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠাও কোনো মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরিহার্য কর্ম নয়। তা অপরিহার্য হয় নবজাগরণে জাগ্রত বলেই এই মানবহিতব্রত সন্ন্যাসীর পক্ষে। আর সর্বশেষে, চিরসমাধির পূর্বেও এই অধ্যাত্মযোগী তাঁর প্রিয়তম শিষ্যা নিবেদিতাকেই বা কেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করে ভারতীয় বৈপ্লবিক সাধনায় আত্মনিবেদনের অনুমতি দিয়ে গেলেন? এ যুগের ধর্ম-সাধনায়, সমষ্টিগত মুক্তির সাধনাতেই ব্যক্তিরও মুক্তি-সাধনা বলে নয় কি?

এই সব কথা উত্থাপন করলে প্রশ্ন ওঠে—তবে কেন বিবেকানন্দ পলিটিক্সের প্রতি বীতরাগ ছিলেন? তার জন্য বুঝতে হয়—'পলিটিক্স্' বলতে তিনি যা বুঝতেন, যা নিজের জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে দেখেছিলেন, তা সত্যই তুচ্ছ পদার্থ। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় 'পলিটিক্স্' বলতে তখন বোঝাত দল বেঁধে শাসনের নামে শোষণের খেলা, স্বদেশে ও বিদেশে লুণ্ঠনের ব্যবসা। তাতে স্বার্থ যতটা—অনর্থ অবশ্য আরও বেশি থাকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের নামগন্ধও থাকে না। আর শৌর্যবীর্যের পুরুষার্থেরই বা সত্যকার প্রয়োজন তাতে কোথায়? ভারতবর্ষে পলিটিক্স্ তখন আরও তুচ্ছ—'আবেদন আর নিবেদনের থালা' বহনের কেরামতি, greater association of Indians in the administration of India. সেদিনের কংগ্রেসের বড় স্পর্ধা—বড় দাবি 'আরও চাকর

হতে দাও মা, মহারাণী'। দেশের ভাব ভাষা, সাধারণ মানুষ, কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এই পলিটিক্‌স যে কোনো সুস্থ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই অগ্রাহ্য। বীর কেশরী বিবেকানন্দ এই চাকরী-প্রত্যাশীদের রাজনীতিকে গ্রহণ করবেন, এ কথা চিন্তা করাও যায় না। সত্যই তাঁর পলিটিক্‌স্ ভগবান—এই অর্থে যে সে 'অদ্বৈতম্' 'আব্রাহ্মণ চণ্ডাল মানবতায় সমভাবে সমাসীন, মানুষ মাত্রই তাতে মনুষ্যত্বের মহান অধিকারের অখণ্ডনীয় উত্তরাধিকারী ; বিচিত্রের মধ্যে অদ্বৈতরূপে তা বিশ্বমানবের ঐক্যসূত্র।

এ কথাও অবশ্য তিনি জানতেন—ক্যালিফোর্নিয়ায় ইং ১৯০০তে শেক্‌স্‌পীয়র ক্লাবের বক্তৃতায় যা তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ভারতবর্ষে পলিটিক্‌সের কথা বলতে হলেও তোমাকে তা বলতে হবে ধর্মের ভাষায়।" বুঝতে পারা যায়—সেদিনের রাজনীতি কেন বিবেকানন্দকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট না করে বরং সেরূপ অধ্যাত্মপ্রস্থানের দিকেই ঠেলে দিয়েছিল যেখানে তাঁর স্বাজাত্যাভিমান পেয়েছে স্বস্তি, তাঁর পৌরুষ পেয়েছে আত্মবিকাশের সার্থকতা ; তাঁর মানবিকতা পেয়েছে কর্মযোগে সার্বজনীন মুক্তি-সাধনার মহৎব্রত !

এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল বিবেকানন্দের মৃত্যুর প্রায় পরক্ষণেই—ভারতীয় রাজনীতি যখন স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করল। বিবেকানন্দ কী চাইতেন কী চাইতেন না, নিশ্চয়ই সে প্রশ্নের এক উত্তর একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা—ভগ্নী নিবেদিতা—অন্য উত্তর যেমন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন।

বিবেকানন্দ ও বিপ্লবী আন্দোলন

তৃতীয় একটা উত্তরও আছে—বাঙলা দেশের ১৯০৫ থেকে প্রায় ১৯৩০-এর জীবন। এই পর্বটিকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ—সর্বাধিক জাতির আশীর্বাদ লাভ করেছে তখন রামকৃষ্ণ মিশন। এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন সেদিনের বিপ্লবী বাঙলার বিপ্লবীদের বিবেকানন্দের বীরবাণী সর্বাধিক প্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার-হাজার বুকে জ্বলেছে এই মন্ত্র—

> হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

শুধু তাই নয়—হাজার-হাজার মানুষ মনে মনে মেনেছে এই সত্য :

> তোমরা (উচ্চ শ্রেণীরা) শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত সেই স্থানে বের হোক। বের হোক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বের হোক্ মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বের হোক্ কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বের হোক্ ঝাড় জঙ্গল, পর্বত পাহাড় থেকে।···

সম্মুখে এই 'উত্তরাধিকারী ভারতের' স্বপ্ন নিয়ে সেদিনকার বাঙলা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকসেবায়। দুর্ভিক্ষে প্লাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে এগিয়ে গিয়েছে প্রথম দিকে (১৯০৭—১৯২১), তারপর কংগ্রেস সংগঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মের পতাকা নিয়ে (১৯২১-এর পর থেকে)—বিদেশীয় শাসকশক্তিকে করে দিয়েছে ভারতীয় জীবনে অবান্তর, অনাবশ্যক। বিবেকানন্দের মিশন এভাবেই পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে চলেছে শতাব্দীর সেই প্রথম দু তিন দশক জুড়ে।

তাই বাঙলার তৎকালীন গবর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌শে দ্বিতীয় দশকে এক সভায় বাঙালী বিপ্লবীদের উল্লেখ করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন--বিবেকানন্দের বাণী বিপ্লবী দলকে প্রেরণা দেয় ; রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মে তাঁরা বাস্তব আশ্রয় লাভ করে। কথাটা চমকিত করে তোলে সেদিনের মিশনের কর্তৃপক্ষকে। যাঁদের আশ্রয় নিবেদিতার পর্যন্ত এই বিপ্লবী কর্মোৎসাহের জন্য ত্যাগ করা প্রয়োজন হয়েছিল স্বভাবতই তাঁদের প্রতি এটি রোনাল্ডশে'র অমূলক সন্দেহ। মিশনের কর্তৃপক্ষ তখনি তাই গবর্নরের নিকট আপত্তি জানান ; তাঁদের সে আপত্তি রোনাল্ড্‌শে সাহেবও মেনে নেন,—সত্যই মিশন রাজনীতি-সম্পর্কশূন্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মহত্তর ন্যায়বোধ তেমনি অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করত—বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণমন্ত্র জোগাচ্ছিলেন মিশন না হোক্, স্বয়ং বিবেকানন্দ। বিপ্লবী সাধন-পদ্ধতির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল বিবেকানন্দ প্রচারিত লোকসেবা ও গীতার নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্যও ছিল তাঁরই নির্দিষ্ট আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মুক্তি, সবজাতির মানুষের অধিকারে এ দেশের মানুষেরও প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের ভাষায় :

> "তাই আমরা চাই—কারও জন্য বিশেষ সুবিধা নয়, সকলের সমান সুযোগ। সকলকেই শেখাতে হবে ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে আছেন

আর প্রত্যেককেই তার নিজের পথে অর্জন করতে হবে তার মুক্তি।"

তখনো বিবেকানন্দের অন্য স্পষ্ট ঘোষণা ছিল প্রায় সযত্নে সংগোপিত: "I am a socialist" তবু শোনা গিয়েছিল বিবেকানন্দের সেই উক্তি—ব্রাহ্মণের যুগ, ক্ষত্রিয়ের যুগ গিয়েছে, বৈশ্যের যুগ এখন চলছে; এবার আসছে শূদ্রের যুগ—পশ্চিমে তার প্রথম আভাস দেখা দিয়েছে। "সোশ্যালিজম্, এনার্কিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি মতবাদের পথিকরা হচ্ছে আগতপ্রায় সেই সমাজ বিপর্যয়ের অগ্রদূত।" অর্থাৎ দরিদ্রনারায়ণের সেবা শেষ কথা নয়—চাই দারিদ্র্যের অবসান, শোষণের বিলোপ, শোষিতের মুক্তি। এই 'আগত-প্রায় সমাজ-বিপ্লব'ও ইং ১৯১৭ সালেই এসে গেল। আর, ১৯৩০ সাল থেকে বলা যায় বিবেকান্দের পরিদৃষ্ট সেই সম্ভাবনা ভারতবর্ষেও বাস্তব আকার লাভ করতে লাগল শুধু কারান্তরিত বিপ্লবীদের বুকে নয়, 'হুইদার ইণ্ডিয়ার' অশান্ত প্রচারক জওহরলালের মুখেও। সুভাষচন্দ্র খেদোক্তি করছিলেন 'মঠ' ও 'মিশন'কে সেখানে না পেয়ে।

ইতিহাসের বিচার

একথা পরিষ্কার করেই বুঝা দরকার—১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবীদের 'সোশ্যালিজম্' ও বিবেকানন্দের 'সোশ্যালিজম্' বা শূদ্রের শাসন এক জিনিস নয়—জওহরলালের 'সোশ্যালিজম্'ও নয়। বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদী, অদ্বৈতবাদী —এবং 'জড়বাদের' ঘোরতর শত্রু। বুর্জোয়া সভ্যতায় পাশ্চাত্ত্য দেশের অগ্রগামী বুর্জোয়া ভাবনা ও প্রয়াস সমূহে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—ব্যক্তিজীবনে তার বাস্তব দান ও সমাজ-জীবনে শ্রেষ্ঠ মূল্য সমূহ রূপায়িত করতে। মিশনের কাজেও সেই সংগঠন-পদ্ধতি গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অবহেলা বিবেকানন্দ করেন নি। কিন্তু কিছুমাত্র তাঁকে আকর্ষণ করে নি বুর্জোয়াদের মেটিরিয়ালিজম্, তার ভোগবাদ। বরং এই ভোগবাদের উপর তিনি দৃপ্ত যোদ্ধার মতোই ভারতের ত্যাগবাদী আদর্শকে জয়ী করতে চেয়েছেন। এ হিসাবেই তিনি মায়াবাদের সমর্থক—এই বিলাস-বর্বরতা ও ভোগরাশির মধ্যে সত্য কোথায়? যারা এই ভোগের আদর্শ গ্রহণ করেছে তারাই মরেছে, জীবিত আছে বরং মায়াবাদী আদর্শের ত্যাগব্রতীরা।

"তারা (অপরেরা) যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই

দেখিতেছি সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানেরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।"

একথা এ প্রসঙ্গে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'অবিদ্যার' দ্বারা যে বুর্জোয়া সভ্যতা বা সোশ্যালিস্ট সভ্যতা মৃত্যু উত্তীর্ণ হতে চায় তা 'জড়বাদী' নয়; বস্তুবাদী বা 'মেটিরিয়ালিস্ট', জীবনধর্মী—অলৌকিকে বা অপ্রাকৃতে আস্থাহীন। মানবতায়, প্রীতিতে, মমতায় ও শিল্পে, বিজ্ঞানে সৃজনপ্রয়াসে তারা মানুষের 'অধ্যাত্মবোধকে' একটা বাস্তব (objective) সার্থকতা দিচ্ছে—ভাবময় (subjective) ধ্যানই অধ্যাত্মবোধের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। নিঃসন্দেহে আধুনিক বস্তুবাদ ভোগকে প্রাণের প্রাথমিক প্রয়োজন বলে স্বীকার করে। কিন্তু ভোগসর্বস্ব মেটিরিয়ালিজম্ হচ্ছে ভালগার মেটিরিয়ালিজম্। ভোগের প্রাধান্য যদি সোশ্যালিষ্ট সমাজে মননের ও আত্মিক সৃষ্টির প্রয়াসকে আচ্ছন্ন করে,—সেই সমাজেও রোমসাম্রাজ্যের মতো যদি 'রুটি ও সার্কাসের' প্রবৃত্তিই জয়ী হয়,—তা হলে অবিদ্যার এই সন্তানগণের পরিণামও মৃত্যুই—সে কথা মিথ্যা নয়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে এই কথাটা বুঝা আরও প্রয়োজন—স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে 'মায়াবাদ' ও 'অধ্যাত্মবাদ'কে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে তার অপব্যাখ্যা সহজতর। এ দেশ ত্যাগের দেশ, এ কথাটা অর্ধসত্য। কারণ বিবেকানন্দই বলতেন যার কিছু নেই সে আবার ত্যাগ করবে কি? তথাপি বিবেকানন্দ ঐতিহ্য-সম্মত সনাতনী রীতিনীতি ও ভাষা ব্যবহার করাতে তাঁরই অপব্যাখ্যায় অবতারবাদ, গুরুবাদ ও নানা রূপ অলৌকিক কাহিনী (myth) ও যুক্তিহীনতা এখন জোর পেয়েছে।

লিবারল সংস্কারবাদীদের সাহেবী-অনুকরণকে নিরস্ত করে তিনি স্বাজাত্যাভিমানের বশে নবজাগরণের মধ্যে যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, তাতেও অবিদ্যার প্রশ্রয় অসম্ভব নয়। পুরাতন পূজাপদ্ধতি, রীতিনীতি, এবং তার সঙ্গে একটা উপরতলার অধ্যাত্মবিলাসে বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ ও সোশ্যালিজম্' এই 'মহামায়ার সন্তানদের' নিকট সন্দেহজনক, অবহেলিত ও পরিহার্য হয়ে উঠছে। তারাও বাঁচবে না যারা অধ্যাত্মবাদের ভাবসর্বস্বতাকেই (subject-ivism) মনে করে যথেষ্ট. শোষণকেও মেনে নেয়—মহামায়ার মায়া।

এই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ যখন বিবেকানন্দকে আমরা স্মরণ করি তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাঁকে স্মরণ করবেন

প্রধানত অধ্যাত্মবাদী সাধকরূপে। তাঁদের সেই দৃষ্টি যে মিথ্যা নয় তা আমরা পূর্বেই মেনে নিয়েছি। সেই সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম ও দরিদ্র নারায়ণকেও তাঁরা কিছু মূল্য দিবেন আশা করি, না হলে সেই কথাই সত্য হবে—খ্রীষ্টের স্থান নেই চার্চে, বিবেকানন্দেরও স্থান নেই মঠে-মিশনে। কারণ যে বিবেকানন্দ স্বদেশ-প্রেমিক—ভারতবাসীকে আত্মমর্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ করেছেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহস জুগিয়েছেন—যে বিবেকানন্দ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকতে নিজে অন্নগ্রহণ করাকে মনে করেছেন অন্যায়, যে বিবেকানন্দ যুগগতির দ্রষ্টারূপে ঘোষণা করছেন "আমি সমাজতন্ত্রী" আর যে বিবেকানন্দ স্বজাতির মুক্তির ও মানুষের সর্বজাতিক ঐক্যের দৃঢ় প্রবক্তা—দেশের ও বিদেশের জনসাধারণের কাছে তিনিই পরম আত্মীয়, তিনিই ইতিহাসের মধ্যে জীবন্ত বিবেকানন্দ। অবশ্য আমরা সর্বদেশের সাধারণ মানুষরা তাঁকেই বিশেষ করে যখন স্মরণ করব সেই সঙ্গে যেন মনে রাখি—মেটিরিয়ালিজম্ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ও বিরাগের কারণ। মেটিরিয়ালিজম্ জড়বাদ নয়, ভোগবাদ নয়; তা মানবধর্ম, মানবিকতার বাস্তব সাধনা। ইতিহাসের এই সত্যকে অনুভব করাও এই ঐতিহাসিক পুরুষের স্মৃতিপূজার সময়ে কম প্রয়োজন নয়॥

পুস্তক পরিচয়

The Reivers—William Faulkner. Chatto and Windus. 18s.

প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

"আমার শেষ বই হবে ইয়োক্‌নাপাটোফা জেলার ডুম্‌স্‌ডে বুক্‌, গোল্ডেন বুক্‌। তারপর পেন্সিল ভেঙে আমি ক্ষান্ত হব।" ফক্‌নর বলেছিলেন, পারী রিভিউ-এর প্রতিনিধি জীন্ স্টাইন্‌কে। ফক্‌নর এই শেষতম কীর্তিতে কি সেই প্রতিশ্রুতি রাখলেন? "দি রিভার্স" পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, ইয়োক্‌নাপাটোফা জেলার উপাখ্যান যেন এতদিনে সম্পূর্ণ হল: চাকা পুরো ঘুরে এসেছে। এবং ঐ সম্পূর্ণতার আভাস দেবার অভিলাষেই বোধ হয় ফক্‌নর তাঁর সাবেকী স্বর ও মেজাজ বদলে ফেলেছেন: ফক্‌নরকে প্রায় অচেনা লাগে। ডুম বা ফেট্যালিটির ছায়াও এবার সরে গেছে।

ইয়োক্‌নাপাটোফা নামে যে অ্যাপোক্রাইফাল প্রদেশটি ফক্‌নর সৃষ্টি করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ঐতিহাসিক সমাজস্বরূপই তার ভিত্তি। এই দক্ষিণাঞ্চলই গৃহযুদ্ধে দাসত্বপ্রথা, বর্ণবিদ্বেষ ও তৎসন্নিহিত তাবৎ রক্ষণশীল ভাবধারার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল। পরাজয়ে তার মনোভাব রাতারাতি বদলে যায়নি, বরং ক্ষোভ চাপা আক্রোশ হয়ে বেঁচে থেকেছে। ব্যর্থতার ক্ষোভের এই ভিত্তিতেই দক্ষিণী মনের মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। বংশগৌরব ও রক্তের সম্পর্ক স্বভাবতই ফিউডাল চিন্তাধারার অবশেষরূপে রয়ে গেছে। এ অঞ্চলে মাখামাখি বা রেশারেশি, সবই ঐ কটি পুরনো পরিবারের মধ্যে—সার্টোরিস্, স্টীভেন্‌স্, কম্পসন্, ম্যাক্যাসলিন্, সাটপেন্, কোল্ড্‌ফিল্ড্। অদ্ভুত অতিতাশ্রয়ী অবাস্তব এই মনস্তত্ত্বের চাপে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে না পেরে, সমাজের দিকে খোলা চোখে তাকাবার সাহস না পেয়ে এরা অসুস্থ মনোবিকারে জ্বলে মরে। মন যতই সঙ্কীর্ণ হয়, ততই একরোখা হয়। সংস্কারের গণ্ডিতে এরা আবদ্ধ থাকে, বাইরের আলো-হাওয়ার আস্বাদ পায় না; আর, ক্ষুদ্র স্বার্থ, বালকোচিত অভিমান, কখনও বা কোনো তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা জীবনের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কম্পসন্ বিদ্রোহিণী ভগিনী ক্যাণ্ডেস্-এর ওপর শোধ তোলে, বেয়ার্ড

সার্টোরিস্ নতুন মোটরগাড়ির গতির নেশায় পাগল হয়, কোয়েন্টিন কম্পসন্ বংশের শুদ্ধতাহানির সাক্ষাতে আত্মঘাতী হয়। ফক্‌নর যে প্রায়ই ভিন্ন চরিত্রে একই নাম ব্যবহার করেন, তারও তাৎপর্য অনুমেয়—একই রক্ত, একই চেতনা বংশানুক্রমে যাদের মধ্যে প্রবাহিত, তাদের নামমাত্রে কী আসে যায়?

ফক্‌নরের উপন্যাসে এতদিন এই শ্রেণীর পাশেই ঈষদুন গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েছে নিগ্রো পরিচারক-পরিচারিকা শ্রেণী এবং দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বা মিশ্রবর্ণ সমাজ। 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি' উপন্যাসে নিগ্রো পরিচারিকা ডিল্‌সি তীব্র সংঘর্ষের মুহূর্তেও ক্যাণ্ডেস্ কন্যা কোয়েন্টিনের সপক্ষে দাঁড়ায়, শক্তিমান প্রভু জেসন্‌কে বাধা দেবার সাহস রাখে। ফক্‌নর নিজেই বলেন, "ডিল্‌সি আমার প্রিয় চরিত্রগুলির মধ্যে একজন। কেননা, সে বীর, সাহসী, উদার, কোমল, সৎ—আমার চেয়ে ঢের বেশি সাহসী, সৎ ও উদার।" 'রিকোয়াএম্ ফর্ এ নান্'-এ নিজের জীবন দিয়ে পরিচারিকা ন্যান্‌সি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের ভাঙন রোধ করে। সুস্থ প্রাণোচ্ছল চেতনার ধারক এই সমাজ ফক্‌নরের নতুন উপন্যাসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবারেও দুই শ্রেণী তাদের স্বকীয় চিন্তাধারা নিয়ে উপস্থিত। কর্নেল সার্টোরিসের হুকুমে শহরে মোটরগাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ হল বলেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রীস্ট পরিবার (ফক্‌নর ইয়োক্‌নাপাটোফা প্রদেশের সনাতনী 'হায়রার্কি' ভাঙবেন না, তাই প্রীস্ট পরিবারকে ম্যাক্যাস্‌লিন ও এড্‌মণ্ড্‌স্ পরিবারের শাখা বলে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর ভুল হয় নি, কম্পসন্ পরিবারের সঙ্গে প্রীস্ট পরিবারের সম্পর্কও তিনি উল্লেখ করেছেন) নতুন মোটরগাড়ি কিনে নিজেদের জোর ও মর্যাদার প্রমাণ দিলেন (ব্যাপারটা যেন স্তর অ্যাণ্ডমু অ্যাগিউচীকের ঝগড়া বাধাবার মতো), কিন্তু এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে নিগ্রো পিতামহী ও হুইস্কী-ব্যবসায়ী স্বল্পবিত্ত পিতামহের উত্তরসূরী (অন্য উপন্যাসে এই শ্রেণীই 'হোয়াইট্ ট্র্যাশ' নামে সনাতনীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র), নিগ্রো লেড্, এবং সাবেকী কুলের তরুণতম প্রতিনিধি এগারো বছর বয়স্ক লুসিয়াস্ প্রীস্ট। পরিবারের বয়স্কজনদের অনুপস্থিতির সুযোগে এরা গাড়ি চুরি করে লম্বা পাড়িতে বেরিয়ে পড়ে। এদের শখ নিতান্তই সরল ও সহজ—জীবনকে চেখে দেখবে, আনন্দের ভাগ আদায় করে নেবে।

এই ত্রয়ী যাত্রা দেখে বোঝা যায়, কুলগর্বীদের জীবনে কত বড় একটা ফাঁক থেকে গেছে। এরা তিনজনে কাদা পার হয়, নদী পার হয়, ঘুমোতে

পায় না, জেলে যায়—জীবনে এতরকম অভিজ্ঞতা। গণিকালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ—সর্বত্রই এদের অবারিত গতি। জীবন ও অভিজ্ঞতার এই বৈচিত্র্য থেকেই কুলগর্বীদের সমাজ বঞ্চিত থেকে গেছে। ফক্‌নরের পূর্বতন উপন্যাস-গুলিতে লক্ষ্যণীয়, এত পথ ও এত যাতায়াত এরা কখনও দেখেনি, পায়নি। জীবনের বৃহত্তর উদারতর ধারার সঙ্গে নিবিড় যোগেই 'হোয়াইট্ ট্র্যাশ' ও নিগ্রোদের প্রাণশক্তি, তাদের জীবনের দামও তাই বেশি।

"দি রিভার্স"-এ মেম্‌ফিসের গণিকালয় অন্যতম ঘটনাক্ষেত্র। হাল্‌কা চালের বর্ণনায় এই গণিকালয়ের যে-চরিত্র ফুটে ওঠে, তাতে কোনো নৈতিক প্রশ্ন উঠতেই পারে না ; এ যেন কোনো নিষ্পাপ বোর্ডিং হাউস্। স্টাইনবেকের 'ক্যানারি রো'-র প্যালেস্ ফ্লপ্‌হাউস্ প্রায় একই জাতীয় গণিকালয়। উভয়ত্রই অধিবাসিনীরা সুস্থ শান্ত নারীমাত্র—বাইরের অগণিত নারীকুলের সঙ্গে এদের তো কোনোই তফাৎ চোখে পড়ে না। এদের নৈশজীবন সম্পর্কে স্টাইনবেক বা ফক্‌নরের যেন কোনোই কৌতূহল নেই। দায়দায়িত্বহীন জীবনানুরাগে ওদিকে ম্যাক্ ও তার দল, এবং এদিকে বূন ও লেড্ সগোত্র। গণিকাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সহজ সুস্থ বন্ধুত্বের, অনেকটা হয়তো সহকর্মীর। বূন ও লেড্, ম্যাক ও তার দল আনন্দের কোনো কর্মে অন্ন জুটিয়ে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। ডোরা কিংবা রেবাও তো তা-ই চেয়েছে, শুধু পথেই যা কিছু প্রভেদ, পথও তো জন্মপ্রকৃতিগত। কোনো পক্ষেই লজ্জাশরম, ক্ষোভ, পাপপুণ্য ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্ন, অথবা কোনো ইতরতা নেই। 'সুইট্ থার্সডে' উপন্যাসে স্টাইনবেক অবশ্য সুজি-র মধ্যে নিজ পেশা সম্পর্কে লজ্জাবোধ এনেছেন। ডক-কে ভালাবেসে সুজি ডক-এর যোগ্য হয়ে উঠবে বলে নিজের জীবনকে বদলে দিয়েছে, বয়লারের মধ্যে বাসা বেঁধে গৃহস্থালি পেতেছে।

সুজির এই পরিবর্তনের পশ্চাতে স্টাইনবেক যে পটভূমি রচনা করেছেন, করি-র অনুরূপ পরিবর্তনের পশ্চাতে ফক্‌নর আরো তাৎপর্যপূর্ণ, আরো মানবিক এক পটভূমি রচনা করেছেন। করি তার ভাগিনেয় অটিস্‌কে শহুরে ভদ্রতা ও আদবকায়দায় তালিম দেবে বলে নিজের কাছে এনে রাখে। লুসিয়াস্‌কে দেখে করি তার কল্পনার আদর্শ উপলব্ধি করে। কিন্তু স্বার্থপর অটিস্ বদলায় না, বরং রাত্রে লুসিয়াসের কাছে গল্প করে, আণ্ট্ ফিটি-র গণিকালয়ে করির ঘরের গায়ে ছিদ্র করে অভ্যাগতদের উঁকি মেরে দেখবার সুযোগ করে দিত, পরিবর্তে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি নিকেল আদায় করত। লুসিয়াস্

এই গল্প শুনে হঠাৎ অটিস্‌কে মারতে শুরু করে, পরে অটিসের ছুরিতে সামান্য আহত হয়। করি এসে পড়ে; লুসিয়াস বিবাদের কারণ প্রকাশ করে না। করি অটিসের কাছ থেকেই ব্যাপারটা জেনে নেয়, লুসিয়াসকে এসে বলে: "তুমি আমার জন্যে লড়াই করেছ। আগে তো লোকে—মাতালের দল—আমাকে নিয়ে লড়াই করেছে। তুমিই প্রথম আমার জন্যে লড়াই করলে। দেখো, আমি এ কখনো দেখি নি, আমি এতে অভ্যস্ত নই। আমি কী করব, তাই বুঝতে পারছি না। একটা কাজ আছে, আমি করতে পারি। আমি তোমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করব। আরকান্‌সাসে আমিই দোষ করেছিলাম। কিন্তু সে দোষ আমি আর রাখব না।" লুসিয়াস বলে, "তাহলে দোষটা তোমার নয়?" করি বলে, "আমারই দোষ। আমি তো বাছতে পারতাম। আমি তো সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। আমি তো চাকরি খুঁজে নিতে পারতাম। কিন্তু আর আমার দোষ রাখব না। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।" গণিকাজীবনের গ্লানি ভুলে থাকবার চেষ্টায় যখন আমরাই করি-রেবা-মিনির অভিনয়কেই সত্য মেনে নিতে বসেছিলাম, তখনই এই নতুন আভাস আমাদের ধারণাকে ভেঙে দেয়। এবং আমাদের ধারণা যখন এই আঘাত পায়, তখনই ফক্‌নরের সতর্কবাণী মেনে নিতে হয়: "দেখছ? খুব দ্রুত শিখে চলতে হয়। অন্ধকারে লাফ দিতে হয়, এই ভরসায় যে, কেউ, কিছু, কারা তোমার পা ঠিক জায়গাতেই নামিয়ে দেবে।" তবু যদি কেউ বলেন যে, গ্লানির আর তো কোনো ইঙ্গিত নেই, তখন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, সমগ্র চিত্রটিই লেড্‌, বুন্‌ ও লুসিয়াসের চোখে দেখা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ফক্‌নরের উপন্যাস তাঁর মনে প্রায়ই জন্ম নেয় কল্পিত বা দৃষ্ট কোনো চিত্র বা কল্পিত কোনো বিশেষ পরিস্থিতি থেকে। 'দি সাউণ্ড্‌ অ্যাণ্ড্‌ দি ফিউরি' শুরু হয়েছিল এইভাবেই—পিয়ার গাছের ডালে একটি ছোট্ট মেয়ে বসে আছে, তার জাঙিয়ার পিছনে কাদা লেপ্টে রয়েছে, তার ঠাকুমার শোকযাত্রা দেখে তার ভাইদের (নিচে দাঁড়িয়ে আছে) বিবরণী শোনাচ্ছে, এই চিত্র থেকে। 'দি রীভার্স'-এরও অনুরূপ উৎস কল্পনা করা যায়। 'পারী রিভিউ'-এর প্রতিনিধি ফক্‌নরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লেখকের পক্ষে সেরা পরিবেশ কী?" ফক্‌নর বলেছিলেন, "আমার কথা যদি বলেন, আমি সেরা যে কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলাম, সেটা ছিল গণিকালয়ের বাড়িওয়ার কাজ। আমার মতে, লেখকের কাজ করার পক্ষে এটাই যথার্থ পরিবেশ।

এতে লেখক পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়, ভয় ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি পায়, মাথার ওপরে ছাদ থাকে। সামান্য কিছু হিসেবপত্র রাখা আর মাসান্তে একবার পুলিশের পাওনা মিটিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। সকালে জায়গাটা শান্ত থাকে, আর সকালটাই লেখার পক্ষে দিনের মধ্যে সেরা সময়। একঘেয়েমির ভয় থাকলে সন্ধের সামাজিক জীবনে যোগ দিলেই চলে। এতে সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও থাকে ; ম্যাডাম নিজেই খাতাপত্র রাখেন, তাই লেখকের কোনোই কাজ থাকে না। বাড়ির সকলেই মহিলা, সকলেই লেখককে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে, পাড়ার যত বেআইনী মদের কারবারী, 'স্যর' বলে। আর, লেখক নিজে পুলিশের লোকদের প্রথম নাম ধরে ডাকতে পারেন।" এই চিত্র থেকেই, অর্থাৎ মিস্টার বিন্‌ফোর্ডের চরিত্র থেকেই কি 'দি রীভার্স'-এর স্চনা ?

প্রীস্ট্‌-এর সাধের গাড়িটি দান করে লেড্‌ তার পরিবর্তে একটি ঘোড়া নিয়ে আসে। ঘোড়দৌড়ে প্রতিবার হেরেছে যে ঘোড়া, সেই ঘোড়াটাকে জিতিয়ে দেবার ভরসা লেড্‌ রাখে। ঘোড়া দু' দুবার জিতেও যায়। এই প্রসঙ্গে রেমার্কের উপন্যাসে কার্ল নামে সেই আপাতজীর্ণ গাড়িটির কথাও এসে পড়ে। জীবনে যারা নিজেরা যোগ্য স্বীকৃতি পায় না, তারা নিজেদেরই মতো অবহেলিত বা অবজ্ঞাত কিছুকে ছলে বা বলে জিতিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে যেন এই কথাই ঘোষণা করে যে, তাদের বাতিল বলে চালাবার যতই চেষ্টা চলুক না কেন, তারাও জিতবার মুরোদ রাখে। 'থ্রি কম্‌রেড্‌স্‌'-এর লেনৎজ্‌ তাই বলে যে, "কার্ল-এর একটা শিক্ষামূলক মূল্য আছে ; সে লোককে এই শিক্ষাই দেয় যে, বাইরের রূপে যতই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাক, মানুষের মধ্যে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তাকে সম্মান জানাতে হয়।"

অভিজ্ঞতার প্রসার ও দৃষ্টির উন্মোচন—এরই মধ্যে দক্ষিণী সনাতনী কুলের বাঁচবার আশা। বূন্‌ ও লেড্‌ অন্যতর শ্রেণীর দৃষ্টি নিয়ে এসে লুসিয়াস প্রীস্টকে সেই চোখ দিয়ে দেখবার শিক্ষা দিয়েছে, তার সামনে পৃথিবীর পথ খুলে দিয়েছে, বৃহত্তর সমাজের লোকযাত্রার স্রোতের মধ্যে তাকে এনে দিয়েছে। লেড্‌ ও বূনের অপরাধ সেই কারণেই মাপ হয়ে যায়।

গণিকাকুল যেদিন থেকে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সেদিন থেকেই তারা হয় করুণা, নয় বিদ্বেষের পাত্রী হয়ে থেকেছে। ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পর তারা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এক বিশিষ্ট টাইপ্‌ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের

জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় নেমেই পশ্চিমী সাহিত্যিকেরা গণিকাদের দেখেছেন, সাধারণ সাধ-আহ্লাদ রাগ-ভালবাসায় গড়া সাধারণ মানবী হিসেবে, কোনো বিশেষ শ্রেণী হিসেবে নয়। স্টাইনবেক, রেমার্ক, গ্রাহাম গ্রীন প্রভৃতির এই ধারায় এবার ফকনরও যোগ দিয়েছেন (বহু বিশিষ্ট পশ্চিমী সাহিত্যিকের মতই ফকনর-ও ফ্রয়েড্‌কে বিশেষ কোনো মূল্য দিতে নারাজ)।

উপন্যাসের কলা-পরিকল্পনায় ফকনর তাঁর বহুধাচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষতম উপন্যাস অবধিই চালিয়ে গেছেন। এখন বৃদ্ধ পিতামহ লুসিয়াস প্রীস্টের জবানীতেই তাঁর বালকবয়সের কাহিনী শোনা যায়। অভিজ্ঞতার প্রারম্ভে যা অস্পষ্ট ও অভিনব ছিল, এতদিনে তা স্পষ্ট ও পুরাতন হয়েছে। বৃদ্ধ লুসিয়াস সেই অতীতের অনুভূতিগুলিকে পুনরায় তুলে ধরবার চেষ্টা করায় প্রাজ্ঞজন ও শিশুর দৃষ্টির সমাহারে ফকনর 'অব্‌জেক্‌টিভিটি'-র এক বিশেষ রূপ রচনা করেন। কথার মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যানমূলক দু' একটি পুনরুক্তিতে বৃদ্ধজনের বিশেষ স্বর ধরা পড়ে; অথচ কথার গতিতে, কখনও দুর্লভ প্রকৃতি বর্ণনায় প্রথম মুক্তির উচ্ছল আনন্দও ধরা পড়ে। দ্বিস্তর দৃষ্টির সতর্ক ব্যবহারে ফকনর রচনাকৌশলের কারিগরিতে তাঁর পুরনো সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানী কবিতা। অসিত সরকার। ক্যালকাটা বুক এজেন্সী। দু টাকা।

অনুবাদ, বলাই বাহুল্য, দুরূহ কর্ম। এবং প্রয়োজনীয়। বিশেষত বাংলা দেশে যথেষ্ট যথার্থ অনুবাদ-সাহিত্যের ব্যাপকচর্চা সমবেতভাবে শুরু হওয়া উচিত। কারণ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ দেশে বৃহত্তর পাঠকসমাজের রুচি নিম্নমুখী—এর কারণ পাঠক সাধারণ নন নিশ্চয়ই, নানা সামাজিক ফাঁকিই এর মূলে। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় যে দুঃসহ ভ্রান্তি চলে আসছে, (আমাদের পূর্বসূরীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়েই বলা চলে) সেটাই এর অন্যতম কারণ—অবশ্যই এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মহৎ ব্যতিক্রম। তাই সুরুচি ও সাহিত্যবোধকে সমাজে চারিয়ে দিতে হলে, স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, স্বদেশী সাহিত্যকে সৎ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন। সে কারণে, সৎ অনুবাদ-প্রচেষ্টামাত্রই—এখনও অবধি যা ব্যক্তিগত—অভিনন্দনীয়।

কোনো লেখক বা কবির রচনা পড়া, ভালো লাগা, তাতে মুগ্ধ হওয়া এক কথা,—তাকে অনুবাদ করে সর্বসাধারণের সামনে হাজির করা আর এক। দ্বিতীয় কর্মের ক্ষেত্রে স্বসমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে, দেশজ ঐতিহ্য ও স্বকাল সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা অবশ্য দরকার। কারণ একজন কবি বা লেখককে স্ব-অনুবাদের মাধ্যমে নিজের ভাষায় আনার অর্থ সেই সাহিত্য আমাদের সাহিত্য আন্দোলনে, আমাদের সাহিত্য ঐতিহ্যে যথেষ্ট সাহায্য করবে —একথা চিন্তা করা।* তাই তিরিশের সার্থক কবি যখন এলিয়টের অনুবাদে হাত দেন তখন তাঁর কাব্যবোধ, ইতিহাসবোধ ও ঐতিহ্যবোধের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে হয়—যেহেতু এলিয়ট আমাদের কাব্যান্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারই শুধু করেন নি, আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্যান্দোলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও করিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত অসিত সরকার অনূদিত জাপানী কবিতায় এই সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করলাম। কেন তিনি জাপানী কবিতা অনুবাদ করেছেন, কোন্ প্রশ্ন তাঁকে প্রাচীন আরবী কবিতার অনুবাদে রত না করে জাপানী কবিতায় করেছে—তার কোনো উত্তরই নেই। ফলে, কোনো নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত না থাকার দরুণ তাঁর গ্রন্থ থেকে জাপানী কবিতার কোনো স্পষ্ট রূপও পাই না। জাপানী কবিতার বিভিন্ন যুগে বিকাশের পরিচয়ও এই অনুবাদ গ্রন্থে অনুপস্থিত। একত্রিশ সিলেবল-এর tanka ও সতেরো সিলেবল-এর haiku-র কোনো মূলগত তফাতই এই গ্রন্থ থেকে বোঝা মুশকিল। তাছাড়া জাপানী কবিতামাত্রই ছোট কবিতা এ ধারণাও ঠিক নয়—renga বা লিঙ্কড-ভর্স-এর কথা সর্বদা স্মরণীয়। লিঙ্কড-ভর্স, এর সবলতম-রূপে, ছোটই—দুজন ব্যক্তির লেখা। প্রথম তিন লাইন একজন লিখবে, আর দু লাইন আর একজন। কিন্তু ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Sogi ও তার দুজন শিষ্য মিলে একশো লিঙ্কড-ভর্স লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়; কদাচিৎ হলেও লং পোয়েমস বা nagauta-এর পরিচয়ও আমরা জাপানী কবিতায় পাই। এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানী কবিতায় যে নতুন বিকাশ দেখা গেল তাই হাইকু বা "ফ্রি" লিঙ্কড-ভর্স। এ ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই স্মরণীয় তিনি বাশো—যাঁর একটি হাইকু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আমাদের কাছে

* অবশ্য ক্ল্যাসিক সাহিত্যের অনুবাদের প্রাথমিক স্তরে এ-চিন্তা নাও থাকতে পারে।

পরিচিত। তাছাড়া, গত সত্তর-আশি বছর ব্যাপী জাপানী কবিতায় যে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে, ইওরোপের সংস্পর্শে যে নতুন চিন্তা-ভাবনা জেগেছে—তার পরিচয়ও এ গ্রন্থে নেই। অর্থাৎ জাপানী কবিতার বিকাশগত পরিচয়-দানেও এ গ্রন্থ অক্ষম। সে কারণে, জাপানী কবিতার প্রতি শুধুমাত্র, উৎসাহ বর্ধনেও এই অনুবাদগ্রন্থ বর্তমানে আমাদের কাব্যভাবনায় কি সাহায্য করবে সেকথা তো ছেড়েই দিলাম। একদা পশ্চিমের ইমেজিস্ট-দের জাপানী কবিতা আকর্ষণ করেছিল—কিন্তু বাংলা কাব্যে এলিয়ট চর্চার পর ইমেজিস্টদের অনুকরণ করা পশ্চাদপসরণ নিশ্চয়ই।

অনুবাদ প্রসঙ্গেও দু-একটি প্রশ্ন ওঠে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁর এক পৃষ্ঠার ভূমিকার শেষে বলেছেন, "তাছাড়া জাপানী ভাষা না জানায় ইংরেজীর উপর নির্ভর করেই অনুবাদ করতে হয়েছে। ফলে মূল কবিতাগুলির সাথে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় নি। তবে সব সময়েই চেষ্টা করেছি মৌলিকতা বজায় রাখতে।" শেষের বাক্যদুটিতে শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়ত জাপানী কবিতার ইংরেজী ভাষান্তরণও খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ জাপানী কবিতা "Virtuoso in method" এবং "Perfection in details." পশ্চিমী কবিতার সঙ্গে এর বিরোধ প্রত্যক্ষ। এবং ইংরেজী অনুবাদের আরও মুশকিল শব্দ-ভাণ্ডারের দিক থেকে জাপানীর সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। শুধু তাই নয়, অনুভূতির প্রকাশে পুরনো দিনের কারুর কিছু কথা বর্তমানে নতুন এ্যাকসেন্টে জাপানী কবি ব্যবহার করেন—ইংরেজীতে এই পার্থক্যটুকু ধরা প্রায় অসম্ভব। তাই ডোনাল্ড কীন পশ্চিমী পাঠকদের জন্য প্রাথমিক পুস্তক জাপানীজ লিটরেচরে স্পষ্টতই বলেছেন, "...to appreciate Japanese poety fully it must be read in the original." সুতরাং ইংরেজীর ওপর নির্ভর করে বাংলায় জাপানী কবিতার অনুবাদে বিপদ অনেক—মৌলিকতা রক্ষা তো দূরে থাক। সবথেকে বড়ো কথা, ছোট কবিতা লিখলেই হাইকু হয় না। আধুনিক জাপানেও হাইকু লেখা হয়েছে কিন্তু "it remains a real question whether any such short poetic utterances can be called haiku."*

অবশ্য এত কথা বলার কারণ শ্রীযুক্ত অসিত সরকারের প্রচেষ্টা আমাদের

---

* Modern Japanese Literature—compiled and Edited by Donald Keene. Introduction

ভালো লেগেছে। এবং এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হলে, আশা করি, তিনি এসব কথা ভেবে দেখবেন। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ মোটামুটি।

প্রথম দিনের সূর্য ॥ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও অমিত ব্রহ্ম। গ্রন্থ নিলয়। দু টাকা।

তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থ সর্বদাই কবিতাপাঠকের উৎসাহের উৎস। কবিতাগ্রন্থ পাঠের পর কবি সম্বন্ধে সেই উৎসাহ বজায় থাকল কিনা—এই প্রশ্নের মীমাংসায় তরুণতর কবির শক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বলতে দ্বিধা নেই, 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মঞ্জুষ দাশগুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে আমার উৎসাহকে তীব্রতরই করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে তাঁর সব কবিতা ত্রুটিহীন। বরঞ্চ অধিকাংশ কবিতাই ত্রুটিপূর্ণ—ছন্দের অস্বাচ্ছন্দ্য ("সূর্য-প্রণাম করা হোলো না আমার এ সকালে"—বিজয়িনী), শব্দপ্রয়োগে শিথিলতা ("হাওয়ার মাতলামিসহ রেখে যাবে বর্ষার মৌসুমী"—বর্ষার মৌসুমী), তারল্য ও চটুলতার প্রতি কদাচিৎ হলেও, আকর্ষণ—প্রভৃতি নানা ত্রুটি 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর প্রথম অলিন্দের কবিতাবলীতে সহজেই পাওয়া চলে। কিন্তু এ সবের পাশাপাশি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত যে পদ্য লেখেন না, কবিতা লেখেন, অন্তত লেখার জন্য সৎ প্রচেষ্টায় রত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অবিনাশ' ও 'আত্মস্থ তাপস' কবিতাদুটিতে, 'ক্রীড়নক' কবিতার কোনো ছত্রে। যদিও কাঁচা হাত, তথাপি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত যে ছড়ার ছন্দে কিংবা ধ্বনিপ্রধানে কবিতা লেখেন তাও লক্ষণীয়—বিশেষত বর্তমানে, যখন সাম্প্রতিকতম কবিরা তানপ্রধানকেই প্রায় একমাত্র ছন্দ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মঞ্জুষ দাশগুপ্তকে বিশিষ্ট বলছি না, কারণ এই ছন্দের কবিতাগুলি এতই অপটু যে কোনো বিশিষ্টতার দাবি তারা রাখে না। এছাড়া, স্বাস্থ্যকর ঠেকে আধুনিক কোনো কোনো বাঙালী কবির (হয়তো তাঁরা কবির প্রিয়) ছায়াপাত। কিন্তু এ সব শুভলক্ষণই কবির যথার্থ কাব্যচিন্তার অপেক্ষায় আছে—যদি বিশিষ্ট কাব্যভাবনা—স্বসমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা—না জাগে ; কি, দ্বন্দ্বময় বিকাশে আমাদের সমাজের বিকাশ, সে-কথার আমল তিনি না দেন—তাহলে কিছু মিঠে মিঠে প্রেমের কবিতা,—চটুল ও তরল কবিতা লিখেই এই প্রতিশ্রুতি শেষ হবে।

'প্রথম দিনের সূর্য'-এর দ্বিতীয় অলিন্দের কবি শ্রীঅসিত ব্রহ্ম-র কবিতায়

এখনও কোনো প্রতিশ্রুতি নেই—প্রায় সব কবিতাই অতি কাঁচা। পুস্তকাকারে কবিতাগুলি প্রকাশ করার পূর্বে তিনি একটু চিন্তা করলে পারতেন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

চারচোখ ॥ আধুনিক কাব্যনাট্য সংকলন। প্রতিভা। তিন টাকা ॥

কাব্যনাট্যকে কবিতা ও নাটকের উভয় কূলই বজায় রাখতে হয়। কাব্যনাট্য নিশ্চয়ই নাটক, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নাটকের গতি ও সংঘাত প্রকাশিত হয় কাব্যিক ব্যঞ্জনায়। গদ্যনাটকে যা বহিঃসংঘাতে বা ঘটনাপ্রবাহে ব্যক্ত, কাব্য-নাটক কবিতার রসে সিক্ত বলেই অন্তর্লোকের আলোকে তা প্রকাশিত হতে চায়। সেজন্য কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্ব মানসিক-সংঘাত উত্থিত এবং সকলেই জানেন যে অন্তরের আবেগ কাব্যের চিত্রকল্প, প্রতীক প্রভৃতির মাধ্যমে সংহত, ইঙ্গিতময়, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে অনায়াসে। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করার জন্য যখন কবিতায় আশ্রয় অনিবার্য হয়, তখনি কাব্যনাটকের সার্থকতা; পক্ষান্তরে আড়ম্বর, উপকরণ, নাটকীয় গুণ সত্ত্বেও বহু কবিতা কাব্যনাট্য নয়, এ-কথা যে কোনও রসিক পাঠকই উপলব্ধি করবেন। নাটক ও অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে কাব্যনাট্যকারের চেতনা তাই প্রাথমিক গুণাবলীর অন্যতম। কবিত্বের আধিক্যে নাটক নষ্ট হয়, অন্যপক্ষে নাটকীয় সংঘাত ও গতি কাব্যিক আমেজে মণ্ডিত না হলে সাধারণ নাটকের সঙ্গে কোনোই পার্থক্য থাকে না, ফলে শুধু নাটকের আঙ্গিকে কবিতাকে প্রকাশ করলেই চলে না; বিষয়বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি, চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রভৃতি নির্বাচনে নাটকীয় সংঘাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অর্থ জীবনের জটিল বিস্তীর্ণ পটভূমিতে সম্পর্ক নিরূপণ, যে-জন্য সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ-নির্ণয় ওই প্রেক্ষিতে অমোঘ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস, সমাজ, দেশ, কাল ও ব্যক্তির নিরন্তর জটিলতা অন্বেষণ যেমন শিল্পের অন্যান্য বিভাগের আদর্শ, তেমনি কাব্যনাট্যকারকে ওই আদর্শে যাবতীয় ঘটনাবলীর তন্ময় ও মন্ময় সত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হতে হয়। আশার কথা, আলোচ্য সংকলনের লেখক চতুষ্টয় তুলনায় তর-তম হলেও এ-সম্পর্কে সচেতন।

প্রেমের উৎস সন্ধান, সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের জটিলতা প্রেমকে বিপন্ন করে তুলেছে—এমন বোধই কৃষ্ণ ধর ও রাম বসুর রচনায় অতি তীক্ষ্ণরূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণধরের 'দ্বিতীয় নায়িকা'-র নায়ক অমল একদা প্রেমের

বন্ধনেই পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিল রমার সঙ্গে ; অথচ "সময়ের নির্মম ব্যবহারে / আমরা বদলে যাই," ফলে হৃদয় থেকে প্রেম ঝরে পড়ে। ঝরে পড়লেও অমল চায় সেই অনাদিকালের মুখটিকে "আমার স্বপ্নে দেখা মুখ দেখবো বলে", তাই নায়কের অস্থিরতা ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণ ও মুক্তির প্রচণ্ড প্রয়াস, "তুমি যদি নদী হও, আমি তাতে ডুব দিই, / নদী হও, নদী হও যদি।" এই মানসিক দ্বন্দ্বই 'দ্বিতীয় নায়িকা'-য় গতি ও সংঘাত সঞ্চার করেছে। জয়তী দ্বিতীয়-নায়িকা, সে চায় অমল সহজ হোক, কারণ "সহজ হলেই কিন্তু হৃদয়কে পাওয়া / যায়, ছোঁয়া যায় তাকে।" অমল মনে মনে জয়তীর কথা স্বীকার করলেও স্ব-নির্মিত জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না, কারণ অমল নার্সিসাস, সে নিজেকে অতিরিক্ত ভালোবাসে, নিজেকে নিয়েই মগ্ন। কৃষ্ণ ধর অমলের দ্বিধায় ছিন্নভিন্ন মূর্তি প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্পের সাহায্যে উজ্জ্বল করে তোলেন এবং নেপথ্যে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে-অমলের অস্থিরতাকে শীর্ষে নিয়ে আসেন। অবশ্য রমার অভিমানাহত ক্ষুব্ধতা, জয়তীর করুণ দৃঢ়তা, অরুণাংশুর হালকা চালে দার্শনিকতা অতি স্বল্প আয়োজনে পরিস্ফুট করেন।

অবশ্য রাম বসু প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রকাশ্যে প্রায় সোচ্চারে করেছেন :

"সমুদ্রের শেষহীন ওঠা পড়া, সেই / নিষ্কলুষ নগ্নতায় আমি যেন আদিম কৃষক / তোমার চুলের মধ্যে বিভ্রান্ত জোনাকি, অথবা "জলকণা পাপড়ির মত মুখে ঝরে বলে," অথবা "জীবনের গভীর বিপদে / একটা রাগিনী যেন কোন এক গুণীর গলায়।" অথবা "কাঠ ও পাঁশুটে মৃত মাছের মতন / কি ভীষণ অর্থহীন, দীন।" অথবা "এমন কি কাঁকড়াগুলো / আমরা যে তাও নই।"

অথচ সেজন্য কখনই 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা' নাটকীয়গুণ বর্জিত হয় নি, বরং রাম বসুর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি জন্মরহস্যকে কেন্দ্র করে কাব্যনাট্যটিতে নাটকীয় পরিবেশ, মধ্যে মধ্যে ছোট্ট মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার ভীতি যুক্ত করে এবং এক ফাঁকে স্মৃতি-চারণার দ্বারা গতি ও সংঘাত সৃষ্টি করেছেন, ফলে নাটিকাটিতে প্লট অংশে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। আলোক ও শিখার প্রেমের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হচ্ছে আলোকের ছিন্নমূল সত্তা, সেই সত্তার মূল প্রোথিত আছে আলোকের জন্মলগ্নে, তাই সে ভালোবাসা পেয়েও যেন কিছু পায় নি। কারণ তার মতে "আমাদের এ জীবন চারপাশে প্রত্যক্ষের মত / নিরর্থক।" বস্তুত আলোক হচ্ছে আউটসাইডার, কিন্তু শিখাও কি সেই

একই সংশয়ে দ্বিধান্বিত ? কামনার উচ্চ-শীর্ষে শিখাও তো আলোকের মৃত্যু কামনা করেছে। রাম বসু অতি দক্ষতার সঙ্গে আলোক ও শিখার দ্বন্দ্ব-মথিত চিত্রটি তুলে ধরেছেন। আলোক ও শিখার মতো চরিত্রের সমাপ্তি সাধারণত হয় আত্মবিনাশে, রাম বসু ছোট্ট মেয়েটিকে এইখানেই অতি সুন্দরভাবে সংযোগ সেতু হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ছোট্টমেয়েটি যেন অলক্ষ্যে প্রতীক হয়ে উঠেছে। "তন্দ্রা ভেঙে ফেরা" তাই শেষ হয়েছে ইচ্ছা ও ঈপ্সিত—দুই সত্তায় রূপান্তরে। রাম বসু ও কৃষ্ণ ধর উভয়েই সমকাল দ্বারা আক্রান্ত এবং উভয়েই রোমান্টিক, কিন্তু কৃষ্ণ ধর যেখানে কাব্যিক-ব্যঞ্জনাকেই মূল আশ্রয় করেছেন, রাম বসু সেখানে আপাত নির্মম, রূঢ়তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন সুর ; প্রথমজনের মুখ্য অবলম্বন মানসিক দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়জন বর্হিঘটনাকেও যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন।

অন্যদিকে গিরিশংকর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজে 'চেরাগ বিবির হাট'-এ প্রেমের সনাতন সমস্যা তুলে ধরেছেন। নারীর আকর্ষণ বীর্য, অর্থের প্রতি, না, পুরুষের অনুচ্চারিত প্রেমের প্রতি—গিরিশংকর কাব্যনাট্যটিতে তাই উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেয়েছেন গ্রামীণ পটভূমিতে মাটির কাছাকাছি মানুষদের নিয়ে। 'মৈমনসিং গীতিকার' যে-দুটি ছত্র তিনি উদ্ধার করেছেন, সেই ছত্র দুটি প্রমাণ করে গ্রাম্যভাষায় কবিত্ব কত উজ্জ্বল অথচ কোমলভাবে প্রকাশ করা যায় এবং গিরিশংকর বাউলের গানেও সে-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাটুরেদের সংলাপ ও আচরণে, হাটের বর্ণনায় লেখক একটি সজীব চিত্র তুলে ধরেছেন। অর্জুনের কথোপকথন, অর্থের প্রাচুর্যে স্ফীত দৃঢ়তা এবং আচরণ অতি সহজে আমাদের আকর্ষণ করে। মুহূর্তে অর্জুন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অর্জুনের প্রতি-তুলনায় নবীনও তার নীরব ভালোবাসা, তার ছোট্ট পট নিয়ে আমাদের মনহরণ করে। চেরাগ-বিবি তাই অর্জুন ও নবীনের সরব ও নীরব প্রেমের দোলায় দুলতে থাকে। অবশ্য প্রথমে অর্জুন-ই তাকে আকর্ষণ করে এবং অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণে তার এতটুকু দ্বিধা দেখা যায় না, কিন্তু নবীনের পট হাতে নিয়ে সে বুঝতে পারে প্রেমের গভীরতা ও আকুতি, তাই শেষে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখনই চেরাগ বিবির হাটের উপর যবনিকা নেমে আসে। প্রাত্যহিক জীবনে হঠাৎ শাশ্বতের দোল খেয়ে 'চেরাগ-বিবির হাট" সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠেছে ও বুড়ো দাঁড়কাক হিসেব মিলাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। 'চেরাগ বিবির হাট' কাব্যনাট্য তাই এই দ্বন্দ্ব ও

জটিলতায় গতি ও নাটকের সংঘাত অর্জন করে। কিন্তু গিরিশংকর প্রতীকের অতি মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রথমদিকে যে লৌকিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন এবং যা কাব্যনাট্যটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল, সেই লৌকিক রসকে বহু পরিমাণে ব্যাহত করেছেন। কারণ বাউলের গানের পর হাটুরেদের সংলাপ পর্যন্ত যে-পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল, লেখক অর্জুন, দাঁড়কাক ও চেরাগ বিবির মুখে এমন মার্জিত ও বইয়ের সংলাপ আরোপ করলেন, যেজন্য আমরা কিছুতেই এদের বাস্তব-অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারলাম না, উপরন্তু চেরাগ বিবি যখন বলে, "অনন্তকালের মাঝে আজকের যে দিনটা ফুরিয়ে গেল। তুমি তার উত্তম পুরুষ।" তখন বিমূঢ় হই, মনে হয় অমিত রায় যেন কথাগুলো বলছেন। চেরাগ বিবি যদি তার আপন ভাষায় (যেমন বাউলের গান) এই কথাগুলো উচ্চারণ করত তবে তার গভীরতা হতো অতল-স্পর্শী এবং তা বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠত। গিরিংকর নাটকীয় পরিবেশ রচনায় অতি দক্ষ, কিন্তু মাটির কাছাকাছি মানুষদের সংলাপ ব্যবহার করলে আমরা সেই ভাষার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতাম ও পরবর্তী লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করত এবং গিরিশংকরও একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতেন সন্দেহ নেই।

দিলীপ রায় যে-ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন, সে-ভঙ্গি কবিতার পক্ষে উপাদেয় হলেও, নাটকের পক্ষে উপযুক্ত কিনা বিবেচ্য। বিচ্ছিন্ন সংলাপের মাধ্যমে তিনি একটি সমস্যা ধরতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় সমস্যার মধ্যে যে নাটকীয় গুণাবলী আছে—দিলীপ রায় হয়তো স্বেচ্ছায় তা পরিহার করেছেন। তিনি হয়তো বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ঐক্যসন্ধানে সচেষ্ট, কিন্তু কবিতার আধিক্য তাঁর ইচ্ছায় বাদ সেধেছে। টুকরো টুকরো কয়েকটি পংক্তি অতি সুন্দর, অথচ পাত্র-পাত্রীদের সংলাপগুলো একটি সূত্রকে কেন্দ্র করেও যেন এক-একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে অবশ্য গতি ও সংঘাত এসেছে, কিন্তু কবিত্বের অতি-প্লাবনে তাতে নাটকীয় পরিবেশ ভেসে গেছে। নতুন ভঙ্গিতে কাব্যনাট্য রচনা করতে গিয়ে দিলীপ রায় শ্যাম এবং কুল দুই রক্ষা করতে পারেন নি বলে আমার বিশ্বাস, তবু এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য আন্দোলনের জোয়ার এসেছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকগণ তার সক্রিয় অংশীদার। তাই আশা করব এঁদের অক্লান্ত লেখনী কাব্যনাটকের ধারাকে নানাভাবে পুষ্ট ও বিকশিত করবে।

কুশল লাহিড়ী

মঙ্গলা (মরাঠী উপন্যাস) ॥ আন্নাভাউ সাঠে। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌। নয়া প্রকাশ, কলকাতা-ছয়। দু' টাকা ॥

"ভৌগোলিক অভিধায় ভারত একটি দেশ মাত্র, কিন্তু আসলে এ এক মহাদেশের পর্যায়ে পড়ে। বহু জাতি বাস করে ভারতে, তাদের, রীতিনীতি আচার ব্যবহার সবই ভিন্ন। তবু মনের জগতে রয়েছে এক অখণ্ড ঐক্য, এক হার্দিক আত্মীয়তা।" অনুবাদকের ভূমিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সহস্র বৈষম্যের মধ্যেও ঐক্যের অখণ্ডতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে—ভাব-সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্যের 'অনুবাদ' শাখাটি সম্প্রতি বেশ সমৃদ্ধ। বিশেষত ইওরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদকর্মই সংখ্যার দিকে বেশি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ এখনো বিরলদৃষ্ট।

শ্রীযুক্ত বোম্মানা বিশ্বনাথম অবশ্যই এ কার্যের একজন পুরোধা হিসেবে প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মারাঠী কথাসাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয় ছিল স্বর্গীয় ও মানবিক প্রেম, প্রকৃতি ও দেশাত্মবোধ। পরবর্তীকালে বহু মরাঠী তরুণ সাহিত্যিক মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। তাই পুরাতন রোমান্টিক প্রভাব কাটিয়ে মরাঠী কথাসাহিত্যে বাস্তবধর্মিতা দেখা দিয়েছে।" ভূমিকার এই অংশটি বর্তমান মারাঠী সাহিত্যের প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নেই।

'মঙ্গলা' অগ্নিযুগের পটভূমিকায় রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মরাঠী উপন্যাস। সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী নায়ক হিন্দুরাও এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। হিন্দুরাও ও তার সঙ্গীদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সমাজবোধ প্রভৃতি কাহিনীর মূল উপজীব্য।

আখ্যানবস্তু : বিয়াল্লিশের সত্যাগ্রহী মনেপ্রাণে গান্ধীবাদী নাগোজী প্যাটেল পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের পেটোয়া দালালে রূপান্তরিত হয়ে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে। তার বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ দিতে হয় হিন্দুরাওয়ের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মীকে। ক্রুদ্ধ হিন্দুরাও প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে। নাগোজীকে শাস্তি দিতে সদলবলে সে যাত্রা করে নাগোজীর আস্তানা চিথলবাড়ি গ্রামের দিকে।

কৃষ্ণাজী মঙ্গলা গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। অনেক জমির মালিক এই লোকটি তার অকপট চরিত্রের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্র। তার ছেলে হাম্বীর চরিত্রে ঠিক তার বিপরীতধর্মী। সে নাগোজীর অনুচর। মঙ্গলা কৃষ্ণাজীর পরমাসুন্দরী মেয়ে। মনেপ্রাণে সে নাগোজীকে ঘৃণা করে আর বিপ্লবী নেতা হিন্দুরাওয়ের বীরত্ব কাহিনী শুনে সে হৃদয়ে পোষণ করে হিন্দুরাওয়ের সঙ্গে মিলিতহবার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

নাগোজী মঙ্গলাকে বিয়ে করতে চায়। হাম্বীরও নাগোজীকে ভগ্নীপতি করে নিতে ব্যগ্র। কিন্তু সরলপ্রাণ কৃষ্ণাজী ঠিক যেন সমর্থন করতে পারেন না এই প্রস্তাবকে। আবার প্রতিবাদ করবার শক্তিও তাঁর নেই।

ইতোমধ্যে নাগোজীকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে হিন্দুরাও সদলে হাজির হয় মঙ্গলা গ্রামে। কৃষ্ণাজীর সঙ্গে পরিচিত হয় সে। মঙ্গলার রূপে গুণে মুগ্ধ হিন্দুরাও তাকে পত্নীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আক্রোশে ফেটে পড়ে নাগোজী ও হাম্বীর। সঙ্ঘাত আসন্ন হয়ে পড়ে। সঙ্গীহীন হিন্দুরাও মঙ্গলাকে সঙ্গে নিয়ে নাগোজীর দলবল আর পুলিশের যৌথ আক্রমণের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। বেঁধে ওঠে এক বিচিত্র লড়াই। মাত্র দুটি লোক, যার মধ্যে একজন নারী, বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়ায় আক্রমণকারী গোটা দলটাকে।

নাগোজী নিহত হয় হিন্দুরাওয়ের গুলিতে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই অসম যুদ্ধের ছেদ টানা হয় এক করুণ অথচ উদ্দীপক পরিণতিতে। শেষ সম্বল দুটি কার্তুজে হিন্দুরাও আর মঙ্গলা আত্মহত্যা করে পুলিশের হাতে ধরা পডবার আশঙ্কায়। এই মৃত্যুতে বাঁধা পড়ল দুটি মৃত্যুহীন সংগ্রামী জীবন—হিন্দুরাও ও মঙ্গলা। ইতিহাসের অমোঘ পথে পিছু হটল আক্রমণকারীরা—এই ইঙ্গিতের মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি।

উপন্যাসটির প্রধান গুণ—লেখকের সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী; অনুবাদকের কৃতিত্ব এস্থলে অনস্বীকার্য।

চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য। হিন্দুরাও যথার্থই বিপ্লবী নেতা হওয়ার যোগ্য চরিত্র। কৃষ্ণাজী, মঙ্গলা ও রাধাবাঈ বাস্তবধর্মী।

বিশ্বাসঘাতক নাগোজী পুলিশের ইনফর্মার। এই চরিত্রটি পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক করবে—আর এখানেই এ-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা। হাম্বীরের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য লক্ষিত হয়।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হিন্দুরাওয়ের অনুগামী গনু, মলহারী প্রভৃতি সার্থক। চন্দুকে নাগোজীর যথার্থ অনুচর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলেই সাহিত্য যে কেবলমাত্র 'প্রোপাগাণ্ডা' হয়ে দাঁড়ায় না 'মঙ্গলা' তারই প্রমাণ।

প্রচ্ছদপট সুন্দর। ছাপা, বাঁধাই যথাযথ। মাত্র দু'টাকা দাম হওয়ার জন্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইটি অনায়াসলভ্য।

উপন্যাসটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

পিপাসা॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.॥

নায়িকার আত্মহত্যায় 'পিপাসা'র গল্পের শুরু। অর্থাৎ তারপর (ফ্ল্যাশব্যাকে) ঐ আত্মহত্যার কারণ প্রমাণে সমগ্র উপন্যাসটির উপস্থাপনা। মেয়েটির নাম বেলা। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যল জীবনের প্রতি যার আজন্ম পিপাসা ছিল। তবু 'কেন আত্মহত্যা করল বেলা।' এর উত্তরও বেলার জবানিতে পাওয়া যায়, 'জীবন ব্যাপারটাই অদ্ভুত। সবটুকুর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।'··· এবং এই 'জীবন'-এরই অর্থসন্ধান একসময় মিটিয়ে দিয়ে তার বীভৎস স্বেচ্ছামৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে একটা আন্দাজ পেল: 'দেহকে ঘিরে যে মন-পোড়ানো আগুন জলে, তা আমি জানতুম, চিনতুম। কিন্তু আত্মায় যে আগুন লাগে সে জ্বালা আমার অজানা ছিলো।' অর্থাৎ, প্রেম?—অথচ ইতিমধ্যেই বেলার শরীরে শহুরে রাত্রির ছোবল বহুবার লেগেছে। সুতরাং সোনার হরিণের আকাঙ্ক্ষায় না হোক, অন্তত 'নিজেকে ভালোবেসেই' বেলা অবশেষে বিবাহ করতে পারল। এবং যাকে বিবাহ করল, তারও মৃত্যু হলো। আত্মহত্যা। কিন্তু বেলার মনে হলো, সে-ই হত্যা করেছে ঐ ভদ্র যুবকটিকে। কেন না সে তাকে ভালোবাসে না, 'আর একজনকে বাসে'।

এই কাহিনীর ভিতরে কোনো বিশেষ জটিলতা টেনে আনবার চেষ্টা করেন নি শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। গল্পাংশকে খুবই সরল ভাষা-ভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন লেখক, এবং তা সময়োচিত, বলতে পারি। উৎকেন্দ্রিক ও বিকৃত মানসিকতা যা আজ প্রায় চতুর্দিকেই সঞ্চারিত, তারই আলোড়নে বেলা ক্ষুব্ধ, আহত। দু-দণ্ডের শান্তি বেলা চায় নি, বেলার তৃষ্ণা ছিলো আরো বড়ো,

বিস্তৃত জীবনের লক্ষ্যের প্রতি। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে, এই ধারণায় তাকে আত্মহত্যা করতে হলো ঘুমের ওষুধে।—এবং এইখানেই আমার প্রশ্ন, এই আত্মহত্যা কী প্রতীকী? যে-বেলা নিজের দেহকে ও বাঁচাকে ভালোবাসবার পরে স্বগতকে প্রার্থনা করে এত বৈচিত্র্যে ও কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শিখেছিল (কোনোরকম অসম্ভব-কিছু-করছে-মনে-না-করে), তার ভালোবাসার নিয়মে (?) আরো একটু adjustment আশা করা আমাদের কি খুব অন্যায় হতো? বিশেষত, প্রথমাবধি এই মেয়েটির ব্যবহার ইত্যাদি থেকে তেমনই একটা আশাবাদ ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য ছিলো যখন লেখকের, অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি—এমন কথাটাই যখন পুনর্বার বেলার বিবিধ আচরণে প্রায়-প্রকাশিত, তখন কেন আত্মহত্যা?…না হয় ধরে নেওয়া গেল, স্বগতর প্রতি বেলায় টান—বাঁক নিতে-নিতে-যাওয়া নদীর মতো সমুদ্রেরই দিকে, তথাপি মোহনার বিপুল মিলনে নদীর যে উত্তরণ, তা বেলার আত্মহত্যায় কতটা প্রমাণিত? তাই জানতে চাইছিলাম, আত্মহত্যাটি কী প্রতীকী? কিন্তু কেনই বা ঐ প্রতীক?

কল্পান্ত। বৈদ্যনাথ ঘোষ। অগ্রণী বুক ক্লাব। পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষের উপন্যাস 'কল্পান্ত'-র প্রথমদিককার মূল ঘটনাস্থল 'আদি কলকাতার আদি গলির মোড়ে ক্লাইভের আমলের দ্বিতল বাড়ি'। এবং শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের জোয়ারে তরঙ্গিত সেই তখনকার চৌরঙ্গীর এক নিষিদ্ধ স্বদেশী অধিবেশনের উচ্ছসিত দীপ্তি। মধ্যবর্তী কাহিনীটুকুতে—তৎকালীন ক্রমে-ধ্বসে-পড়া বনেদিয়ানার নানা বিপরীতমুখী চরিত্রের আসা-যাওয়ার-পটভূমিতে অঙ্কুরিত নতুন মূল্যায়নের প্রতি বিশ্বাসী যুবসমাজের চিন্তাউচাটনের যন্ত্রণা বিধৃত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ ও ভাষা কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত হওয়ায়, মনে হলো, লেখক তাঁর বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষতায় বা গাম্ভীর্যে স্থির থাকতে পারেন নি। ফলত, পর্যবেক্ষকের অবশ্য প্রয়োজনীয় দূরত্বটুকু সর্বক্ষণ বজায় থাকে নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ঈশ্বরদা ও সোনাদি—দুটি সহজ, অবিস্মরণীয় মানুষ হয়ে উঠেছেন। এবং বোধকরি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি সুরেন, যার স্বল্পক্ষণের উপস্থিতি এই কাহিনীটির অশেষ উপকার করেছে—যার কথা না-জানাতে-পারলে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হতো না।…মনে হলো, হয়তো 'কল্পান্ত' একাধিক খণ্ডে রচনা করার ইচ্ছা আছে শ্রীঘোষের, তা যদি হয়, তবে পাঠকদের পক্ষ থেকে আগামী খণ্ডগুলির জন্য আমরা উৎসুক থাকলাম।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানাচার্য নীল্‌স্ বোর

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের জনকরূপে যাঁরা বিশ্ববিদিত, সেই রাদারফোর্ড, ম্যাক্স প্লাংক ও আইনস্টাইনের পাশেই আসন গ্রহণ করেছেন নীল্‌স্ বোর। গত বছর ১৮ই নভেম্বর সাতাত্তর বছর বয়সে এই মহাবিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। আজ মনে পড়ছে ১৯৬০ সালের ২০শে জানুয়ারি দিনটি। নীল্‌স্ বোর এসেছিলেন কলকাতায়। বিজ্ঞান কলেজের নিউক্লিয়র ফিজিক্স ইনষ্টিটিউটে কলকাতার বিজ্ঞানীকুল ও ছাত্রদের ভিড় জমেছিল এই বিজ্ঞান-তপস্বীকে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার জন্যে। সেই জনসমাবেশ দেখে মনে হতে পারত যেন কোনো মন্দিরে এসেছেন পূজারী ভক্তের দল। পক্ককেশ, অপূর্ব সৌম্যভাবমণ্ডিত চেহারার মানুষটি সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং পরমাণুর রহস্যপুরীর কি মুক্তো আহরণে নিযুক্ত আছেন তিনি ও তাঁর সতীর্থরা, ভাব-গম্ভীরকণ্ঠে তারই কাহিনী পরিবেশন করলেন। সেই দিনটির কথা কোনো-দিনই ভোলা যাবে না।

ছাত্রজীবন ও গবেষণা

নীলস্ বোর ডেনমার্কের অধিবাসী। রাজধানী শহর কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। কুড়ি বছর বয়েসেই বোর পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এরপর ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারে ক্যাভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটরীতে কিছুদিন গবেষণার পরে তিনি ইংরেজ পরমাণুবিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে যোগদান করেন। ১৯১২ সাল থেকেই বোর পরমাণুবিজ্ঞান জগতে নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে বোর স্বদেশে ফিরে এসে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত হলেন।

১৯২১ সালে গামা রশ্মির বিচ্ছুরণ বিষয়ে পরীক্ষাকাজের ফলে রাদারফোর্ড

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন পরমাণুর দুটি অংশ—একটি তার কেন্দ্রীণ, যেখানে রয়েছে ধনাত্মক প্রোটন কণিকা, অপরটি, সেই কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রনের দল। পরমাণুর এই চেহারাকে তিনি উপমিত করলেন সৌরমণ্ডলের সঙ্গে, যেখানে সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে চলেছে ন'টি গ্রহের আবর্তন।

বোরের পরমাণুতত্ত্ব

বোরই সর্বপ্রথম পরমাণুকেন্দ্রীণের বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনের গুণাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলকে ভিত্তি করে তিনি পরমাণুকেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ইলেকট্রনদের ঘূর্ণ্যন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আবিষ্কার করলেন। বোরের ধারণা অনুযায়ী পরমাণুকেন্দ্রীণের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন-বিন্যাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটি আলোচনা করা যেতে পারে।

সবচেয়ে সরল পরমাণু হলো হাইড্রোজেন, যার কেন্দ্রীণে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি কক্ষে ভ্রাম্যমান একটিমাত্র ইলেকট্রন। দু'টি বস্তুকণার তড়িৎশক্তি বিপরীতধর্মী হয়েও সমপরিমাণ, কাজেই পরমাণুটি তড়িৎব্যাপারে নিরপেক্ষ। কেন্দ্রীণের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথটির নাম দেওয়া হয়েছে K। দ্বিতীয় আর একটি ইলেকট্রনের এখানে জায়গা হতে পারে। মেন্দেলিয়েভের মৌলিক পদার্থের পর্যায়িক ছকের (Periodic table of elements) দ্বিতীয় সদস্য হলো হিলিয়াম, যার পরমাণুর কেন্দ্রীণে আছে দু'টি প্রোটন আর K কক্ষপথে আছে দু'টি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীণের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকার জন্যে প্রথম কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ একটি বা একাধিক ইলেকট্রনের ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোরটাও হয় সবচেয়ে বেশি। অতএব সেই ইলেকট্রনদের কক্ষচ্যুত করবার প্রয়োজন দেখা দিলে বাইরে থেকে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনের নিজস্ব শক্তির পরিমাণ আবার সবচেয়ে কম।

পর্যায়িক ছকের তৃতীয় সদস্য হলো লিথিয়াম। এর কেন্দ্রীনে তিনটি প্রোটন। কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যাও হবে তিনটি। দু-টি স্থান পাবে K কক্ষপথে, তৃতীয়টি স্থান পাবে একটি নতুন কক্ষপথে—যার নাম দেওয়া

হয়েছে L। এই কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রনের জায়গা হতে পারে। বাইরের কক্ষপথে ইলেক্ট্রন সংখ্যা নির্দিষ্ট অঙ্কে না পৌছালে সমগ্র পরমাণুটি অস্থায়ী হতে বাধ্য। অর্থাৎ সেই অবস্থায় বহির্কক্ষে ইলেকট্রনদের ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোরটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং তার সুযোগ নিয়ে দু-একটি ইলেকট্রন প্রতিবেশী অন্য কোনো পরমাণুর ঘরের ভেতর ঢুকে দু-টি স্বাধীন পরমাণুর জায়গায় একটি যৌগিক পরমাণুকে জন্ম দিয়ে বসে। ইলেকট্রনদের সংখ্যার ওপরেই পরমাণুর রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে বলে পরমাণুর অস্থায়ী অবস্থায় ইলেকট্রনদের ঘর বদলের ভেতর দিয়ে ভিন্ন রাসায়নিক গুণযুক্ত নানাবিধ যৌগিক পরমাণু ও যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। K-র তুলনায় L-কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনদের শক্তির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।

হিলিয়াম রাসায়নিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ হিলিয়াম পরমাণুর একটিমাত্র কক্ষপথ K-এর দু'টি ইলেকট্রনের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই মেটানো রয়েছে। পর্যায়িক ছকের তিন থেকে নয় নম্বর পর্যন্ত সব পদার্থগুলিই অস্থায়ী, কিন্তু দশ নম্বর নিয়ন্ কিন্তু স্থায়ী। কারণ, তার দ্বিতীয় কক্ষপথ L-এর চাহিদা অনুযায়ী আটটি ইলেকট্রনই গোড়া থেকে রয়েছে, যেটা আর অন্যদের ভাগ্যে জোটে নি। এগারো নম্বর পদার্থ সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীণে ১১টি প্রোটন; কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ এগারোটি ইলেকট্রনের দশটির জায়গা হয়েছে K এবং L কক্ষপথে এবং শেষেরটির জন্যে রয়েছে তৃতীয় একটি কক্ষপথ M। দূরত্বহেতু বহির্কক্ষের ইলেকট্রন কণার ওপর কেন্দ্রীণের আকর্ষণের জোর কম ও ঐ কক্ষপথের চাহিদার তুলনায় ইলেকট্রন সংখ্যা স্বল্প বলে এটিও অস্থায়ী। L-এর তুলনায় M কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনদের নিজস্ব শক্তির পরিমাণ আবার সব সময়েই খানিকটা বেশি। এভাবে বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে সংখ্যায় আরো বেশি কক্ষপথের পরিকল্পনা করা হয়েছে বোরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী।

একটি স্বাভাবিক পরমাণুকে বাইরে থেকে হঠাৎ একটি বড়ো শক্তি দিয়ে যদি আঘাত করা যায়, তাহলে তার কেন্দ্রীণের বহিঃকক্ষের ভ্রাম্যমাণ একটি বা দু'টি ইলেকট্রনের ছিটকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সে অবস্থায় তড়িৎ নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পরমাণুটি ধনাত্মক অবস্থা লাভ করে বসবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ধনাত্মক আয়ন। কিন্তু বাইরে থেকে আঘাতকারী শক্তি যদি

তুলনায় সামান্য দুর্বল হয়, তাহলে আর একটি ঘটনা ঘটতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রীণের K-কক্ষপথের একটি ইলেকট্রন পরমাণুরাজত্বের বাইরে চালান না হয়ে L বা M বা অন্য কোনো কক্ষপথে গিয়ে হঠাৎ জায়গা জুড়ে বসতে পারে। সে অবস্থায় বাইরের কক্ষপথের বাড়তি শক্তিটুকু তার ঘাড়ে চেপে বসবে ও সমগ্র পরমাণুটি একটি উত্তেজিত অবস্থায় গিয়ে পৌছবে।

এই উত্তেজিত পরমাণুটির ঝোঁক হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেটা কিভাবে সম্ভব? বাড়তি শক্তিটুকুই বা কোথায় যাবে? পরমাণু-সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডিতে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০৪ সালে Quantum theory বা কণাবাদ আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর বিকীরণ সৃষ্টি বা শোষণরূপ প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটে না। বোর এই তত্ত্বকে পরমাণুর গঠনসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োগ করে দু-টি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছলেন। প্রথমটির বক্তব্য হলো, কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনেরা যখন তাদের আপন শক্তির মাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিরাজ করে, একমাত্র তখনই পরমাণুটি একটি স্থায়ী, বিকীরণবিহীনরূপে অবস্থান করতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরমাণু-কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান কোনো ইলেকট্রন যদি তার স্থায়ী কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কোনো কক্ষপথে পৌছয় তাহলে পরমাণুটির সমগ্র শক্তিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটবে। যদি এই স্থান পরিবর্তন ঘটে ভেতরের কক্ষপথ থেকে বাইরের কক্ষপথে, তাহলে হবে শক্তির অবশোষণ; আবার তা যদি ঘটে বাইরে থেকে ভেতরের কক্ষপথে, তাহলে হবে শক্তির বিকীরণ।

বোরের সিদ্ধান্ত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানজগতে এক নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল ১৯২২ সালে। ঐ বছর বোর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

১৯২০ সালে বোর কোপেনহাগেনে 'ইনষ্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স' নামে এক বৈজ্ঞানিক গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এই কেন্দ্রটি সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীকুলের এক মহাতীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ভারতের বিজ্ঞানী হোমি ভাবা কিছুকাল এখানে গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

শিক্ষক ও মানুষ

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাসিজমের উদ্ভব হয়। হিটলারী শাসনে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ইহুদী বিজ্ঞানীরা নিপীড়িত হতে থাকেন। নীল্‌স্ বোর এঁদের প্রত্যেকের কাছে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর ইনষ্টিটিউটে অতিথি হবার জন্যে। ফ্যাসিস্ট-নিপীড়িত ইওরোপের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে বিজ্ঞানীরা কোপেনহাগেনে এসে একদিকে যেমন পেলেন পরমাত্মীয়ের অভ্যর্থনা, তেমনি লাভ করলেন গবেষণার এক স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ।

তাঁর ছাত্রদের কাছে বোর ছিলেন এক মহৎ প্রেরণাস্বরূপ। দাম্ভিকতা বা কর্তৃত্বের কোনো মনোভাবই তাঁর ছিল না। তাঁর বৈজ্ঞানিক কোনো ধারণা সম্বন্ধে কোনো ছাত্র তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করলেও তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হতেন না। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এ ধরনের মধুর সম্পর্ক বোধহয় একমাত্র সক্রেটিসের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছিল।

বোর জানতেন কিভাবে তাঁর ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা যায়। তাঁর ইনষ্টিটিউটে কয়েক বছর গবেষণার পর একজন সত্যিই ভাবতে পারতেন, পদার্থবিজ্ঞান জগতে এমন কিছু মুক্তোর সন্ধান তিনি পেয়েছেন, যা তিনি আগে জানতেন না বা পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও যা জানবার সুযোগ হয়তো তার মিলত না। বর্তমান পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কোনো না কোনো সময়ে বোরের অধীনে তাঁর ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

ডেনমার্কের গভর্নমেণ্ট দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটির প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধার প্রতীকস্বরূপ কোপেনহাগেনের বিখ্যাত কার্লসবাগ প্রাসাদটি বোরের বাসভবনরূপে নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন। বোর রোজ সাইকেলে চেপে ইনষ্টিটিউট-এর পথে বেড়োতেন। চৌমাথার মোড়ে লাল আলোর সংকেতের দিকে কদাচিৎ তাঁর নজর পড়ত। আবার যখন ট্রামের যাত্রী হতেন, এমন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়তেন যে ইনষ্টিটিউটের ষ্টপ ছাড়িয়ে একেবারে টার্মিনাসে পৌছে যেতেন। ফেরার সময়েও প্রায়ই নির্দিষ্ট জায়গায় নামার কথা মনে থাকত না। এমনই ভুলো মন ছিল মানুষটির। কিন্তু বোর শুধু যে পড়াশুনো বা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তা মোটেই নয়। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নদীতে নৌকো বাইতে বেরিয়ে পড়তেন, তাদের সঙ্গে

হাওয়াকল তৈরির কাজে লেগে যেতেন আর পিং-পং খেলার ব্যাপারেও তাঁ
ছিল ভয়ানক উৎসাহ।

বোরের অবশ্য সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল এবং ভালো খেলোয়া
হিসেবে তাঁর বেশ নামও ছিল। বোরের ফুটবল খেলার ব্যাপারে বেশ একা
মজার কথা চালু আছে। বিপক্ষের গোলে বল কিক্ করতে ভুলে গিয়ে বো
কখনও কখনও খেলার মধ্যেই বলটাকে হঠাৎ হাতে তুলে নিয়ে দেখবার চে
করতেন, সেই চামড়ার বস্তুটির মধ্যে আসলে কী থাকতে পারে।

বোর ও পরমাণু বোমা

১৯৩৬ সালে বোর পরমাণুকেন্দ্রীণে ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি নতুন ত
আবিষ্কার করলেন। ১৯৩৯ সালে বোর নিউইয়র্কে এলেন, আইনস্টাইন ও
অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে
বিষয়টি ছিল—পরমাণুর বিভাজন সংক্রান্ত বোরের তত্ত্ব। বোরের ইনষ্টিটিউ
জার্মান মহিলা বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রিশ্-এর গবেষণা
প্রমাণিত হয়েছিল যে ইউরেনিয়াম ধাতুর জুড়িদার (isotope) ইউ-২৩৫-এ
পরমাণুকেন্দ্রীণকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলেই পরমাণুটি প্রায় দু
সমান ভাগে ভেঙে যায়।

পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহ আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাগারে ক্রমি
পরীক্ষাকাজের ভেতর দিয়ে বোরের এই তত্ত্ব যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ মিলল
বিজ্ঞানীদের মাঝে একটি চাপা উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হলো। কা
এই ঘটনার মধ্যে যে নির্দেশ মিলছে, তা হলো এই— পরমাণুর আভ্যন্তরী
শক্তিকে নির্গত করা সম্ভব এবং ইউরেনিয়াম বিভাজনের মাধ্যমে হয়তো সে
মহাশক্তিমান আয়ুধ পারমাণবিক বোমাকে একদিন তৈরি করে তোলা যাবে।

বোর ডেনমার্কে ফিরে এলেন। ইওরোপ মহাদেশে তখন দ্বিতীয় মহাযু
শুরু হয়েছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে বার বার তাঁর কাছে আবেদ
এসে পৌছচ্ছিল স্বদেশভূমি ত্যাগ করার জন্যে। ডেনমার্ক জার্মানরা তখ
দখল করে নিয়েছে। কিন্তু বোর তাঁর ইনষ্টিটিউটকে রক্ষার জন্যে স্থির করলেন
যতদিন সম্ভব তিনি দেশেই থাকবেন। ১৯৪৩ সালে পরিস্থিতি যখন খু
সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল, বোর একটা মাছধরা নৌকোয় চেপে ডেনমার্ক থেকে
পালিয়ে এলেন সুইডেনে। সেখান থেকে একটি মসকুইটো বোমারু বিমা

বোর উত্তর সাগরের ওপর দিয়ে ইংলণ্ড রওনা হলেন। তাঁকে বসানো হয়েছিল ঠিক যে জায়গা দিয়ে নিচে বোমা ফেলা হয়, তারই ওপরে। উদ্দেশ্যটা ছিল এই, যদি কোনো কারণে জার্মান ফাইটার বিমানগুলো এসে ছেঁকে ধরে এবং পালিয়ে যাবার আর কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে একটি হাতল ঘুরিয়ে বোরকে সোজা সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হবে। এই দামী মালটি শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে বরং খোয়া যাওয়াই ভালো। বিমানটি প্রায় দু'হাজার ফুট ওপরে ওঠবার সময় পাইলট বোরকে জানালেন, অক্সিজেন মুখোস পরবার জন্যে। বোর তখন হয়তো পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সমস্যায় এমনই আত্মমগ্ন হয়ে ছিলেন যে পাইলটের কোনো কথাই তার কানে গিয়ে পৌছোয়নি। কাজেই বিমানটি ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বোর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং লণ্ডনে এসে যখন পৌছলেন তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

বোর যখন ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় এসে পৌছন, তখন সেখানে পরমাণু বোমার গবেষণা চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। বোর নিজেও গভীরভাবে সে কাজে জড়িয়ে পড়লেন।

মানবতার মহৎ মূর্তি

পরমাণুবোমার গবেষণায় অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মতো নীল্স্ বোরও সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন শুধু এই আশঙ্কায়, পাছে হিটলারের অধীনে জার্মান বিজ্ঞানীরা পরমাণুবোমা আবিষ্কার করে তাকে মানবসভ্যতা ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করে বসে। ১৯৪৪ সালের গোড়া থেকেই বোর বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন, পরমাণুর আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড শক্তির আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে জটিল কোনো রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কিনা। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র—আমেরিকা, ইংলণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী যুদ্ধের পরেও আগের মতোই বজায় থাকবে এ জোরালো বিশ্বাস বোর মনে মনে পোষণ করে উঠতে পারছিলেন না। তাই তিনি চেয়েছিলেন, পরমাণুবোমা আবিষ্কার বা যুদ্ধে তার প্রয়োগ হবার আগেই পারমাণবিক শক্তির সমগ্র প্রয়োগব্যবস্থায় আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার যৌথ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হোক।

আগামী ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির সামনে যে প্রশ্নগুলো জীবন ও মৃত্যুর

মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে, সেগুলো একটি বিবৃতির মাধ্যমে বোর রুজভেল্ট ও চার্চিলের কাছে ১৯৪৪-এর তেসরা জুলাই পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে বোর ঐ বছরের ছাব্বিশে আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বোর এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের বিচারে সম্পূর্ণ দুটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংস্থা হলেও সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার মিত্রশক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝির ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রয়েছে, তাকে কার্যে নিয়োগ করা উচিত। বোর স্বপ্ন দেখেছিলেন, পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত একটি পরিবার সৃষ্টির ভেতর দিয়েই ভবিষ্যতে এক মহৎ পরিবার গড়ে উঠবে—পৃথিবীর সমগ্র রাষ্ট্র হবে যে পরিবারের সদস্যভুক্ত।

মহাবিজ্ঞানী নীলস্ বোরের ঐ বিবৃতিটি চিরকালের জন্যে ইতিহাসে এক সুমহৎ মানবিক দলিলের মর্যাদা লাভ করবে।

যুদ্ধের পর বোর স্বদেশে ফিরে এসে আবার তাঁর ইনষ্টিটিউটের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

১৯৫০ সালে বোর জাতিসঙ্ঘের কাছে আবেদন করেছিলেন, যাতে পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৪ সালে আমেরিকায় আগমন উপলক্ষে বোর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে যে কথাটি বলেছিলেন, তা ছিল এই যে, পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণমূলক কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

১৯৫৫ সালে জেনিভায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বা 'Atom for Peace' নামে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, নীলস্ বোর ছিলেন তার প্রধানতম উদ্যোক্তা। পৃথিবীর ষাটটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীসমাজের মধ্যে যে সংযোগিতার বাণী ঐ মহতী সভা থেকে প্রচারিত হয়েছিল, তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষমুক্ত সুখী মানবসমাজ যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন মানুষ আবার নতুন করে স্মরণ করবে মানবপ্রেমিক মহাবিজ্ঞানী নীলস্ বোরকে—যিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঐ সুখী ভবিষ্যতের।

শঙ্কর চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক চিত্র-প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

শীত-ঋতুতে কলকাতায় চিত্রকলার প্রদর্শনী এখন আর নতুন ঘটনা নয়। বরং বলা যায়, চিত্র-প্রদর্শনী অধুনা আর শীত-গ্রীষ্মের সীমানা মানছে না। কি বসন্ত কি শরৎ—এখন বারো মাসই কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন চলতে থাকে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এটা নিশ্চয় অগ্রগতির চিহ্ন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও শীত-ঋতু এখনো প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম সময়রূপে শিল্পীমহলে বিবেচিত। ফলে, পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে এই সময় কলকাতার শিল্পরসিক মানুষ সাম্প্রতিক চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। আমরাও গত একমাসে যে-সব চিত্র-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

গত একমাসের সম্মিলিত ও একক প্রদর্শনীতে একটি লক্ষণ খুব স্পষ্ট। বাংলা দেশের তরুণ শিল্পীরা আধুনিক ইওরোপীয় শিল্প-আঙ্গিককে অত্যন্ত দ্রুত আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন। এমনকি সবভারতীয় ক্ষেত্রে যে-সব শিল্পী আধুনিক রীতি-পদ্ধতির অনুসারী এবং খ্যাতিমান, তাঁদের অনুসরণকারী তরুণ শিল্পীর সংখ্যাও বাংলা দেশে কম নয়। এই অনুসরণকারীর মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিল্পী তাঁদের রচনায় অনুকরণের ঝোঁকও বিদ্যমান। এঁরা বাদে আরো কিছু উগ্র আধুনিকপন্থী শিল্পীর চিত্র-নিদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এঁরা বিমূর্ততার পূজারী। কিন্তু এই বিমূর্ততার নামে অনেকে যে উন্মার্গগামী হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই আধুনিক শিল্পরীতির পাশাপাশি চলছে প্রথাসিদ্ধ কিংবা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির চিত্র-রচনার কাজ। শুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি কিংবা লোক-শিল্পের আঙ্গিকে রচিত চিত্র-কর্মের নিদর্শন প্রায় বিরল হয়ে আসছে। বাঙলার তরুণ শিল্পীদের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এই প্রবণতাগুলিই প্রধান।

আর্ট কলেজের চিত্র-প্রদর্শনী

শুধু তরুণ শিল্পীরাই নন, কলকাতার দুটি আর্ট কলেজের ছাত্র-শিল্পীরাও এই লক্ষণাক্রান্ত। এবার চৌরঙ্গীর আর্ট কলেজ এবং ধর্মতলার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রদর্শনীতে নানা রীতির, নানা পদ্ধতির মধ্যেও উপর্যুক্ত চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। এটা ভালো

কি মন্দ সে-কথা তর্ক-সাপেক্ষ। কিন্তু অ্যাকাডেমিক বিধিনিষেধের বন্ধন যে বর্তমানে অনেকখানি শিথিল এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কুমকুম মুন্সী, মধুসূদন কুশারী, দীপশ্রী গোস্বামী, অঞ্জু দেব, কৌশিক চক্রবর্তী, নিরঞ্জন প্রধান, কুণাল কিশোর কর, বিকাশ ভট্টাচার্য, পাঁচু গুপ্ত, অঞ্জু চৌধুরী, শর্বানী কর, কমল চৌধুরী প্রভৃতি তেল-রঙ ও জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, তেল-রঙের কাজে সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বে-সরকারী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র-রচনার কাজে। ভাস্কর্য ও বাণিজ্যিক শিল্প-চর্চাতেও বে-সরকারী আর্ট কলেজ সরকারী আর্ট কলেজের চেয়ে উন্নততর শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী

সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে একটি প্রদর্শনী তথাকথিত আধুনিক পন্থার ব্যতিক্রমরূপে কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে। এটির উদ্যোক্তা সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট। ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসে এই নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হলেও দীর্ঘকাল এই সংস্থার কোনো কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ফলত অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত এই সংস্থার কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। এই অবস্থায় ভারতীয় ঐতিহ্যময় ধারাকে এঁরা দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করায় আমরা খুশি হয়েছি।

এই প্রদর্শনীতে পনেরো জন প্রধান ও নবীন শিল্পীর ৮১খানি চিত্র-নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। কোনো চিত্রেই আঙ্গিক-প্রকরণে আধুনিকতার চিহ্ন ছিল না। বরং জলরঙ ও টেম্পেরার মাধ্যমে অঙ্কিত নিসর্গ দৃশ্যগুলির বিন্যাসে এবং মৃদু রঙ প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে ছিল প্রথাসিদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতির অনুসরণ। এই সব চিত্রের মধ্যে গোপেন রায়ের 'প্রভাতসূর্য' 'বিদায়লগ্ন' কিংবা মনোরঞ্জন সাহার নিসর্গ চিত্রাবলী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া শ্রীমতী বীথি ঘোষ, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীরেন ঘোষের কয়েকখানি চিত্রও আমাদের ভালো লেগেছে। মোগল-রীতিতে অঙ্কিত তুফান রাফাইয়ের টেম্পারার কাজ 'ঘুড়ি ওড়ানো' ও 'শোভাযাত্রা'—চিত্র-সংস্থাপনের গুণে সুন্দর। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত

শ্রীমতী বীথি ঘোষ, করুণা সাহা এবং আশীষ প্রধানের নিসর্গ দৃশ্যের মনোরম বর্ণ-বিন্যাস এবং চিত্রের ঘনত্ব ও দূরত্ববোধক সংস্থাপন সত্যি প্রশংসার যোগ্য। মুরলীধর টালির প্রতিকৃতি-চিত্র 'আমার মা' একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। লোকশিল্প এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে শিল্পী কেশব ভৌমিক, শ্রীমতী মায়া রায় এবং অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

দুটি বিমূর্ত চিত্র-প্রদর্শনী

এই সম্মিলিত প্রদর্শনীর চেয়ে একক প্রদর্শনীর সংখ্যা অনেক বেশি। একক প্রদর্শনীগুলিতেই আধুনিক এবং বিমূর্ত শিল্প-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে উগ্রভাবে। এইমাসে বিমূর্ত শিল্প-চেতনার উগ্রতর রূপের জন্য শিল্পী বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিন্ময় চৌধুরীকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্য বাস্তবধর্মী শিল্পী থেকে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই হঠাৎ বিমূর্তবাদী হওয়া কতখানি স্বাভাবিক পরিণতি কিংবা কতখানি অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয় তা বিচার করা দুঃসাধ্য। তবে এইটুকু বুঝেছি, শুধুমাত্র এলোমেলো রঙ প্রয়োগে একটি প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে বিমলবাবু আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ কোনো বক্তব্য বা শিল্প-সৌন্দর্য নেই, আছে স্টাণ্টধর্মী মনোভাব। এবং এ-মনোভাব পরিত্যাজ্য। চিন্ময় চৌধুরীর দুর্বল ড্রয়িংকে মনোরম রঙে ঢাকার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। শুধু তাই নয়, চিন্ময়বাবু নর-নারীর চেতনা-প্রবাহকে বর্ণাঢ্য রঙের প্রলেপে এবং চিত্র-সংস্থাপনের চমৎকার কৌশলে কোনো কোনো চিত্রে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। ফলে, তাঁর বিমূর্ত-চেতনা থেকে আমরা বাস্তবকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করতে পেরেছি। আশা করি এঁরা উভয়েই ভবিষ্যতে বিমূর্ত চিত্ররচনার জন্য আরো নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দেবেন।

বাস্তবধর্মী চিত্র-প্রদর্শনী

এরই পাশাপাশি কবি-শিল্পী দিলীপ রায়ের বাস্তবানুসারী নির্বাচিত চিত্রকলার একটি একক প্রদর্শনী বিমূর্ত শিল্প-চেতনার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসাবে উল্লেখ্য। এতকাল দিলীপ রায়ের চিত্র-প্রদর্শনীর ভিড়ের মধ্যে তাঁর সত্যিকার সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে খুঁজে পেতে অনেক দর্শকেরই কষ্ট করতে হয়েছে। এই নির্বাচিত চিত্রগুলি সেদিক থেকে এবার দিলীপবাবুর শিল্পী-মনকে বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁর ফুলের স্টাডিগুলি সুন্দর। পাখি কিংবা জীবজন্তুর

স্টাডিগুলির মধ্যেও বলিষ্ঠ রেখা, রঙ এবং চিত্র-সংস্থাপনের কৌশল তাঁর নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তাঁর চিত্রের মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য-চেতনা এবং মুড প্রকাশিত যা সহজ সরল অথচ প্রাণবন্ত। 'জনতা' এবং অন্য কয়েকখানি চিত্রে অবশ্য তিনি বিমূর্ত শিল্প-আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই বিমূর্ততা বাস্তব-বিচ্ছিন্ন নয় বলেই আমাদের ভালো লেগেছে।

মধ্যপন্থী অথচ বলিষ্ঠ দুটি চিত্র-প্রদর্শনী

বিমূর্ত ও বাস্তবধর্মী চিত্রের দুই মেরুবিন্দুতে অবস্থান না করেও যে-দুজন তরুণ শিল্পী উল্লেখযোগ্য শিল্প-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন শিল্পী নিখিল বিশ্বাস ও বিজন চৌধুরী। এঁরা মনে-প্রাণে আধুনিক। শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের চিত্রে বলিষ্ঠ রেখায় এক গতিময় আবেগ প্রতিফলিত। তাঁর রৈখিক চেতনাকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি ধাবমান 'অশ্ব' কিংবা 'যুদ্ধ'-কে চিত্রের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। অশ্বের গতিময়তা এবং সৈনিকের বলিষ্ঠ পেশী ও উদ্দামতার মধ্যে শিল্পী রঙে আর রেখায় এমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যার আবেদন সহজগ্রাহ্য। তাঁর 'অশ্ব' 'খনিশ্রমিক' কিংবা যুদ্ধ সিরিজের ১১ খানি চিত্র নিঃসন্দেহে বিমূর্ততা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গঠিত চমৎকার দৃষ্টান্ত। শিল্পী বিজন চৌধুরী আরও অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে কালীঘাটের কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে জীবন, তার মধ্য থেকে। সাধারণ মানুষের বিশেষ মুহূর্ত কিংবা লৌকিক উৎসবকে তিনি তেলরঙের মাধ্যমে দেহাবয়বের সামান্য বিকৃতি ঘটিয়ে কখনো হেলানো, কখনো লম্বমান ছন্দিত রেখায় সমগ্র চিত্রের জমিনে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যা লোক-শিল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েও আধুনিক। কারণ, কিউবিজমের বিশেষ ভঙ্গির মধ্যেই তাঁর রেখা ও রঙ মূলত সঞ্চরণশীল। প্রখ্যাত শিল্পী নীরোদ মজুমদারেরই তিনি ভাব-শিষ্য। বিজনবাবুর 'মেলার দৃশ্য', 'গাজন উৎসব', 'বাঁশি-বিক্রেতা' কিংবা 'এয়োতির চিহ্ন' সার্থক রচনা বলে স্বীকৃতি পাবে। চিত্রের জমিন সৃষ্টিতে তিনি অপূর্ব এক ম্যাটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। অথচ রঙের দিক থেকে তিনি মোটামুটি লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ও ধূসর রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই রঙগুলির প্রয়োগ কখনো কখনো মিশ্র রঙের এফেক্ট সৃষ্টি করেছে। এই দুই তরুণ শিল্পী সম্পর্কে আমরা আশা পোষণ করতে পারি।

গত এক মাসের চিত্র-প্রদর্শনীর এই ফলশ্রুতি দেখে বলা যায়, বিমূর্ত ও বাস্তবধর্মী চিত্রকলার ভাব-সংঘাতে বাঙলার শিল্পীমন আজ সংশয়াচ্ছন্ন। এর মধ্যে যাঁরা ভারসাম্য রক্ষা করে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হতে পারবেন বিজয়ীর বরমাল্য তাঁদেরই প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ভারসাম্যরক্ষাকারী শিল্পীর সংখ্যা একান্তই অঙ্গুলীমেয়।

ধনঞ্জয় দাশ

কলাকর্ম : বৎসরান্তিক ফসল

শীতের হাওয়ায় আর অনেক কিছুর মতোই কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে জড়িয়ে আছে চিত্রপ্রদর্শনীর মরশুম। বৎসরান্তিক ফসল, শুধু বাংলা দেশেরই নয়, ভারত জুড়েই কী উঠলো শিল্প-আন্দোলনের জগতে—আমি চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের কথাই বলছি—তার একটা রূপরেখা এ-সময় সাজিয়ে দিয়ে আসছেন আমাদের সামনে অনেক দিন থেকেই একাডেমি অব ফাইন আর্টস তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। এবারেও তার ব্যতয় হয় নি। যদিচ, এবারে এই প্রদর্শনী এসেছে শুধুই পঞ্চম ঋতুর হিমেল হাওয়ার আমেজ বয়ে নয়, এসেছে আজ যুদ্ধের ছায়ায়।

তবু, আমাকে একজন শিল্পী যেমন সেদিন বলছিলেন: দেশের এই আপৎকালীন অবস্থা সত্ত্বেও জীবনের চাকা ঠিকই ঘুরবে। আর স্রষ্টার তুলি ঠিকই ক্যানভাসের ওপর তার রঙ চড়িয়ে যাবে; বা ছেনি-বাটালির ঘায়ে পাথরের বুকে ঠিকই জেগে উঠবে নতুনতর ভাস্কর্য।

আমি আরও একটু যোগ করে বলেছিলাম: বরং, বোধ হয়, এরকম সময়েই আরো বেশি করে জানান দিতে হবে আমাদের চিরাচরিত জীবনধারার মৌল মূল্যবোধগুলিকে, আমাদের সৃজনশীলতার উৎসমুখ আরো বেশি করে খুলে ধরার এই-ই সময়। কেন না, আজ আমাদের সামনে পরীক্ষা এসেছে।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস বা যে কোনো চিত্র-প্রদশনী, শিল্পপ্রয়াস প্রভৃতির বর্ধিত আকর্ষণমূল্য এই মুহূর্তে বোধহয় তাই-ই।

একাডেমির এটি হলো ২৭তম বার্ষিক প্রদর্শনী। এবারের প্রদর্শনীতে ১৬৩ জন শিল্পীর ৩৭৮টি কাজ স্থান পেয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে শিল্প-দ্রষ্টব্যের এই ব্যাপকতাও লক্ষ্যণীয়। আর শুধু, কলকাতা বা শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের নয়, এবারের প্রদর্শনীর অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের কাজ ভারতের

অন্যান্য রাজ্য—বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, ইন্দোর, কটক, জয়পুর, ভবনগর, ভিজিয়ান'গ্রাম, রাজমণ্ড্রী, কাশ্মীর—এইসব অঞ্চলের শিল্পীগোষ্ঠীর কাছ থেকেও এসেছে। সব মিলিয়ে আজকের সমসাময়িক কলা আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় বহন করতে পেরেছে এই প্রদর্শনী ও যার মধ্যে খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিবান তরুণদের শিল্পকর্মও প্রদর্শনী গ্যালারীর দর্শকের অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে পারে।

প্রদর্শনীর শিল্পদ্রষ্টব্যকে মোটামুটি ভাগ করা যায় চার ভাগে: সমসাময়িক চিত্রকলা—যাতে আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবও কম বেশি থেকে যায়, ঐতিহ্যানুসারী ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রাবলী, গ্রাফিক শিল্প ও ভাস্কর্য।

তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে সমসাময়িক চিত্রকলা বিভাগটিই এ-বৎসর প্রদর্শনীর অন্যান্য বিভাগের চেয়ে সমৃদ্ধতর মনে হবে, যদিও বিশিষ্ট কয়েকজনের অনুপস্থিতিও এতে লক্ষ্যণীয়। আচার্যস্থানীয় শ্রীযামিনী রায় ও শ্রীনন্দলাল বসুর কোনও কাজ যদিও আমরা এই প্রদর্শনীতে পাই না; কিন্তু শ্রীলক্ষ্মণ পাই, শ্রীসতীশ গুজরাল, শ্রীনীরোদ মজুমদার, শ্রীকানওয়াল কৃষ্ণ, শ্রীসুনীলমাধব সেন কিংবা শ্রীপি. টি. রেড্ডী আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। শ্রীগুজরাল সম্পর্কে একটি কথা, তিনি কি তাঁর শিক্ষাগুরু বিখ্যাত মেক্সিকান শিল্পী স্তেকেরসের ধারা পরিত্যাগ করলেন, যে ধারা দখলে এনে তিনি অনেকগুলি বলিষ্ঠ কাজ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন নিজস্ব প্রতিভার সংমিশ্রণে? এবারে তিনি যে কাজটি প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, তাতে মনে হলো অন্যতর বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাবে তার 'মহীপতি' কয়েকস্তর রঙের গোপন গূঢ় আড়াল থেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েই অপস্রয়মান, অন্যদিকে শ্রীনীরোদ মজুমদারের বর্ণলেপনের ঠাসবুননির আর প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে তাঁর হিন্দু প্রতীকী শিল্পধারা নিয়ে সাধনার সমাহিতি "দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের উড্ডয়নে" স্বপ্রকাশ হয়ে থাকে। শ্রীরথীন মৈত্র এবারের প্রদর্শনীতে যে তেলরঙের ছবিটি দিয়েছেন, সমসাময়িকত্ব শিল্পমানসে কি ভাবে কাজ করছে, সেটি তার প্রমাণ। রঙের বৈপরীত্যে তাঁর ছবিটিতে একটা ডানাখোলা দুরন্ত বাজপাখি আকাশ থেকে নেমে আসে ও দুইটি পায়ের নখরে একজোড়া শ্বেতকপোতকে নিহত করতে চায়। চৈনিক আক্রমণের মুখে শান্তি প্রতীক ছবিতে ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। এই বিভাগে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীপ্রেম রাভাল, অরুণা পুরোহিত, চন্দ্রেশ সাকসেনা, সামন্ত ভি. শাহ, সুবীর সেন, শ্রীসত্যেন ঘোষাল, শ্রীকে. এস কুলকারনি, গজেন্দ্র শাহ প্রমুখের কাজ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরীর 'অন্তরাগ' বর্ণিকাভঙ্গী ও উপস্থাপনে ম্যুরাল চিত্রের বিস্তৃতি পেয়েছে। সুকোমল শাসমল কি বিজন চৌধুরীও তাঁদের কাজে গতানুগতিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যান।

খ্যাতনামাদের মধ্যে আর একজন শ্রীঅতুল বসু তাঁর তারুণ্য ও প্রৌঢ়ত্বের দুটি 'আত্মপ্রতিকৃতি' যা প্রদর্শনীতে দিয়েছেন, তা তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রণে শক্তিমত্তারই পুনঃপ্রকাশ। 'আত্মপ্রতিকৃতি' দুটিতে ব্যক্তিত্ব এই বড় জিনিস। আর শান্তিনিকেতনের শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ কাজটি ('সপুষ্পা'—যার অনুলিপি এই 'পরিচয়'-এর গত সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে), আবার আমাদের স্মরণে এনে দেয় সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার জগতে এই ট্রাজেডীর কথা যে, এই একজন অসাধারণ শিল্পী আজ তাঁর দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। শ্রীসতীশ সিংহের তেলরঙের কাজটি একাডেমিক ধারায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধতার পরিচায়ক। ভারতীয় পদ্ধতির বিভাগে শ্রীইন্দ্র দুগার, শ্রীঅবনী ঘোষ, শ্রীদ্বীপেন বসু, শ্রীরাধাচরণ বাগচী, শ্রীইন্দু রক্ষিত প্রমুখ শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বমূলক নতুন কাজ রয়েছে। শ্রীঅন্নদা মুন্সীও তাঁর একটি কাজ প্রদর্শনীতে রেখেছেন।

জলরঙে 'গৃহাভিমুখী' ও 'শান্তির নীড়' ছবিদুটিতে শ্রীগোপাল ঘোষ তাঁর কোমল কবিত্বময়তায় অবতীর্ণ। এই বিভাগে শ্রীডি জে. যোশী, শ্রীমুরলিধর টালি, শ্রীপুলকরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীপ্রদীপকুমার বসু প্রমুখের কাজগুলি প্রশংসনীয়।

গ্রাফিক শিল্প গত কয় বছরে এক অগ্রসর মান অর্জন করেছে। শ্রীকৃষ্ণ রেড্ডী, শ্রীসোমনাথ হোড় প্রমুখের অবদান এজন্য নিঃসন্দেহে দায়ী। কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে তাঁদের ছবি দেখা গেল না। সাধারণভাবে বলতে হয়, প্রদর্শনীর গ্রাফিক বিভাগের মান কিন্তু মাঝামাঝির উপর ওঠেনি। উডকাটে ভূপেন্দ্রনাথ সেন, সান্ত্বনা গোস্বামীর মিশ্রপদ্ধতির কাজ, শ্রীমতী মার্গারেট ম্যাকেঞ্জী প্রমুখের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগটি সমৃদ্ধ। বিখ্যাত শ্রীরামকিঙ্কর এখানে উপস্থিত তাঁর সিমেণ্টের কাজ 'কাক ও কোকিল' নিয়ে—প্রদর্শনীর বদ্ধকক্ষে নয়, মুক্ত

উদ্যানশোভায় মনে হয় এই ভাস্কর্য কাজটির আপন স্থান। শ্রীসুনীল পালের 'বিবেকানন্দ'-এর আবক্ষ প্রতিমূর্তিটি বীর সন্ন্যাসীর এই শতবার্ষিকী বৎসরের যোগ্য স্মারক। শ্রীসুবল সাহা, শ্রীমাধব ভট্টাচার্য, শ্রীভোলানাথ কর্মকার, শ্রীসুবাস রায়, শ্রীহারান ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের শ্রীসুরেন দে প্রমুখের সিমেন্ট, প্লাস্টার, কাঠ, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির কাজগুলি শিল্পানুরাগীর তৃপ্তি আনে। কিন্তু খ্যাতনামাদের মধ্যে শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত কেন অনুপস্থিত?

এবারে প্রদর্শনীতে একাডেমি তরুণ শিল্পীদের যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে এই সব শিল্পীর প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎ প্রতিভাত হয়েছে। নাম করতে হয় শ্রীসজল রায়, শ্রীযোগেন ধিরাজ, শ্রীপূর্ণিমা গৌরীশ্বর, শ্রীবসন্ত অগসে, আর. কে. মলবঙ্কর, অরুণকুমার মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী চন্দ, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী প্রমুখের।

এ প্রসঙ্গে একাডেমির কর্তৃপক্ষের আরও একটি সময়োচিত উদ্যোগের উল্লেখ করতে হয়। গত নভেম্বরেই তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ৯৬জন শিল্পীর এক প্রশংসনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিশুশিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী। ভবিষ্যতের এই শিশু প্রতিভারাও তাদের প্রদর্শনীর ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষায় দান করে বয়স্কদের সঙ্গে এই জাতীয় সংকটে তাদের ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করেছিল।

স্বরূপ গুপ্ত

পরিচয়, শান্তি ও পরমাণু সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৯, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে গত কয়েক মাসে অনেকে আমাদের কাছে এই সংখ্যাটির একটি কপি সংগ্রহ করে দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, অল্প কয়েকটি কপি সংগৃহীত হয়েছে। এখনো যাঁরা সংখ্যাটি পেতে চান তাঁদের অবিলম্বে তৎপর হতে অনুরোধ করছি।

আধুনিক বাংলা গানের (১৯৪২-১৯৬২) আর্টের দিক ও জনপ্রিয়তা।

বিগত বিশ বছরের বাংলাদেশে সৃষ্টিধর্মী শিল্পের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলা গানের স্থান তাদের মধ্যে বোধহয় অগ্রগণ্য। অথচ শিল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য দিক নিয়ে যত মতবিভেদ, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত সচেতন হয়েছেন এবং মোটামুটি শিক্ষিত সমাজ উৎসাহী হবার যতটা প্রয়াস পেয়েছেন, বাংলা গান নিয়ে সুস্থ ও গঠনমূলক সমালোচনা সেই অনুপাতে প্রায় কিছুই হয়নি। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যের নতুন নতুন ধারা পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য আলোচনাও হয় জনপ্রিয় পত্রিকায়; চিত্রকলার ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীর স্বকীয়তা প্রমাণ করার সুযোগ আছে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে। উদাহরণস্বরূপ, চৌরঙ্গীর রাস্তায় চিত্রপ্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীপ্রকাশ কর্মকারের প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা হয় ছাত্র বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আমি এমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী কবিকে জানি, যিনি সাহিত্য, চিত্রকলা, পাশ্চাত্য সিম্ফনি, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম করেন অথচ আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কীয় নিবন্ধ রচনা করায় কোনো গৌরববোধ করেন না। শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরাও বা করেন তাঁরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা গানে পাশ্চাত্ত্য সুরের প্রভাব নিয়ে দু একটা রূঢ় উক্তি করে আধুনিক বাংলা গানের নিধনযজ্ঞের আয়োজন করেন। বিশদ ব্যাখ্যায় তাঁদের বক্তব্যের সহজ রূপ দাঁড়ায় এই যে পশ্চিমের সস্তা চটুল সুর আজ দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত মানুষের কাছে এক প্রচণ্ড প্রলোভন নিয়ে আসে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিকৃতরুচির অসুস্থতা ও তারই শিকারে উন্মার্গ শত সহস্র সাধারণ শ্রোতা। আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং সকলেরই যে মানসিক সুস্থতার অভাব আছে এমন কথা সগর্বে কেই বা ঘোষণা করেন। আধুনিক বাংলা গানের বিপর্যয়ে যাঁরা শঙ্কিত হন বর্তমান লেখক পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁদেরই দলের অন্তর্ভুক্ত একথা বোধহয় প্রথমেই

বলে নেওয়া ভালো। আধুনিক বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা সব কিছুরই সৌজাত্য আছে অথচ শিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ যে গান তার স্থান শিক্ষিত সমাজের বহুদূরে।

ভাষা ও সুর

বাংলা গানের প্রধান দুটি অঙ্গ, ভাষা ও সুর। আর একটু বিশদ ভাবে বলা যায় একটি তার কাব্যের দিক, অন্যটি সঙ্গীতের। আমাদের আলোচ্য বিশবছরের গান রচয়িতাদের ইতিহাস বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে লেখা নিঃসন্দেহে কঠিন। উত্তর-নজরুল কালের বাংলা গানের ধারা প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যার ফলে গানের মধ্যে সুরস্রষ্টা, কণ্ঠশিল্পী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেন যিনি হলেন গীতিকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রপ্রতিনিধির কাছে আধুনিক বাংলা গানের জনৈক বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে বর্তমান বাংলা গানের জগতে গীতিকার ও সুরকার আলাদা ব্যক্তি হওয়ায় বাংলা গানে সুর ও ভাষার মধ্যে সমতারক্ষা করা যায় না। সৃজনশীল সমালোচনায় এমন মতামতের গুরুত্ব থাকলেও বাংলা গানের সামগ্রিক বিচারে এই সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়াবে এমন কোনো কারণ নেই। কেননা, তাহলে কণ্ঠশিল্পীর পক্ষেও অন্য রচকের গানের সুষ্ঠু প্রকাশে বাধা থেকে যাবে এবং তিনজনই একই ব্যক্তি হবেন এমন সৌভাগ্যের কথা না ভাবাই ভালো।

বাংলা গানের কাব্য বা লিরিক

বাংলা গানের কাব্য বা lyric নিয়ে প্রথমে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। গান যেদিন আধুনিকতার স্পর্শ পেল সেদিন তার ভাষা হল সহজ, কাব্যের আবেদনকে সর্বজনীন করার প্রয়াস মুখ্য হয়ে দেখা দিল গীতিকারদের মধ্যে। প্রসঙ্গত আধুনিক কবিতার বিপরীত ধর্মের কথা উল্লেখ করা পারে। যে কোনো শিল্পই যখন সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী উপকরণ হয়ে কাজে লাগে তখন তার মধ্যে আর যাই থাক ভাবের গভীরতা থাকে কদাচিৎ। সকলকে শিল্প-সচেতন করা তখনই সম্ভব যখন জনসাধারণের শিক্ষার একটা সাধারণ মান থাকে। বাংলাদেশের মননশীল গীতিকাররাও তাই সহজ পথে জীবনবোধ প্রকাশ করার কাজে লাগলেন। আমাদের আলোচ্য যুগের প্রথম অংশে শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যের মতো শক্তিশালী গীত-রচয়িতারা

সময়ে সময়ে সুরের দুর্বলতা ঢাকা দিয়েছেন কাব্যের মাধুর্য দিয়ে। জনপ্রিয়তা নিয়ে আলোচনা করলে একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি পড়ে। সে যুগে গীতিকারদের কোনো স্বতন্ত্র স্থান ছিল না সাধারণ শ্রোতাদের মাঝে। সর্বপ্রথম কণ্ঠশিল্পী এবং তারপরে যাঁর স্থান ছিল তিনি গানের সুরকার। বাংলাদেশের আধুনিক গানের শ্রোতারা গীতিকার ও সঙ্গীত-পরিচালক সম্পর্কে প্রথম সচেতন হলেন 'গাঁয়ের বধূ' জনপ্রিয় হবার সময়। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়। তখনকার অনেক গানের কাব্যগত মূল্য ছিল না এমন নয়, কিন্তু কণ্ঠশিল্পীর জনপ্রিয়তা অন্যের খ্যাতি ও প্রতিভাকে অনেকাংশে গ্রাস করে। তাছাড়া আরো একটি প্রণিধানযোগ্য কারণ ছিল। বাংলা চলচ্চিত্র তখন এত প্রসার লাভ করেনি এবং চলচ্চিত্র সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার প্রধান সহায়ক এতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। নজরুল-পরবর্তী গীতিকারদের ওপর পূর্বসূরীদের প্রভাব খুব নগণ্য। শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যের কিছু কিছু গানের মধ্যে প্রতিভার আভাস ছিল তবে সে-কাব্য শুধু সুরের বাহন হয়ে জনগণের অন্তরে প্রবেশ করেছে। তাই স্বতন্ত্র মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। একটি বস্তু লক্ষণীয় এই-যে তখনকার গীতিকারদের গানের মূল ভাব ছিল প্রকৃতি বা প্রেম বা একসঙ্গে দুটোই। যেমন, চাঁদ চামেলি নিয়ে লেখা একাধিক জনপ্রিয় গান—

> "চাঁদ ভোলে নাই, চামেলিরে তাই,
> চামেলি ভোলেনি চাঁদে"

অথবা "কহিল চামেলি চাঁদেরে ডাকিয়া" প্রভৃতি।

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পাশ্চাত্ত্যের বহু জনপ্রিয় গানের ভাষাও এইরকম প্রেম বা প্রকৃতিধর্মী এবং তার কাব্যগত মূল্য অত্যন্ত নগণ্য। যেমন শুবার্টের (Schubert) একাধিক পরিচিত গান। বিগত বিশ বছরের বাংলা গানে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গীত-রচয়িতারাই প্রথম ভাষার স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেন। তখনকার প্রচলিত ধারার মধ্যে শ্রীবিনয় রায়ের "সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি বঙ্গদেশ বীর প্রসবিনী" গান অভিনবত্বের সূচনা করে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার" কাব্যের বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। এই সময়কার গানের সাহিত্যিক মূল্য থাকার প্রধান কারণ এই যে গীতিকারেরা বেশির ভাগই কবি। এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি' কবিতা।

শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের "মাউন্টব্যাটন সাহেব হো!" শুধু সুর হিসেবেই চিত্তাকর্ষক নয়, ব্যঙ্গ কবিতায়ও এর অমেয় মূল্য আছে। দেশকে বিদেশী নাগপাশমুক্ত করার দৃঢ় সঙ্কল্প ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়, এই পৃথিবীকে সকলের বাসযোগ্য করে তোলার আদর্শ এই সময়কার গানকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে তুলেছে। তবে সাম্যবাদের আদর্শ সমস্ত গানের মূল ভাব হওয়ায় আবেদনে এই গান সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে শ্রীসলিল চৌধুরীই প্রথম জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর "কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন" চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের রেকর্ড সঙ্গীতের ইতিহাসে এ গান আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সুরারোপিত হওয়ার দরুণও গানের জগতে ভাষার স্বতন্ত্র মূল্য প্রতিষ্ঠিত হলো। অপেক্ষাকৃত তরুণ সুরকারদের ওপর অবশ্য এর প্রভাব খুব সুখকর হয়নি। যেমন "রিক্সাওয়ালার গান" ও এই জাতীয় আরো কিছু নিকৃষ্ট রচনা। এই সময়ে আরো একটি স্মরণীয় রীতির প্রবর্তন হয়। প্রাচীন বাঙলা কবিদের কবিতাকে আধুনিক সুরকারেরা সুর সংযোজন করে আধুনিক বাংলা গানের জগতে নূতনত্বের সূচনা করেন। যেমন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বহুখ্যাত কবিতাগুলিকে সাম্প্রতিক কালের সুরের বাহন হিসেবে কাজে লাগানোর প্রয়াস। এই প্রচেষ্টা সকলক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। ঠিক এই সময়ের কিছু পর থেকে যে-রীতি বাংলা দেশের কাব্য বা লিরিকে চলে আসছে আজও সমান ভাবে তা অক্ষুণ্ণ আছে এবং ভাষার কিছু পরিবর্তন এখানে ওখানে চোখে পড়লেও মোটামুটিভাবে তাকে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের গান:

"উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে,
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে
হে কাল হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারোমাস।"

আধুনিক বাংলা গানের উৎকৃষ্ট ব্যতিক্রম। এখনকার গীতিকারেরা অধিকাংশই কবি না হওয়ার দরুণ বাংলা গান ক্রমশ অশ্রাব্য হয়ে উঠছে। এ উক্তি নিয়ে মতবিভেদ থাকার সুযোগ খুব কম। এর পক্ষে কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

"ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গে কতই খেলা।
বধু কি তীরে বসে মধুর হেসে দেখবে শুধুই সারা বেলা,"

অথবা

"এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না যে মন
কবে যাব ফিরে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ,"

অথবা,

"এলো বরষা সহসা মনে তাই,
রিমঝিমঝিম রিমঝিমঝিম গান গেয়ে যাই,"

অথবা,

"আমার এ গানে স্বপ্ন যদি আনে
আঁখি পল্লব ছায়,
স্বপ্ন দেখে যাবো ছন্দ ভরা রাতে
তুমি আমি দুজনে"

প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় গান বাংলাদেশের গানের বাজার সরগরম করে তোলে। এর মধ্যেও অবশ্য কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ভালো গান স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে:

"পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি
সোজাপথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি,"

অথবা,

"এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম,
ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে পেলাম,"

তবে অন্যান্য গানের ভিড়ে এর সংখ্যা খুব নগণ্য।

কাব্যের দিকে যা পরিবর্তন ঘটেছে তার দ্বিগুণ অভিনবত্ব এসেছে বাংলা গানের সুরের দিকে। সুরসাগর শ্রীহিমাংশু দত্তের নাম এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সুরের যে ব্যঞ্জনা ছিল পরবর্তী গানে তার তুলনা মেলা ভার। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল লয়কে সহজ করে ভেঙে সুরকে স্বাধীন করে তোলার প্রয়াসে শ্রীদত্ত খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শ্রীকমল দাশগুপ্তও কিছু সুন্দর সুর সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ওপর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও গজল এই দুইয়ের প্রভাবই সমান ভাবে স্পষ্ট।

ঠুংরীকে আধুনিক গানের জগতে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্তী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তাঁর সুর প্রথম আমাদের আধুনিক বাংলা গানের উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন করে। প্রবীণ সুরকার শ্রীঅনিল বাগচীও এই ধারায় প্রভাবিত হন এবং বাউলের সুরকে আধুনিক করে ব্যবহার করায় তাঁর গান প্রভূত জনপ্রিয় হয়। এই সময় থেকেই ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ বাংলা গানে বিভিন্ন দেশের সুরের অনুপ্রবেশ ঘটান। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সুর ও তাল এই সময় থেকেই আধুনিক বাংলা গানের মুখ্য অঙ্গ হয়ে পড়ে, যদিও শ্রীশচীনদেব বর্মণ আগে থেকেই এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ও লোকসঙ্গীতের সংমিশ্রণে প্রথম জনপ্রিয় ও শিল্পোন্নত বাংলা গান সৃষ্টি করেন সলিল চৌধুরী। লোকসঙ্গীতের সহজরীতির সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সুর ও লয়ের মিলন ঘটান। এর সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে 'রানার' ও 'পাল্কির গান'-এ। সাম্প্রতিক কালের গানের মধ্যে "কি যে করি দূরে যেতে হয়" ও "না যেও না, রজনী এখনো বাকী" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুটো গানের প্রথমটায় গজলের সুর ও শেষেরটায় ঠুংরীর সুর। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আবহসঙ্গীতে দুটো গানের ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য সিম্ফনির (symphony) সুর বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক বাদ দিলেও অভিনব পরীক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এর মূল্য চিরদিন থাকবে। শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত ও শ্রীনচিকেতা ঘোষ এই ধারায় প্রভাবিত হন এবং কিছু সার্থক গান রচনা করেন। শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বকীয়তার লক্ষণ খুব কম পরিলক্ষিত হয় যদিও দু-একটা সঙ্গীতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীভূপেন হাজারিকা অসমীয়া লোকসঙ্গীতের সুর বাংলা গানে সংযোজন করায় কিছু শ্রুতিমধুর সুরের সৃষ্টি

হয়েছে তবে অধিকাংশ গানের কাব্য দুর্বল হওয়ায় গান হিসেবে শিল্পোন্নত হয়নি। আজকের চলমান বাংলা গানের জগতে শ্রীহারীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরের একটা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর একাধিক জনপ্রিয় হিন্দী সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, তাঁরা স্বভাবতই গণনাট্যসঙ্ঘের সুরকার-দের গানে এবং বিশেষ করে শ্রীসলিল চৌধুরীর সুরে এই প্রভাব লক্ষ্য করবেন।

বাংলা গানের ভবিষ্যৎ

কাব্য ও সুর এই দুই অঙ্গ নিয়ে রচিত বাংলা গান সম্পর্কে আলোচনা করলে সঙ্গীতানুরাগীদের বাংলা গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ ঘটে। আধুনিক বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে আজ বিপর্যয় এসেছে, তাই বাংলা গানেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে এমন আশা করা যায় না। তবে বাংলা গানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গঠনমূলক সমালোচনার (constructive criticism) প্রয়োজন আজকে সবচেয়ে বেশি। বাংলা গান নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা একথা প্রায়ই বলে থাকেন যে পাশ্চাত্যের রক এন রোল বা চা চা চা প্রভাবই বাংলা গানের দুর্দশার কারণ। তাঁদের সচেতন হওয়া উচিত যে কোনো সুরের প্রভাব গানে কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে সুরস্রষ্টার প্রতিভার ওপর এবং একই সুরে একটি শিল্পোন্নত ও অপরটি নিকৃষ্ট গান সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সকলেই পাশ্চাত্য সুর অনুপ্রবেশ করিয়েছেন বাংলা গানে এবং তার মধ্যে অনেক গান আজও বাঙালীর অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে। অতুল-প্রসাদও যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সঙ্গীতের মিলন ঘটিয়েছেন।

আজকের দিনে সঙ্গীত-উৎসাহী ব্যক্তিরা সুরের ক্ষেত্রে নূতন নূতন পথের ইঙ্গিত দেবেন, এবং বাংলা গানের কাব্যের দিককে উন্নত করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কবিরা, সেই আশা নিয়েই এই আলোচনার সূত্রপাত করা।

সুহাস চৌধুরী

নাট্য প্রসঙ্গ

লিটল থিয়েটার

গত আঠারোই জানুয়ারি সারা পৃথিবীব্যাপী স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। কলকাতায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে ঐ একই দিনে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আধুনিক নাট্য ও মঞ্চভাবনার জন্মদাতা স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনানুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কলকাতার সোভিয়েত কনসাল জেনারেল স্ট্যানিস্লাভস্কি সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। আলোচনা শুরু হবার পূর্বাহ্নে একশোটি মোমবাতি জ্বালিয়ে স্ট্যানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিকীর শুভ ঘোষণা করা হয়। শেষ মোমবাতিটি অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সোভিয়েত কনসাল জেনারেল স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত করেন। শ্রীউৎপল দত্ত আধুনিক রুশ এবং জার্মান থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, স্ট্যানিস্লাভস্কির মঞ্চরীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হলেও ব্যক্তির ইচ্ছা বা মত অনুযায়ী অন্যরীতি প্রয়োগ করার স্বাধীনতা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মায়ারহোল্ড অখলভ প্রমুখের নাম করেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি যেখানে অভিনেতা এবং দর্শকদের মধ্যে একটি কল্পিত ব্যবধান টেনেছেন, যাকে স্ট্যানিস্লাভস্কির পরিভাষায় 'চতুর্থ প্রাচীর' বলা হয়, সেটি তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যরা মানতে রাজী হন নি। স্ট্যানিস্লাভস্কির অভিনয়-রীতি অনুসারে অভিনেতা দর্শকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অতি সচেতনভাবে 'কাহিনীর বাস্তবে' প্রবেশ করবে। সার্থক অভিনয়-কলার গোপন ঐশ্বর্য এখানেই বিদ্যমান। মায়ারহোল্ড অখলভ প্রমুখরা স্ট্যানিস্লাভস্কি কল্পিত 'চতুর্থ প্রাচীর' তো মানলেনই না, বরং অভিনেতারা যে অভিনয় করছেন তা 'কাহিনী, অভিনয়রীতি এবং মঞ্চ প্রয়োগ কৌশলে দর্শকদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন'। বার্লিনের থিয়েটার প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন। জার্মান কবি নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখটের নাট্যরীতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু ব্রেখট 'এপিক থিয়েটারে' বিশ্বাস করতেন, কাজে কাজেই তিনি স্ট্যানিস্লাভস্কি কল্পিত 'চতুর্থ প্রাচীর'কে সরাসরি অস্বীকার করলেন। মানবিক আবেগের বদলে তিনি মননের অমসৃণ সংলাপকে বেশি করে প্রশ্রয় দিলেন। মঞ্চকৌশলে

ব্যাপক পরিবর্তন ঘটালেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ট্যানিস্লাভস্কির মৌল প্রভাবকে তিনিও অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। নাটকের চরম সংঘাতমুহূর্তে অভিনেতাকে সেই চরিত্রের মধ্যে ডুব দিতে হয়ই, ভুলে যেতে হয় দর্শকের কথা।

স্টানিস্লাভস্কির মহত্ব এইখানেই। অতঃপর শ্রীউৎপল দত্তের পরিচালনায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক আন্তন চেখফের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত 'বাজি' একাঙ্কিকাটি অভিনীত হয়। এ কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এখনও পর্যন্ত যদি কোনো দল শৌখীন নাট্যসংস্থার মনোভাব বজায় রেখে থাকেন, তাঁদের মধ্যে লিটল থিয়েটারের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণযোগ্য। লিটল থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃত বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা শিল্পকর্মে প্রয়োগ করা। খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্মবিচারের তারতম্যে অংশবিশেষ সমালোচনীয়। বর্তমানে এঁদের প্রযোজিত 'বাজি' একাঙ্কিকা দেখে কয়েকটি ভাবনা মনে উদয় হয়েছে। স্ট্যানিস্লাভস্কির প্রভাব মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় যে কটি নাট্যান্দোলন গড়ে উঠেছে, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্বাচিত অভিজ্ঞতা শ্রীউৎপল দত্ত কাজে লাগাতে চান। প্রথমত প্রেক্ষাগৃহের মাঝবরাবর একটি বক্তাচরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়ে নাটকের মূলকাহিনীতে প্রয়োগ করানো, এবং প্রয়োজনমতো সেই একই চরিত্র, যাঁকে আমরা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে চিনলাম, তাঁরই আত্মপরিচয় ভাষণে নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র বজায় রেখে চলছিলেন অনেকটা কথকঠাকুরের ঢঙে। নাটকের চরিত্রসমূহের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং বিশেষ করে সঙ্গীতের অভিনবত্ব স্বীকার্য। ইওরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলির তুলনায়, এখানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই স্বল্প। সেদিক থেকে শ্রীদত্তকে অভিনন্দিত করব। কিন্তু একথাও না-বলে পারছি না, নাটক দেখাকালে যে বিচিত্র জগতের মায়াজাল বোনা হয়, তাকে বারবার ভেঙে, আমরা নাটক দেখছি এটা জানিয়ে দেওয়ার কী সার্থকতা! শ্রীদত্তেরই উল্লেখিত ব্রেখ্‌ট রচিত 'দি ডেজ ইন্ দি কম্যুন' নাটকের পরিণতির কথা আমার একবার মনে পড়ছে। কেননা, অনেক সময় দেখা গেছে প্রয়োগ-রীতির 'অনিবার্য সাফল্যের' জন্য কাহিনীকে নাট্যরসের প্রাবল্যের দ্বারা মুহুর্মুহু আচ্ছন্ন করার মধ্যে অভিনেতৃদের উচ্চমানের অভিনয়কে পরোক্ষভাবে কিছু ক্ষুণ্ণ করে দেওয়া হয়। সঙ্গীতের অভিনবত্ব পরিবেশকে রোমাঞ্চিত করার মধ্যে যে সাফল্য খুঁজে পেয়েছে তা একান্তই বিদেশী চলচ্চিত্র তথা সাসপেন্স থ্রিলার (হিচকক্ জাতীয়)

মুখাপেক্ষী। সঙ্গীত পরিচালকের সংমিশ্রণের ক্ষমতাকে মর্যাদা দিই। 'বাজি' নাটিকার রূপায়ণে ছিলেন শ্রীসলিল ভট্টাচার্য, শ্রীসমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরুণ রায়। প্রথম রজনীর অভিনয় হলেও প্রতিটি চরিত্রের বিশেষত উত্তীয়ের ভূমিকায় শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিহিরের রূপদানে শ্রীঅরুণ রায় যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা অধিকতর নিষ্ঠায় পরিণতির পূর্ণতা টানবে। নাটিকাটির পরিচালনা করেছেন শ্রীউৎপল দত্ত।

এ-ছাড়া সোভিয়েত দেশ কার্যালয়ে আর একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিতি ছিলেন।

রূপকারের 'তিলতর্পণ'

গত একুশে জানুয়ারি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রূপকার নাট্যগোষ্ঠী অমৃতলাল বসুর 'তিলতর্পণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 'তিলতর্পণ' মূলত 'অপরিণত দর্শক' এবং সস্তায় বাজার মাত করার উদ্দেশ্যে যে সকল নাট্যসংস্থা নাট্যপ্রযোজনার ব্যাপারে এগিয়ে আসে তাদের, বিশেষত একটি যুগের বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে, মুখ্যত আক্রমণ করে নাটকটির 'সাফল্যের' মূল কারণ হিসাবে বলছে,

"The Great
Farcial Tragi-Comedy-De-Pantomime
Operetta
for the first time in Indian Stage,"

এ-হেন নাটক দর্শক না দেখে থাকতে পারে না। কেন না এতে সবই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে, 'Or the celebration of the Augustian celebration on the bank of mother Ganges with Til seeds in a copper plate to eat our fathers and fourteen generations." এক কথায় চৌদ্দপুরুষকে খুশি করা। এতে কী না আছে, 'scende, wing and Procenium in the Stage, Zoological show in the Stage, Singing Dancing, Climbing, Jumping, throught on Music flowing in Cuprimic flow to conclude with nothing, when we laugh we lough with us."

সত্যি আমরা 'হেসেছি।' ইতর রসিকতায় আচ্ছন্ন শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্যে, মার্জিত-রকের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে, তদুপরি নাটকের চরিত্রাবলীর ঐতিহাসিক অসংলগ্নতায়। স্ট্যানিস্লাভস্কির সমসাময়িক এই নাট্যকার অভিনেতা-দর্শকের ব্যবধান কি নিপুণভাবে ঘোচালেন তা স্বভাবতই মনে হয়। অভিনয়াংশে প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত। সর্বাগ্রে শ্রীসবিতাব্রত দত্তর অভিনয় প্রশংসনীয়। তিনি একাই তিনটি চরিত্রের অভিনয় করেছেন সুন্দরভাবে। আবহসঙ্গীতে যুগের স্পন্দন পেয়েছি। মঞ্চসজ্জা এবং খুঁটিনাটি ডিটেলে সে-যুগটা পরিচালনার গুণে ফুটে উঠতে পেরেছে। তবে নাটকটির উপস্থাপনের মধ্যে কোনো সীরিয়াস শ্লেষ বা ইঙ্গিত না-থাকায় সচেতন পরিচালনার মৌল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। দক্ষ পরিচালনা এবং সুঅভিনয় সত্ত্বেও মনে হয়েছে রূপকারের ইদানীং বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং প্রয়োগ-রীতি স্বাভাবিকবাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। সমসাময়িক জীবনের জীবন-জিজ্ঞাসাকে শিল্পজাত করা কি এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি না রূপকারের মতো শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী তা করতে পারেন না। 'তিলতর্পণে'র অন্যান্য চরিত্রাংশে শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'অজু', শ্রীমতী কালিন্দী সেনের 'রাণী', শ্রীমতী গীতা দত্তর 'হেমাঙ্গিনী' প্রভৃতির প্রাণবন্ত অভিনয় যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল। 'নাট্যকার' অতি অভিনয়ে দুষ্ট। 'সমালোচকে'র ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ দত্তর অভিনয় স্মরণযোগ্য। রূপকারের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হতে চাই।

অলক চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরিচয় নামধেয় একটি পাব্‌লিশার্স-এর কথা শোনা যায়। অনেকে এ-সম্পর্কে আমাদের কাছে অনুসন্ধানও করেন বলে জানাতে হচ্ছে—ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

রবার্ট লী ফ্রস্ট

খুবই অল্পকালের ব্যবধানে কয়েকজন মার্কিন শিল্পসাধকের মৃত্যু হলো। বয়সের ভারে ন্যুব্জ কিন্তু আত্মার মহিমায় ভাস্বর জীবনদরদী মার্কিন কবি রবার্ট লী ফ্রস্ট গত ২৯শে জানুয়ারী লোকান্তরিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর আটাশি বছর বয়স হয়েছিল।

রবার্ট ফ্রস্টের নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব প্রদেশ নিউ ইংলণ্ডের সঙ্গে সমগৌরবে উচ্চারিত হয়। ১৮৭৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর জন্ম, পিতার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে তিনি তাঁর সাতপুরুষের বাসভূমি নিউ ইংলণ্ডে বাস করতে আসেন।

নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতি, তার তুষারবিস্তারী অরণ্য প্রদেশ, গাথা ও উপকাহিনী কিশোর ফ্রস্টকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতিই কবি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার মূল বিষয়বস্তু।

নানা কারণে ফ্রস্টের জীবন ঘটনাবহুল। ডার্টম্যাউথ এবং হারভার্ডে তিনি অধ্যয়ন করেও কোনও ডিগ্রি নেন নি। মুচির কাজ, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, চাষআবাদ প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাঁকে অন্নসংস্থানের জন্য করতে হয়েছে। ১৮৯৫ সালে বিবাহিত এবং ১৯৩৮ সালে বিপত্নীক ফ্রস্টের শিল্পজীবনে খ্যাতি আসতে যথেষ্ট দেরি হয়েছে। ১৯১২ সালে নিউ ইংলণ্ডের খামারবাড়ি বিক্রী করে ফ্রস্ট সপরিবারে ইংলণ্ডে সংসার পাততে এলেন। ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'এ বয়েজ উইল' আটলাণ্টিকের দুই পাড়ে তাঁর খ্যাতি বয়ে আনে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'নর্থ অব বস্টন' তাঁকে মার্কিন দেশে প্রখ্যাত করে তোলে। ফ্রস্ট অতঃপর নিউ হ্যাম্পশায়ারে একটি খামার কিনে বসবাস শুরু করেন।

পরবর্তী জীবনে ফ্রস্ট বহুবিধ সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন, তাদের মধ্যে বহু সম্মানী-ডক্টরেট উপাধি, এবং চারবার পুলিট্জার পুরস্কারলাভ অন্যতম। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে জীবিত মার্কিন কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে সম্মানিত করে বলিন্‌জান পুরস্কার দেয়। পোয়েট্রি সোসাইটির স্বর্ণপদক ছাড়া তিনি লাইব্রেরী অব কন্‌গ্রেসের কবিতা-বিষয়ক উপদেষ্টার সম্মানও পেয়েছিলেন।

সহজ, সরল এবং প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভঙ্গিতে তাঁর শিল্পশৈলী চিহ্নিত, অমিত্রাক্ষরে নাটকীয় ব্যক্তিসংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি নিউ ইংলণ্ডের প্রকৃতির—অরণ্য, জীবন ও তুষারপাতের বহুবিধ প্রতীকে অন্তর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিকটে সকল বস্তুই যেন ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঐক্যবিধান কার্যের

অসীম ব্যঞ্জনার অবশ্য অংশমাত্র! শব্দের চটকদারীতে, ভঙ্গির চমকে তিনি সাময়িকতার উচ্চরবে নিজেকে মেলাতে চান নি। যন্ত্রশিল্পাশ্রয়ী মার্কিন জীবনযাত্রার মুষিক প্রতিযোগিতার অন্যকোটিতে, অন্য এক জীবনবিশ্বাসী জীবনপ্রেমিক মার্কিন জগতের তিনি সন্ধান দিয়েছেন। গ্রামে বরফপাতের চিত্রটি, একক বৃক্ষশাখায় পাখিটির তুহিনবিস্তারী নিসর্গে নির্জনতা অনুভব প্রভৃতি চিত্রভাত হয়ে মার্কিন শিল্পচিন্তার অন্য একটি দান্ত আত্মস্থ পরিবেশ প্রদর্শিত করে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সোবিয়েত যুক্তরাজ্যে ভ্রমণে যান, সম্ভবত নিউ ইংলণ্ডের বার্চ গাছটির সঙ্গে কোনও সোভিয়েত জনপদপ্রান্তের রেলস্টেশনের পাশের বার্চ গাছটির মধ্যে তিনি কোনও বৈপরীত্যই খুঁজে পান নি। আপাত বৈপরীত্যের সুগভীরে যেখানে চিরায়ত জীবনপ্রবাহ, কবি রবার্ট ফ্রস্ট তার সংবাদই রাখতেন।

রবার্ট লী ফ্রস্টের কয়েকটি কবিতা

বিজনস্থলি

বরফ ঝরে, রাত্রি ঝরে—দ্রুত, কেমন দ্রুত,
মাঠের পথে চলতে গিয়ে দেখি,
মাটি যেন-বা ভরোভরো নিটোল তুহিনতায়
তবু অবশেষ বন্যঘাস, গুঁড়ি প্রকাশে, এ কি!

চতুর্দিকে বনে ঘেরাও, পেয়েছে তাকে, সে তো এখন ওদের
সর্বপ্রাণী আস্তানায় স্তব্ধ করে দিতে
আমি যেন-বা ভোলা ছিলাম সে সব গণনায়
একাকীত্ব আমাকে নেয় কখন অজানিতে।

নির্জনতা নিটোল, হেন বিজন চারিধার
ঘনিয়ে তোলে হায় সুবিজন…যা ঝরে যাবে পাছে
ব্যাপ্ত শাদা দিক্‌প্রসারী তুহিন নিশীথিনী
অনুচ্চারে স্তব্ধ, কিছু বলার নাহি আছে।

আমাকে ভীত করে না ওরা শূন্য অবকাশে
তারায় তারায় শূন্যতা—নাই তারায় নরনারী
আমারও মাঝে সে সব রয় গহিনে, সুগভীরে
ভয় দেখায় আমাকে নিজ বিজন আপনারি॥

বনের পাশে বরফে

এই বনরাজি কার, আমি যেন জানি
যদিও-বা গ্রামে গৃহখানি আছে তার
এখানে দাঁড়ায়ে সে আমারে দেখিবে না
বনে দেখিবারে বরফের বিস্তার।

আমার ছোট্ট ঘোড়া মানে বিস্ময়
না-থামায় কোনো খামারবাড়ির পাশে
বনরাজি আর বরফ জমাট হ্রদে
সারা বছরের কালো রাত নেমে আসে।

জিনের ঘণ্টা দোলা দেয় শুধাবারে
যেন সে, বুঝি-বা হলো ভুলচুক পিছে
কেবল অন্য স্বণণ বহিয়া যায়
সরল হাওয়া, ও তুষার ঝরার নীচে।

সুমদির বন, সুকৃষ্ণ সুগভীর।
বহু কথা দেওয়া আছে, মনে সব জাগে
যেতে হবে ঢের মাইল ঘুমের আগে
যেতে হবে ঢের মাইল ঘুমের আগে॥

আমার বাতায়নের পাশের গাছটি

বাতায়নধারে গাছ, জানলার গাছ,
আমার ঘরের শার্সি নামাই ছায়া বিস্তারী যামে
তবু যেন কোন যবনিকা আর কভু না মধ্যে নামে—
তোমার আমার মাঝ।

মাটি বেয়ে উঠেছিল অস্ফুট স্বপ্নের উদ্ভাস
বিস্তৃত হয়ে ছড়ায়ে রয়েছো মেঘের নিকটতর,
আলো ছলোছলো রসনা, তোমার সকল কলস্বর
হয়না প্রগাঢ় ভাষ।

তবু গাছ, আমি দেখেছি তোমায় উত্তাল হতে বায়
আর যদি তুমি আমাকেও দেখ যবে নিদ্রিত রই
কেমন আবেশ গভীর প্লাবনে ভেসে যাওয়া থই থই
সকল হারায়ে যায়।

সেদিন রমণী আমাদের শির এক করে রেখে যায়
ভাগ্য আছিল মোহিনীর দিকে প্রত্যাশে অনিমিখে :
—তোমার ললাট উদ্যত রয় অতি বাহিরের দিকে
আমার রয়েছে অন্তরে, আবহাওয়ায় ॥

অননুসরিত পথ

দুটি পথ যায় দুদিকে, হলুদ বন,
দুঃখিত, যাই কেমনে দুপথে চলে
একক পথিক, দাঁড়াই অনেকক্ষণ
দেখি পথ এক—যত যায় দু-নয়ন
যেখানে সে পথ বাঁক নেয় তৃণদলে ;

আর পথ ধরি, সমসুন্দরই লাগে
মনে হয় যেন অধিক সে দাবীদার
কেননা সে পথে ঘাস বেশি, ক্ষয় মাগে
যদিও সে পথ বহু গতায়াতে আগে
পায় যথার্থ প্রায় সমক্ষয়ভার,

সমানই প্রভাত শায়িত বক্ষ পরে
পদচিহ্নের কালিহীন পাতা রাশি,
আহা প্রথমটি রাখি আর-দিন তরে
তবু মনে রাখি পথ টানে পথই ধরে
সন্দেহ মানি—যদি নাই ফিরে আসি।

শোনাবো একথা দীর্ঘনিশ্বাসে নামি
কোথাও আজের বহু বহু যুগ পরে :
দুটি পথ গেল দুদিকে, এবং আমি—
স্বল্প চরণচিহ্ন পন্থগামী—
আর তাই দিল সব বিপরীত করে ॥

তরুণ সান্যাল

সম্পাদকীয়

রুদ্রের দক্ষিণ মুখ

মাথার উপরে যখন আকাশ ভেঙে পড়ছে এ অবস্থা, আজি সম্ভবত মানুষের মাথা খারাপ না করার দরকার বেশি। অবশ্য সাধারণ মানুষ প্রায়ই তা পারেন না। কিন্তু সেই সঙ্কটমুহূর্তে সমাজের বুদ্ধিজীবীরাও যদি বুদ্ধির সঙ্গে কর্তব্যের স্থির সম্মেলন ঘটাতে বিমুখ হন তাহলে তাঁরা যা করেন তার নাম আত্মনাশ, হয়তো আত্মপ্রবঞ্চনাও। সমাজেরও তা দুর্ভাগ্য, আর সামাজিক বিচারেও সে কাজকেই বলা যায় La Trahison de clerk. ভারতবর্ষের ও বাঙলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা অনেকবারের মতো আবার এই পরীক্ষারই সম্মুখীন হয়েছেন চীনা আক্রমণের ফলে ও তার বিপর্যয়ে। পরীক্ষা রাজনীতির ও সামরিক শক্তিরও বটে, কিন্তু প্রধান পরীক্ষা জাতীয় সংহতির, সংগঠন শক্তির ও প্রবুদ্ধ চেতনার। সেইখানেই বুদ্ধিজীবীর আজ সাধনা।

নানা কারণেই দেখা গিয়েছে বুদ্ধিজীবীও আজ বড় অসহায়। প্রকাশ ও প্রচারেই যাদের অস্তিত্ব সেই বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা আজ ভাগ্যভারেও খর্বিত—তাঁরা আর স্বাধীন নন। বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য 'কলম' যাঁরা সাজান, বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য কলম ধরা তাঁদের অসাধ্য। আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এরূপ অবকাশ এখনো বিলুপ্ত নয়; দায়িত্বপালন তাঁদের অনেকের পক্ষে সম্ভব। অন্তত বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের সে ঐতিহ্য আছে। মহৎ আমাদের সৌভাগ্য—আমাদের সম্মুখে চিরজাগ্রত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যে কত জাগ্রত তা শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিভাষণ থেকে আর-একবার আমরা অনুভব করলাম। এবং ঠিক রবীন্দ্র-বাণীরই বাঙালী উত্তর-সাধকদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন সংশয়িত হয়ে উঠছিলাম তখনি পত্রান্তরে দেখলাম—শান্তিনিকেতনস্থিত শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সুদীর্ঘ পত্র 'যোগভ্রষ্ট'। তাঁর মত, তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব; তাঁর চিন্তাভাবনার তা দান। সে সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে। কিন্তু যে চিত্তস্থৈর্যের, শুভবুদ্ধির ও শুভ্র আন্তরিকতার পরিচয় তাতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর তা কাম্য। এই শ্রেয়ঃবোধই বাঙালী সাহিত্যিকের আপন ধর্ম, তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। আর

একবার বুঝলাম—রবীন্দ্রনাথ জাগ্রত। রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমাদের নিকট তিনি উন্মোচিত করে রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই রুদ্র সাধনা বাঙালী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির নিয়মে ও সৃষ্টির সংকল্পে সংযুক্ত করবে, এ আশা আমরা পোষণ করি। তার ব্যতিক্রম অবশ্য আজ কম দেখছি না; কিন্তু ব্যতিক্রমটাই সমগ্র সত্য নয়। সাংবাদিকতার কথা বাদ দিয়ে গদ্যে পদ্যে সাহিত্যিকদের উন্মাদনার যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অপেক্ষা করে থাকব—সবটা একেবারে স্থূল বাগাড়ম্বরে বা মেদমজ্জাহীন ভাবালুতায় নিঃশেষ হবে না। সৃষ্টির ফুল ফুটবে, বুদ্ধির ফসলও লাভ হবে, কর্মের যোজনা হবে সুনিশ্চিত। যো নো বুদ্ধি শুভয়া যুনক্তু।

সংবাদপত্রের যুগান্তর

'যুগান্তর' সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে ছ' মাস পূর্বে মস্কোতে, আর সাক্ষাৎ এখনো হয় নি। তার পূর্বেই তাঁকে 'যুগান্তর'-সম্পাদক বলবার উপায় আর রইল না—সম্ভবত তাতে অনেকের পক্ষে যুগান্তর পড়বার প্রয়োজনও মিটে গেল। সকলের পক্ষে নিশ্চয়ই একথা খাটবে না। কারণ, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লেখা এদেশের পাঠকের পক্ষে এখনো একেবারে নগণ্য নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই তা গৌণ হতে শুরু করেছে। সংবাদই প্রথম পাঠ্য, এবং সংবাদ অপেক্ষা 'বিসম্বাদে'ই রুচি গঠিত। বলা বাহুল্য, এজন্যই 'বার্তা-সম্পাদকরা' 'কর্তা-সম্পাদকের' পরেই অধিক-গ্রাহ্য। উপরতলার রাজা-উজীরের দরবারে যান কর্তা-সম্পাদক আর তারপরেই স্থানীয় 'কালচারের ফাংশনে' পৌরোহিত্য করেন বার্তা-সম্পাদক—যাঁর 'ভাষণ' উপলক্ষ করেই ফাংশনকারীদের নামটা তাই পত্রস্থ হবার সুযোগ থাকে। এ যুগে লিখিয়ে সম্পাদক তাই 'এক্‌সপেণ্ডেব্‌ল্' মাল সংবাদপত্রের মালিকদের খাতায়,—বিশেষ করে আবার সেই সম্পাদক যিনি নামে সম্পাদক বলেই মনে করেন সংবাদ-সাজানো আঁর মতামত গুছানোও বুঝি তাঁর এক্তিয়ার। কালধর্মে, অর্থাৎ 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার' নিজস্ব নিয়মে তাই 'যুগান্তরে'র সুদীর্ঘকালীন সম্পাদক সেই পথেই এক সন্ধ্যায় খারিজ হয়ে গেলেন যে পথে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরু স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'আনন্দ বাজার পত্রিকা' থেকে।

অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের পর্বের পরেও আর একটা পর্ব এখন সমাগত।

রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি যে দরিদ্র দেশে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সে দেশে সংবাদপত্রই হচ্ছে সাধারণের মুখ্য চালক। একদিকে তাই এদেশে শাসক-গোষ্ঠী এগিয়ে এসেছেন বার্তাজীবীদের প্রতি দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে—আইন করে তাঁরা সাংবাদিকদের দক্ষিণার সুব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আর স্বভাবতই তাই তাঁরা চান বেতন-ভোগী সাংবাদিকেরাও হবেন শাসনে তাঁদের সকৃতজ্ঞ অনুচর। কিন্তু দেশ চালায় কে? কুকুরে ল্যাজ নাড়ে, না, ল্যাজ নাড়ে কুকুরকে? এর উত্তর চীন-আক্রমণের মুখে বিড়লা-গোয়েঙ্কা-থেকে বাংলারীযারা সকলেই নিজ নিজ সংবাদপত্রের মারফৎ সেদিনও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অবহিত করে দিয়েছেন। বিবেকানন্দবাবুরও তা আরও একটু বেশি বোঝা উচিত ছিল। কারণ, ইতিপূর্বেই অন্যদিকে তো তিনি দেখেছিলেন—পত্রমালিকের বাম হস্ত শাসকের আইনকে ভোঁতা করে সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে দাক্ষিণ্যের এক্তিয়ার শাসকের নয়, মালিকেরই সম্পূর্ণরূপে, বেতনভোগী মাত্রই বেতন-দাস। দ্বিতীয়ত তাঁরই চোখের উপর দিয়ে তিনি দেখেছেন—সত্যেন্দ্রনাথের শূন্য আসনে যিনি আসীন হয়েছিলেন চপলা লক্ষ্মী তাঁকেও বিসর্জন না দিয়ে ছাড়লেন না। সরকার নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় দক্ষিণার হার লেখক-সম্পাদকদের পক্ষে কাল হয়েছে। মালিক-সম্পাদকের স্ব-রাজ্যাভিষেক তা নিয়ম করে তুলেছে। এককালে সম্পাদকদের লেখাপড়া জানতে হতো, লোকমত গঠন করতে হতো, মালিক-সম্পাদকদের জানতে হয় মালিক-রাজ্যের 'হারেম-পলিটিক্স্', ম্যানেজ করতে হয় মুনাফার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা। সংবাদপত্রের বর্তমানে এই পর্বই সমাগত।

পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বিনষ্ট না করে বিবেকানন্দবাবু 'বসুমতী'র সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেছেন এবার মালিক-গোষ্ঠীরও একজন হয়ে। তাতে মতামত পরিবর্জন বা পরিবর্তন আবশ্যিক নয়, অন্তত তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি সম্পাদকীয় নামের ও মতের অভিন্নতা রক্ষা করে হাতের নোয়া বাঁচিয়ে যেতে পারলে তিনিও সুখী হবেন, আমরাও হব। এবং হয়তো বাঙলা দেশের সংবাদপত্রের বিষ-চক্রের বাইরেও বাঙালী সংবাদপত্র পাঠকের শ্বাসগ্রহণের মতো একটু স্থান থাকবে। এই বিদায়-আশীর্বাদ দৃঢ়তার সঙ্গেই গ্রহণ করে বিবেকানন্দবাবু অগ্রসর হয়েছেন দেখে, আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি। অভিনন্দিত করুক বাঙলা সংবাদপত্রের পাঠকশ্রেণীরা, এই আমাদের কামনা।

কিন্তু সেই সঙ্গেই অবহিত না হয়ে উপায় নেই—সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মর্যাদার ঐতিহ্য এদেশে বিলীনপ্রায়। পূর্বসূরীদের নাম করে আশ্বাস লাভের কোনো কারণ নেই।

সংবাদপত্র পাঠে এখন প্রত্যেক পাঠকেরই অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি সন্দিগ্ধ এবং অনেক বেশি অশ্রদ্ধাপর না হয়ে উপায় নেই।

গোপাল হালদার

বর্ষ ৩২ । সংখ্যা ৮ ফাল্গুন, ১৩৬৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

(পুনরায়): গিন্নী বলেন ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিষ্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিষ্টি।
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা? কমিউনিষ্টি।
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি
নিয়ে এলো প্লেগ কমিউনিষ্টি।
গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বললো কমিউনিষ্টি।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলি খায় কমিউনিষ্টি।
যে দিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সে দিকেই দেখি কমিউনিষ্টি।
তাই বসে বসে করছি লিষ্টি
এ পাড়ায় কে কে কমিউনিষ্টি॥

সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনা যায় ইংরেজ ধনতন্ত্রের গোষ্ঠীপ্রধান উইনস্টন্ চার্চিল একদা নাকি পিকাসোর বিমূর্ত চিত্রকলা দর্শনে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পশ্চাতে পদাঘাতের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চভ মস্কোতে রুশ চিত্রকরদের বিমূর্ত শিল্প-প্রদর্শনী দেখে চিত্রগুলি গর্দভলাঙ্গুল দ্বারা অঙ্কিত বলে বিদ্রূপ করেছেন! যদি তিনি চিত্রগুলির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পথে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন হয়তো আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে ছবিগুলির একমাত্র ত্রুটি যে সেগুলি বিমূর্ত রীতিতে অঙ্কিত। বিমূর্ত শিল্পমাত্রেই রসনৈপুণ্যহীন বা সমাজতন্ত্র-বিরোধী—এ কথা স্বীকার করি না বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল চার্চিলের রক্ষণশীল অশালীনতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নেতার চিন্তাধারার সাদৃশ্যটা নেহাতই ক্রুশ্চভের শিল্পরস-জ্ঞানের অভাবজনিত ও ব্যক্তিগতরুচিপ্রসূত।

কিন্তু প্রাথমিক সন্দেহ ক্রমশই দুর্ভাবনায় পরিণত হলো যখন দেখলাম প্রদর্শিত চিত্রগুলির অঙ্কনরীতির বিরুদ্ধে সমালোচনাটা ব্যক্তিগত রুচির স্তর থেকে রাজনৈতিক বিধানের পর্যায়ে উঠে গেছে। শুনলাম মাত্র কয়েকদিন পরেই পূব বার্লিনের এক সভায় ক্রুশ্চভ বলছেন—কমিউনিস্ট পার্টি কখনই 'বুর্জোয়া' শিল্প ও 'সোস্যালিস্ট' শিল্পের সহাবস্থান মেনে নেবে না। ইতি-পূর্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতার মুখে এমন উক্তি শুনি নি। যদি বিমূর্ত শিল্পকে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ বলে নস্যাৎ করতে হয় তাহলে পিকাসোর সৃষ্টিকর্মকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করব? আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ রাগপ্রধান সঙ্গীত—যার কথামুক্ত শব্দ ও স্বরের শ্রুতিমধুর বিস্তারে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—তাকে কি 'বুর্জোয়া' শিল্প বলে অচ্ছুৎ করে রাখব?

প্রশ্নগুলি আরও স্পষ্টভাবে রাখা যেতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোকে যে চোখে দেখি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে কি তার সাংস্কৃতিক

সৃষ্টিকর্মকেও আক্রমণ করব? অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি কোনো শিল্পী মার্কস্‌বাদ থেকে স্বতন্ত্র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পসৃষ্টি করেন, তবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিচারের মানদণ্ড কী হবে? রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ না নন্দনতাত্ত্বিক বিচারবোধ? সবশেষে, রাজনীতির ক্ষেত্রে যে উপায়ে কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচী নির্ধারণ করে প্রায় সেই একই পদ্ধতিতে সংস্কৃতি-সৃষ্টির নীতি স্থির করা কতখানি সমর্থনযোগ্য? এ প্রশ্নগুলি নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা আছে। আপাতত সোভিয়েত সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের ইদানীংকালের পরিস্থিতির সম্যক মূল্যায়নটা প্রয়োজন। কারণ ক্রুশ্চভের মন্তব্যগুলি যে আকস্মিক নয়, তার প্রমাণ সম্প্রতি রুশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভায় সোভিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দীর্ঘ বক্তৃতা। শিল্পকলায় বাস্তবের সাদৃশ্যরচনা ও সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতিফলন—সাম্যবাদ গঠনের কাজে সোভিয়েত শিল্পী সাহিত্যিকদের এটাই একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে; এ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অ-সমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বিবেচিত হবে—এই মর্মে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

মনে পড়ে গেল, ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধের দুর্বিপাকে শিল্প-সাহিত্যের দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই, পালোয়ানদের হাতে নয়। আকবর বাদশাও গানের আসরে তানসেনকে মেনে চলেছেন, সেখানে তিনি যদি বাদশাহী করতেন তাহলে সে হতো সাংগীতিক ভূতের কীর্তন।···সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে নি—এখন পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব? (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি থেকে)

ক্রুশ্চভের মন্তব্য বা রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সভার সিদ্ধান্তকে সেদেশের ঘরোয়া ঘটনা বলে আমরাও হয়তো অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রানুরাগী মানুষমাত্রেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের শুরু থেকেই সেদেশের যুগান্তকারী পরীক্ষার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে সংবেদনশীল তাই বর্তমান ঘটনার বিষয়েও তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি কর্তব্যপালনের বিশেষ অঙ্গরূপে স্বীকৃত হবে বলে আশা করি।

তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই—পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের

এই একটানা অপপ্রচারের সঙ্গে আমরা কণ্ঠ মেলাতে রাজী নই এই কারণেই যে, এই অপবাদের সবচেয়ে বড়ো জবাব রুশ শিল্পীরাই দিয়েছেন বিমূর্ত চিত্র অঙ্কিত করে এবং তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আজ একথা স্বীকারের সৎসাহস থাকা প্রয়োজন যে কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের নাগরিকের যে শিল্প-সৃষ্টির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তরে নির্মিত পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে সৃষ্টির পথ বহু বাধা-বিঘ্নে কণ্টকিত। মনে রাখা দরকার, এক যুগে যে সব প্রতিবন্ধ ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে আরোপিত হয়েছিল, পরবর্তী যুগে সেই রীতির অহেতুক ও মারাত্মক অনুসরণের ভুক্তভোগী বর্তমান সোভিয়েত সংস্কৃতি জগত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার পুরাতন অনমনীয়তা অনেকটা শিথিল হলেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুকালের ঘনীভূত বরফ আজও সম্পূর্ণ গলেছে কিনা সন্দেহ।

সোভিয়েত সংস্কৃতির অতীত

রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত শিল্পীর সম্পর্কের সমস্যাটা খুব সুস্পষ্টরূপে উন্মীলিত করেছিলেন বিপ্লবের কিছু পরে বিখ্যাত রুশ কবি অ্যালেগ্‌জ্যাণ্ডার ব্লক্‌ যিনি স্বদেশে আজও মহৎ কবি রূপে সম্মানিত। বিপ্লব ও সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে কাব্য-রচনা করলেও, নূতন সমাজব্যবস্থায় কাব্যচর্চার যে অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে পীড়িত করে তুলছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁর একটি মন্তব্যে : "The Bolsheviks do not hinder the writing of verses but they hinder you from feeling yourself a master ; he is a master who feels the axis of his creativeness and holds the rhythm within himself."

শিল্প-সৃষ্টির মেরুদণ্ডকে এইভাবে রাষ্ট্রকরায়ত্ত করার মধ্যেই বর্তমান সোভিয়েত সংস্কৃতি-জগতের সমস্যাগুলি নিহিত রয়েছে। এর সঙ্গে মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের এই অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনায় সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের নূতন সংস্কৃতিগঠনের মহৎ উদ্দেশ্য প্রেরণারূপে কাজ করেছিল।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে অভূতপূর্ব সংস্কৃতিচর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হয় তাতে পরীক্ষামূলক চিত্ররচনা সর্বাগ্রগণ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের

প্রবক্তাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন এবং যাঁরা নবীন তাঁরা হয়তো জানেনই না যে, আধুনিক চিত্রকলা জগতের পূর্বসূরীরা নব্য আঙ্গিক সন্ধানের পথে সর্বাধিক উৎসাহ পেয়েছিলেন তৎকালীন রুশ বিপ্লবের আদর্শ থেকে। ধনতান্ত্রিক জগতের অতীতাশ্রয়ী নির্জীব বাস্তবানুকারী শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে তাঁরা নিজেদের চিত্ররচনার বিমূর্ত ধারাকে রাজনৈতিক বিপ্লবের সাংস্কৃতিক পার্শ্বচর বলে দাবি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রুশদেশীয়; যেমন, ম্যালেভিচ্ বা শাগল। স্বভাবতই এঁরা বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকেই নূতন শিল্প-চর্চার অনুকূল পরিবেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম কয়েক বৎসর তাই সংস্কৃতি জগতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ দেখা দিয়েছিল। পরিমিতির অভাব যে ঘটেনি তা নয়। অতি-উৎসাহের ঝোঁকে 'বামপন্থী শিল্প' নামাঙ্কিত শুধু টেকনোলজি-নির্ভরশীল একজাতীয় চিত্ররচনা ও স্থাপত্যশিল্পের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। চিত্রাঙ্কণের প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকারও করা হয়েছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির এই প্রারম্ভিক যুগে যেটা সবচেয়ে বেশি উৎসাহোদ্দীপক ছিল সেটা রাষ্ট্রনেতা ও শিল্পী-সাহিত্যিক উভয়েরই সরল চিন্তার দুঃসাহস, নানা ভাঙা-গড়ার ভেতর থেকে নূতন জগত তৈরি হবে—এই স্থির বিশ্বাস। তাই মায়াকভ্স্কির প্রথম যুগের 'ফিউচারিস্ট' কবিতার সুখ্যাতি করতে না পেরেও লেনিন তাঁর পরীক্ষামূলক চরিত্র সম্বন্ধে সহিষ্ণুভাব অবলম্বন করেছিলেন। আর আজ একথাও স্বীকার করতে হবে যে কনস্ট্রাকৃটিভিজ্‌ম্, ফিউচারিজ্‌ম্, সিম্বলিজ্‌ম্—ইত্যাদি নানা প্রবণতার উত্থান-পতনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার ব্লক্, মায়াকভ্স্কি, এসেনিন্ ও পাস্তেরনাকের মতো বলিষ্ঠ কবি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ শিল্প-সাহিত্য যাদের উপভোগের জন্য সৃষ্টি হচ্ছিল তারাই তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রাথমিক শিক্ষারই যেখানে অভাব, সেখানে নতুন আঙ্গিকে অঙ্কিত চিত্রাবলী বা প্রচলিত রীতি বহির্ভূত ভাষায় রচিত কাব্য কতজনের বোধগম্য হবে? ১৯২০ সালে ক্লারা জেটকিনকে এ প্রসঙ্গে লেনিন যা বলেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য—"Are we to give cake and sugar to a minority when the mass of workers and peasants still lack black-bread?...For art to get closer to the people and the people to art we must start by raising general educational and

cultural standards." তাই দেশগঠনের ব্যাপক পরিকল্পনারই এক বিশেষ অঙ্গরূপে জনশিক্ষার উপর সমগ্র প্রবণতা গিয়ে পড়ল। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কেও লেনিনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"প্রত্যেক শিল্পীর, এবং যারা নিজেদের শিল্পী বলে মনে করে, প্রত্যেকেরই, স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করার অধিকার আছে, সর্বস্ব পণ করে নিজের আদর্শ অনুসরণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কমিউনিস্ট এবং নীরবে দাঁড়িয়ে অরাজকতার অপ্রতিহত বিস্তার হতে দিতে পারি না। নির্ধারিত পরিকল্পনা-অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে হবে এবং এর ফলগুলিকে সুনিরূপিত করে তুলব।" (ক্লারা জেট্‌কিনের স্মৃতিকথা)

ভবিষ্যৎ নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনের জন্য সোবিয়েত রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা বিস্তার ও শিল্প-সাহিত্যের যুগপৎ অভিভাবকত্ব গ্রহণের ফল কিন্তু অবিমিশ্র আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল না।

একদিকে যেমন শুরু থেকেই সংস্কৃতিমুখীন জনশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত সরকার রুশ জনসাধারণের কাছে বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যকে ব্যাপক ও অনায়াসলভ্য করে তোলার অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছে, অন্যদিকে বিপ্লবের পরে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ সোভিয়েত সৃষ্টিশীল শিল্পের সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি হবার সুযোগ দেখা দিয়েছিল, তা অচিরেই বিনষ্ট হলো। শাগল, ক্যান্‌ডিন্‌স্কী এবং অনেকেই দেশত্যাগী হলেন। তাঁদের সৃজনশীল শিল্পকর্মের পরিবর্তে এক জাতীয় প্রচারধর্মী চিত্রকলা ও শস্তা বোধগম্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য জনশিক্ষার পরিকল্পনার অঙ্গরূপে গৃহীত হলো। রুশ জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রাথমিক বোধবিস্তারের প্রয়োজনে এই 'প্রোলেটারিয়েট সংস্কৃতির' একটা সাময়িক মূল্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটাই একমাত্র নির্ভেজাল সোভিয়েত সংস্কৃতিরূপে রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে একটা স্থায়ী আসন পেয়ে গেল। ফলে একটা অভূতপূর্ব বৈপরীত্য লক্ষ্য করছি। দেশব্যাপী শিক্ষিত জনসাধারণ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প দেখে, ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে বা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনে রসগ্রহণে অভ্যস্ত। এইভাবে তাদের যে সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়েছে, আশা করা গিয়েছিল তাতে সঞ্জীবিত শিল্পীমানসের সৃষ্টিকর্মে নিত্যনতুন চিন্তার চমক থাকবে, তার সাহিত্য পাঠকের ভাবনাজগতে তর্ক-বিতর্কের ঢেউ তুলবে।

অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের ইতিহাসে সেই পুরাতন প্রোলেটারিয়েট কালচারের ধারা অনুসরণ করে শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রাচীরপত্রের আদর্শে বাস্তবজগতের নির্জীব সাদৃশ্যরচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর কর্মোদ্যমকে বাঙালী বৈষ্ণবী সংকীর্তনের কায়দায় অপরিমিত ভাবপ্রবণতা সহকারে সুখ্যাতির রেওয়াজটাই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ বলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে মরূদ্যানের মতো মাঝে মাঝে দু-একটি সৃষ্টিকর্ম বহির্জগতকে সচকিত করেছে। কিন্তু অধিকাংশের অনুসৃত বাঁধা সড়ক থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বল্প সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থায় অবিচল থেকেও স্বতন্ত্র পথে যখনই এগোতে চেয়েছেন, তখনই অভিভাবকের ভ্রূকুঞ্চন তাঁদের নিবৃত্ত করেছে। অনুমোদিত রাস্তার বাইরে অবৈধ পদক্ষেপের স্বল্পকালীন অবকাশ ও তৎপরবর্তী আত্ম-সমালোচনার গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ—এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

স্তালিন যুগ ও বর্ত্তমান:

এ অবস্থার জন্য সমস্ত দোষ স্তালিনের উপর আরোপের যে প্রবণতা ক্রমশই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা একজাতীয় একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ, এ ধরনের সমালোচনায় উপেক্ষা করা হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর একটি মৌলিক উপাদানকে—অর্থাৎ, সংস্কৃতির বিকাশ, পরিচালনা ও তার রূপ নির্ধারণ করার নীতি। স্তালিনের আমলের শেষ পর্যায়ে যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পার্টি নীতি নির্মমভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাকে অনুরূপ পদ্ধতিতে আরোপিত করা হয়েছে। বর্তমানে সে রক্তাক্ত প্রয়োগরীতির অবসান ঘটলেও, মৌলিক নীতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

স্তালিনোত্তর যুগে যে 'বরফ গলার' কথা প্রায়শই শোনা যায়, তার নজির অতীতেও রয়েছে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের নিরবচ্ছিন্ন হিমপ্রবাহে আশীর্বাদস্বরূপ ভাঁটা পূর্বেও দু-একবার পড়েছে। বিশেষ করে ১৯৩২ সালে, 'প্রোলেটারিয়েট কালচারের' দাবি করে 'রুশ শ্রমজীবী লেখক সংস্থা' (RAPP) যখন সোভিয়েত সাহিত্যকে এক বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল, তখন তাকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টায় স্তালিন সংস্কৃতিক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন ঐ কুখ্যাত সংস্থাটিকে ভেঙে দিয়ে। এই কারণেই সে সময় লুই

ফিশর স্তালিনের সিদ্ধান্তকে "A Revolution in Revolutionary History" বলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আজকের সাম্যবাদী মহলে স্তালিন-বিরোধী শুচিবায়ুগ্রস্ত আবহাওয়ায় একথাও স্মরণযোগ্য যে, RAPP-এর প্ররোচনায় মায়াকভ্স্কির আত্মহত্যার পর তাঁর বিতর্কমূলক সাহিত্যকর্মকে যখন "অসমাজতান্ত্রিক" আখ্যা দিয়ে একঘরে করে রাখার কথা অনেকে চিন্তা করছিলেন, তখন একমাত্র স্তালিন-ই তাঁর সমর্থনে এসে বলেন "Mayakovsky was and is the most talented poet of our Socialist epoch and indifference to his memory is a crime."

অবশ্য স্তালিন-যুগের শেষাঙ্কের নিপীড়নের কালিমালিপ্ত ইতিহাস অতীতের এই উদারনীতির পরিচ্ছেদকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ১৯৩৪ সালের পর চতুর্দিকের শত্রু-পরিবেষ্টিত রাশিয়ায় অন্তর্বিরোধের আবহাওয়ায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বন্ধু সমালোচক বা সমাজতন্ত্র-সমর্থক হয়েও সরকারী রীতি থেকে স্বতন্ত্র প্রবক্তা হলেই তাকে সাম্রাজ্যবাদীর চর সন্দেহে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, ঠিক তেমনই শিল্পের ক্ষেত্রে বাঁধা রাস্তা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও আর সহিষ্ণুতার চোখে দেখা হলো না। চিত্রকলায় বাস্তবানুকারী ব্যতীত অন্য সমস্ত রীতিই 'বুর্জোয়া ডেকাডেন্ট্ ফর্ম্যালিজ্ম'-এর আওতায় ফেলা হলো এবং সাহিত্যে সমাজব্যবস্থার ক্ষীণতম সমালোচনা হলেই চিৎকার উঠল— "প্রতি-বিপ্লবী ভাবধারা।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় যে আতঙ্কপ্রসূত অসহিষ্ণুতা কিছুটা বোধগম্য, পরবর্তী স্বচ্ছন্দ আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় সেটা অমার্জনীয় হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবধারা চরম উগ্র পরিণতি পেল ১৯৪৬ সালে যখন ঝানভ্ একে একটা মার্কসীয় তত্ত্বরূপে দাঁড় করালেন। আরও হাস্যকর হলো যখন এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে ফরাসী কমিউনিস্টরা সাত্র্ প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের সৃষ্টিকর্মকে কবরস্থ করলেন এবং কিছু পরে এর ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমালোচনায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নস্যাৎ হলেন।

অবশ্য এর প্রায়শ্চিত্ত যথোপযুক্তভাবেই হয়েছে। তাই এই লজ্জাজনক অতীতকে আবার স্মরণ করে আত্মলাঞ্ছিত হবার বাসনা ছিল না, যদি বর্তমানেও সোভিয়েত সংস্কৃতিতে তার ছায়া পুনরায় না দেখতাম।

আশা করেছিলাম বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের পর বহুল প্রচারিত 'বরফ গলার' আবহাওয়ায় রাশিয়ায় সংস্কৃতি-সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

ব্যতীত নির্ভাবনায় শিল্পীর স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। লেনিনের নীতিতে প্রত্যাগমনের কথা বহুবার ঘোষণার ফলে মনে হয়েছিল, বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী রাশিয়ার সংস্কৃতিক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতার যে সহাবস্থান প্রচলিত ছিল, তার সম্ভাবনা হয়তো পুনরুজ্জীবিত হবে। অন্তত রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেনিনের সহনশীলতা ফিরে আসবে বলে আশা করেছিলাম।

কিন্তু বিমূঢ় হলাম যখন দেখলাম বোরিস পাস্তেরনাকের নূতন উপন্যাস নিয়ে সেদেশে একজাতীয় শত্রুভাবোন্মত্ততা সৃষ্টি করা হলো। গুরুতেই বলে দরকার যে, 'ডক্টর ঝিভাগো' পড়ে—বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক—কোনো দিক থেকেই আমার খুব মহৎ উপন্যাস বলে মনে হয় নি। বিদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এবং তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের দেশেরও কিছু 'সংস্কৃতির স্বাধীনতা'র ভেকধারী যখন এই বিশেষ উপন্যাসটির ভিত্তিতে পাস্তেরনাককে টমাস মান বা তলস্তয়ের সমগোত্রীয় বলে দাবি করেছিলেন, তখন তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ধর্মান্ধতায় বেশ কৌতুকবোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল হয় তাঁরা 'ডক্টর ঝিভাগো' পাঠ করেন নি কিংবা মান-তলস্তয়ের উপন্যাসের রস-গ্রহণে অপারগ।

যদিও বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাস্তেরনাকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্বে সেদেশে 'ডক্টর ঝিভাগো'র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল স্বতন্ত্র ভাবধারা সম্বন্ধে সেই অতীতের আতঙ্কের জের এখনও কাটে নি। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে তৎকালীন জেহাদ ঘোষণার উত্তেজনার মধ্যে সোভিয়েত সমালোচকেরা যেভাবে তাঁর কবিকৃতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন, সেই ক্ষীণ দৃষ্টিপ্রসূত একদেশদর্শিতাই সোভিয়েতের—কি রাজনৈতিক কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—সমস্ত অন্তর্বিরোধের মূলসূত্র।

ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি উল্লিখিত বিমূর্ত চিত্রপ্রদর্শনীর ঘটনাটি কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে। এ-জাতীয় ঘটনা ধনতান্ত্রিক সমাজের সুশিক্ষাবিহীন আমলা-তান্ত্রিক আবহাওয়াতেই শোভা পায়। কিন্তু ব্যথিত হই, বিশ্বমানবের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে মার্কসীয় দর্শনের জন্ম তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ যখন শিল্পীর স্বাধীনতায় ঠিক একইভাবে হস্তক্ষেপ করেন।

মার্কসবাদ ও সংস্কৃতিতে পার্টি-নেতৃত্ব

সুতরাং আজকে বিচার করার দিন এসেছে শিল্প-সাহিত্যে কমিউনিস্ট পার্টির বা সোভিয়েত রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কতখানি সঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, "সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে, কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে।" (অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯৩৯ সালে লেখা চিঠি)।

বস্তুত, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে সমাজের ও শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিক কিভাবে মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করবেন এবং করতে কতটা বাধ্য— এ প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর। মার্কসবাদ একটা জীবন-দর্শন। আদর্শরূপে কেউ যদি তা গ্রহণ করেন তবে সেটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রূপায়িত করবে এবং তাঁর শিল্পকর্মেও তার পরোক্ষ প্রকাশ ঘটবে। ছক বেঁধে তাকে সৃষ্টিকর্মে প্রয়োগের প্রচেষ্টা হাস্যকর। কারণ, শিল্প-সৃষ্টি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমগোত্রীয় নয়। মানুষের কল্পনা জ্যামিতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে না।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট ও দ্বিধাশূন্য এবং সেই কারণেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর উল্লিখিত পত্রের আরেকটি অংশে লিখেছিলেন : "রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো বাহ্য মতকে মানতে বাধ্য নয়।···কবির কল্পনা এবং কবির মত একজোট হবার দরকার নেই। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজমের ছোঁয়া কারো কবিতায় যদি লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভ পায়? কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে তবে সায়েন্সের জয়জয়কার করব। কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হলেই হল।"

সাহিত্য সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের উদারনৈতিক সার্বজনীন রুচি এই সত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে। শেক্সপীয়র, স্কট, হাইনের মতো ভিন্ন যুগের ভিন্ন মতাবলম্বী সাহিত্যিকের রচনার সার সংগ্রহে তাই তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না।

আর সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বক্তব্য পাওয়া যায়, তাতে দেখতে পাই বর্তমান সোভিয়েতের সংস্কৃতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তদানীন্তন ধনতান্ত্রিক জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে ঠিক তার অনুরূপ ঘটনার বিরুদ্ধে মার্কস্ প্রতিবাদমুখর। প্রেশ সংবাদপত্র বিবাচনের অনমনীয় নিয়মাবলী প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি কথা চিরস্মরণীয় :

"The law allows me to write, but on the condition that I write in a style other than my own. I have the right to show the face of my spirit, but I must first set it in the prescribed expression ! What man of honour would not blush at such presumption and prefer to hide his head under his toga ?······ You do not demand that a rose should have the same scent as a violet but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form ?' ('On Style': শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কস্-এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনার সংকলন থেকে)

উক্ত সংকলনেই সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"The writer must naturally make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living··· The writer in no way regards his works as a means, they are ends in themselves ; so little are they a means for him and others that, when necessary, he sacrifices his existence to theirs." ('The Writer's Profession')।

এই জাতীয় কয়েকটি মন্তব্য ছাড়া, শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কস বা এঙ্গেলস কোনো তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই। সংস্কৃতির বিকাশের নিজস্ব ধারা আছে। ফতোয়া জারী করে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা চলে না। শ্রেণী সংগ্রামপ্রসূত রাজনীতির দুই শিবিরকে শিল্প-সাহিত্যে আমদানী করতে গিয়ে নকল বুঁদির গড়ের লড়াই ছাড়া আর কিছুই হয় নি।

যে বিমূর্ত চিত্রের প্রদর্শনী দেখে ক্রুশ্চভ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, সেগুলি আমরা এখানে কেউ-ই দেখি নি। তাই তার গুণাগুণ বিচার করা সম্ভব নয়।

স্বীকার করি, হয়তো এর মধ্যে অনেকগুলিই অপরিণত ও অনুপযুক্ততার দোষে অপরাধী। পশ্চিম ইউরোপে বিমূর্ত শিল্পের নামে 'অ্যাকশন পেন্টিং'-এর যে রীতি প্রচলিত হয়েছে, সেই হাস্যকর ধারার অনুকরণও হয়তো থাকতে পারে। এবং সেগুলি কোনো দর্শকের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে হতে পারে।

কিন্তু ছবির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য যাচাই করার চূড়ান্ত ভার নিক দর্শক সাধারণ—বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শক-সাধারণ, যাদের সৌন্দর্য-বোধ ও দেখবার চোখ তৈরি হয়েছে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সেরা চিত্রসামগ্রী দেখে। এই বোধই তাদের চিত্রের মানবিচারে সাহায্য করবে বলে আশা করি—কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত নয়, বা মার্কসবাদী তত্ত্বও নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হওয়া এই ব্যক্তিগত বোধ-শক্তি ছবির বিচারের মানদণ্ড না হয়ে যদি জাত তুলে মার্কসবাদকে তার নির্ধারক করতে হয়, তাহলেই সন্দেহ জাগে যে—সোভিয়েত রাষ্ট্র তার সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত জনসাধারণ সম্বন্ধে আজও দ্বিধাগ্রস্ত।

বিমূর্ত ও বাস্তবানুকারী শিল্প

আলোড়নটা যখন বিমূর্ত চিত্ররচনা সম্বন্ধে উঠেছে তখন বিশেষ করে এই বিমূর্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। মনে হয় রুশ মার্কসবাদী চিত্র-সমালোচনার সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা—বিমূর্তিকরণকে চিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং বিমূর্ত শিল্পকে তার ক্রমবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে দেখার অক্ষমতা।

যেহেতু আকৃতিগত সাদৃশ্য শিল্পের বিষয় নয়—বরং শিল্পীর ভাবাভাসে রূপায়িত বাস্তব জগৎ বা রঙ ও রেখার ছান্দসিক সমাবেশে ভাবাভিব্যক্তি; তাই এক জাতীয় বিমূর্তিকরণ বা 'নন-রিপ্রেজেণ্টশন', বাস্তবের বিকৃতি বা অত্যুক্তিরূপে শিল্পের ইতিহাসের গোড়া থেকেই সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্যে মনুষ্যদেহের বলিষ্ঠ বিকৃতিতেও কি বিমূর্তিকরণ পাই না? আসলে বিশেষ কোনো বস্তুকে অবলম্বন করে নেই, এমন যে সব রঙ ও রেখা—তাদের সমন্বয়ের যে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন—তার সবচেয়ে বড়ো উৎস আমাদের প্রাকৃতিক জগৎ। আকাশে মেঘের ক্ষণস্থায়ী সমাবেশ বা সমুদ্রসৈকতে ঢেউয়ের অপরিকল্পিত নক্‌সা রচনা আমাদের চোখে ভালো লাগে কেন?

মানুষের আদিম সৌন্দর্যবোধের কাছে রঙ ও রেখার একটা প্রত্যক্ষ আবেদন রয়েছে বলেই। শিল্পীর হাতে পড়ে তা বিভিন্ন রূপ নেয় এবং স্বভাবতই তা রচয়িতার চিন্তা-ভাবাবেগের প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির খামখেয়ালে রচিত আলপনার অর্থহীনতার সঙ্গে মানুষের অঙ্কিত বিমূর্ত চিত্রের অর্থব্যঞ্জনার পার্থক্য এইখানেই।

মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম সাদৃশ্যরচনা বা কাহিনীবর্ণনা নাও হতে পারে। বিশেষ রঙের সন্নিবেশ, রেখার বিশেষ কোনো ছন্দ দর্শকের মনে বিভিন্ন সাড়া জাগায়। ছবিতে বিষয়বস্তুর চেয়েও বড়ো আসলে শিল্পীর বক্তব্য; নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনানুসারে কেটে-ছেঁটে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। সুতরাং অঙ্কনপদ্ধতির উপর অনেকখানি নির্ভর করছে এবং এ অঙ্কনপদ্ধতির মূল উপাদান রঙ ও রেখা। যে গাছপালা ইম্‌প্রেশনিস্ট, চিত্রে ছায়াশীতল শান্ত মাধুর্যের প্রতিরূপ, সেই গাছপালাই একটা উত্তপ্ত উন্মাদনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্যান্‌গগের ছবিতে। তাই ছবির এই মৌলিক উপাদানগুলিকে বাস্তব থেকে অবচ্ছিন্ন করে বস্তু-নিরপেক্ষরূপে উপস্থাপিত করেও ভাব প্রকাশের দুঃসাহসিকতা সমর্থনযোগ্য।

গত শতাব্দীর শেষে বাস্তব বর্ণনার অঙ্কনপদ্ধতির নিঃসাড়তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে বিমূর্তিকরণকে আত্মপ্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে উপস্থিত করা হয়েছিল। সেজান্ বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত গঠনরীতিকে ত্রিমাত্রিক চিত্ররচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন এবং তার ধারা বেয়ে কিউবিজমের সূত্রপাত। অন্যদিকে ফোভিস্টদের ও জার্মান অভিব্যক্তিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্পষ্ট রঙ ও রেখার সাবলীল সমাবেশে যার সূচনা হয়েছিল তার পরিণতি হলো ক্যান্‌ডিনস্কীর পরিপূর্ণ অবচ্ছিন্ন, বস্তু-নিরপেক্ষ চিত্ররচনায়।

এ ইতিহাসটা মনে রাখলে দেখা যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে প্রচলিত বাস্তবানুকারী অঙ্কনপদ্ধতি বা কাহিনী বর্ণনার রীতিকে যেমন সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে দাবি করা যায় না, ঠিক তেমনই বিমূর্ত শিল্পকে বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়ের অভিব্যক্তি বলে আক্রমণ করা চলে না। বাস্তবের সাদৃশ্য রচনার চল বহুকালাবধি ইউরোপের সর্বত্রই সবজনস্বীকৃত ছিল এবং তার স্রষ্টিকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক উভয়েই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। আবার বিমূর্ত অঙ্কনপদ্ধতির আওতায় সৃষ্ট পিকাসোর ছবি কি সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ নয়? কী বাস্তবানুকারী চিত্র, কী বিমূর্ত চিত্র—তার গুণাগুণ

নির্ভর করছে ভাবপ্রকাশের যোগ্যতার উপর, রচয়িতার মুন্‌শিয়ানার উপর। এ যোগ্যতা অবশ্যই অনুশীলনসাপেক্ষ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির যে বিরাট পরীক্ষা চলছে, সমগ্র জাতির যে দুঃসাহসিক অভিযান, তা নিয়ে রুশ চিত্রশিল্পীরা গত চল্লিশ বৎসরের উপর বহু ছবি এঁকেছেন। যৌথ খামারে কৃষকের ধানকাটার উৎসাহ, কারখানায় শ্রমিকের উৎপাদনবৃদ্ধির স্থির সংকল্প, ইত্যাদিকে নিখুঁত-ভাবে বর্ণনার মাধ্যমে এই যুগচেতনাকে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সোভিয়েত জাতির কর্মপ্রচেষ্টাকে এর চেয়েও সার্থকভাবে অভিব্যক্ত করতে পেরেছে একটি ছবি। মস্কোতে বসে রবীন্দ্রনাথ ছবিটি এঁকেছিলেন। বহুল-প্রকাশের ফলে আশা করি অনেকের কাছেই সেটি সুপরিচিত। সাধারণ কালিতে আঁকা—রাত্রির অন্ধকার থেকে সদ্য-উত্থিত একটি মানুষের আলোর দিকে যাত্রার চিত্র। অ্যানাটমির নিয়মাবলী ছবিটিতে বেপরোয়াভাবে অস্বীকৃত হয়েছে, রঙের অনেকটাই অস্পষ্ট। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিরাট জাতির মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার এবং শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে যাবার সংকল্পের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটা এমন অবিস্মরণীয় ভাবে আর কোথাও অঙ্কিত হতে দেখি নি।

সাম্যবাদ ও সংস্কৃতি

"Humanity's leap from the realm of necessity into the realm of freedom"—এই বলে এঙ্গেলস সাম্যবাদের বর্ণনা করেছিলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সাম্যবাদ গড়বার বিশ বৎসরের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শ্রমবিভাগকরণ, কায়িক ও মানসিক শ্রমের ভেদ ইত্যাদি লোপ করে অর্থ-নৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই গতির সঙ্গে অসঙ্গত আজকের শিল্প-সাহিত্যের উপর রাষ্ট্রের সেই অতীতের জের টানা অভিভাবকত্ব। গত চল্লিশ বৎসর ধরে রুশ জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় সুশিক্ষিত হয়েছে বলেই আশা করি। শৈশবের অস্থিরতা কাটিয়ে কি তারা যৌবনের সুনিশ্চিত দায়িত্বজ্ঞানশীলতার স্তরে এসে পৌঁছয় নি? এখনও যদি তাদের সংস্কৃতির যাত্রাপথে শিল্পকর্মের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে লাল ও সবুজবাতির সংকেত দিতে হয়, তাহলে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে এ রীতি সেদেশের জনসাধারণের পরিণত চিন্তাশক্তির সবচেয়ে বড় অপমান।

পেলব আততায়ী ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তৃণ, আমায় অমন করে অবজ্ঞা কোরো না
(তুমি নিজেই একদা খুব অবজ্ঞাত ছিলে !)
কালকে যখন সারাটা রাত ঘরের বাইরে আমি
পথ হারিয়ে ঘুরেছিলাম তখন তোমার হাতে
নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছিলাম আরো ;
আপাত ঐ নরম দাঁতে আমার প্রেমিক দেহ
টুকরো টুকরো করে তুমি রোমশ ক্ষিপ্র হাতে
সভ্যতা খুইয়ে মাঠে নগ্ন ফিরেছিলে
রক্তের স্বাদ উদ্‌যাপনে, এমন ভীষণ ক্ষণে
ক্ষৌম সরলতায় গাঁয়ের অগম্-ওপার থেকে

কারুকাযের পিতল ঘটি বোকার মতো বয়ে
ফিরতেছিল দুলালী এক, শিকার করতে গিয়ে
নিজেই শিকার হয়েছে সে···আমায় দয়া করে
বলে উঠল, 'আমি তোমার বহিন্, ঘন রাতে
প্রতিপদের চন্দ্রকলার নম্র অসঙ্কোচে
আমি তোমার দেহের কাছে বহিন্ হতে পারি ।'

তৃণ. তুমি সেই নারীকেও অবজ্ঞা করেছো,
অথবা সন্দেহ । তুমি নিজে নারীর মতো
সেবা করবে ভেবেছিলাম, কিন্তু নারীর মতো
তুমি আমার অর্জিত সেই পথের ভগিনীকে
টুকরো-টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পুরুষদের হাতে
এক-এক টুকরো দিলে যখন, তখন থেকে আমি
নারীর বুকের দুটি সত্তা বুঝতে পেরে গেছি ॥

কোথাও কখনও একা নই ॥ শিবশম্ভু পাল

নক্ষত্রপ্রতিম যদি, এখানে এসো না।
এখানে আমরা হাসছি লক্ষবার প্রতারিত হয়ে
কোথায় লুকোয় তারা ব্যর্থকাম প্রতারক—সম্ভবত ক্ষণ-বিস্মরণে।
এখানে আমরা সব উৎসবের দুর্দান্ত মেজাজে।

স্বাতন্ত্র্য নতুন কথা নয় ; লিপি যথা মুখ যথা
মানুষের বাড়ি যথা, স্বাতন্ত্র্য তেমনি অনুপম
এবং এমন অর্থে আমরাও বন্ধুহীন নক্ষত্রপ্রতিম !
তবুও প্রত্যেকে বাঁধা উৎসবের চেতনায়, আর
উৎসব কখনো মরে না।

উৎসব মেলার মধ্যে, পূজায় সভায় ঘরে এবং বাহিরে
উৎসব রক্তের মধ্যে হৃদয়ের আদানে প্রদানে
বাৎসল্যে উদ্বেগে আর প্রবাসী বন্ধুর লেফাফায়
উৎসব নতুন লেখা কবিতার সজীব অক্ষরে···।

বরং মর গে যাও, বৃন্তচ্যুত, অন্ধকারে আনাচে কানাচে
যেখানে মশার জন্ম, মাছিদের লীলাক্ষেত্র, যাও,
ভাঁটিখানাবিতাড়িত স্বাতন্ত্র্যবিলাসী, ড্রেনে, অথবা, ফুটপাথে
অথবা পাঁজরা চেপে রক্তের বমনে যাও নরকে তোমার।

এখানে আমরা কেউ কোথাও কখনো একা নই ॥

জয়জয়ন্তীর সূর্য ॥ চিন্ময় গুহঠাকুরতা

(এক : সঙ্কল্প)

প্রত্যেকেই শাস্ত্রবাহী, রণাঙ্গনে কৃষিক্ষেত্রে ঘরে
প্রস্তুত অযুত বক্ষে শেষ রক্তবিন্দু অবিচল
অটুট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধে, দ্বিতীয়বাহিনী ,
প্রস্তরের ভিত টলে ; স্নায়ু স্থৈর্যে নেমে আসে ঢল ।

আমরা প্রত্যেকে দক্ষ শ্রমজীবী ; বক্ষে জ্বলে সহস্র ফার্নেসে
উৎপাদক সৃষ্টিবহ্নি ; অস্ত্রসজ্জা কাস্তে বা তূর্পুন
হাতে হাতে শস্য ওঠে, শিল্প গড়ে ওঠে এই দেশে
অত্যন্ত সৃজনশীল জলবায়ু, বিদ্যুৎ বাহিনী ।

(দুই · চেতনা)

যুদ্ধ আমরা কাকে বলি ? দুই পক্ষে হতাহত সহস্র সৈনিক
আর্তনাদে ফেটে যায় চতুর্দিক, যেমন দুর্বল বুকে যক্ষ্মার বীজাণু
পরস্পর যুদ্ধ করে রক্ত আর শ্বেত কণিকারা
অস্থির সংগ্রাম শেষে মৃত্যুর গোপন ক্লান্তি নেমে আসে ঠিক ।

(তিন : আকাঙ্ক্ষা)

এই যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন। পৃথিবীর সব যুদ্ধ সেইদিন
শান্ত হয়ে যাবে
আজকের রক্তপায়ী বীরবৃন্দ অন্যতর স্থায়ী প্রতিযোগিতার
অতি স্বাস্থ্যকর যুদ্ধে মেতে উঠবে ; দৃঢ়সন্নিবদ্ধ মাংসপেশী
সৃজনে অভ্যস্ত হবে ; সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে সৃষ্টি হবে শক্তির জোয়ার।

যেখানে দেয়াল ছিল চতুর্দিকে হিংস্র এক প্রচণ্ড পাহারা
আলোকরশ্মির স্রোতে ভেসে যাবে অকস্মাৎ, মহামৃত্যুঞ্জয়
সপ্তাশ্ববাহিত রথ শব্দ করে থেমে যাবে সমতল প্রশস্ত অঙ্গনে
সংবাদপত্রের ভাষ্য হয়ে উঠবে তীব্র উচ্চস্বর :

জানি, স্থির সূর্য উঠবে সেইদিন ; বরাভয়ে দীপ্ত জ্যোতির্ময় ॥

শিকারের গল্প ॥ মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পাঁচ বার ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে ঠিক পাচ বার
গিলে ফেললো বিস্কুটের টোপ
যথোচিত পরাক্রমে অর্থহীন লম্ফঝম্প তার
টোপের ভিতরে ছিলো বঁড়শির প্রকোপ।

পুকুরের সবচেয়ে নামজাদা প্রবীণ রোহিত
মৎস্যের মোড়ল, তার পরিপক্ক রঙের বাহার
সূর্যাস্তে ঘোষিত। কিন্তু দুর্বিপাক ওৎ পেতে ছিলো—
কশ বেয়ে দামী রক্ত সকাতরে মিশে গেলো জলে।

মহিলা কাৎলার সঙ্গে ভর দুপুরে খানিক মস্করা
জমেছিলো। মজে যেতে পারতো তার প্রৌঢ় শরীর
মৎসীর শরীর পেলে। দুষমন পেছনে লেগেছিলো,
নতুবা কেন সে এলো সুগন্ধি-ভরপুর সন্ধ্যেবেলা
শয়তানের পাতা চারে, নয়নের পাতা ফাঁদে তার
ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেলো। কেন
মজবুত জলের স্রোত লাল হয়, ঝাপসা চোখে তার
প্রতিবেশিনীর দেহ ততোধিক ঝাপসা মনে হয়।

ক্রমশ বমির মতো উপদ্রব বুকের ভিতরে,
কে যেন যে কোনো দিকে টেনে নিচ্ছে সমস্ত মগজ,
কেবা এক জলে ফেলে তুলে নেয় জলের সংসার,
কানের দু-পাশ দিয়ে ঘুরন্ত জলের স্রোত, রক্তধারা বয়—
ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুরপাক···
ভেসে উঠলো সনির্বন্ধ জলের উপরে।

গত রাত্রে ধরণীর নগরে নগরে
মুড়িঘণ্ট ঘটেছিলো মানুষের ঘরে।

বন্ধুগণ, ভদ্রলোককে বলতে দিন ॥ গোবিন্দ গোস্বামী

নিষিদ্ধ ফলের লোভে স্বর্গচ্যুত হয়ে গেছি ঠিক—
আরে দূর, সব ফাঁকি ! বলে সেই শান্ত ভদ্রলোক—
অশ্রাব্য ভাষায় কিছু বলেছেন নির্বিঘ্নে যাহোক ;
কোন্ নারী সতী-সাধ্বী ? অলঙ্কার নিছক আধিক !

বিনয়ী দেখেছি ঢের ; রুচিশীল আমরা সবাই ।
আহা, গোবেচারা সুধী চিরকাল তথাগতপ্রাণ
পুরু কাচ ঘষে নিয়ে বক্রচোখে যেদিকে তাকান
বিশুদ্ধ সে পদাবলী—দেখা শেখা জীবনে, মশাই ।

চিহ্নিত ইষ্টের নাম, ভক্ত যার ঔদার্যে প্রাচীন,
অথচ নির্বাক গুরু আত্মহত্যা দেখেছেন স্ত্রীর ;
লোকনিন্দা ! কোন্ যুগে ভদ্রকেরা চরিতে সুস্থির ?
ঈর্ষার নির্লজ্জ ক্ষোভে নীতিশাস্ত্র বিবেকবিহীন ।

উন্মার্গগামীর ঠোঁট ভণ্ডামির নব সংকীর্তনে
মোহান্তের ধরা-চূড়া ফোঁটা কেটে নামাবলী গায়
সুললিত ধুয়ো টানে : ত্যাগ করো উন্মুক্ত দ্বিধায় ।
পুরনারী বিমোহিত, ভক্তজন মূর্ছিত চরণে ॥

একটি প্রার্থনা ॥ যতীন্দ্রনাথ পাল

তবে চলে যেতে দাও দিগন্তরেখার ওধারে—
রোদ্দুরগুলোকে।
চলে যেতে দাও।
মাঠের ওপর থেকে রোদ্দুরগুলো চলে যাক,
তাড়াতাড়ি,
দ্রুত পা ফেলে-ফেলে,

সূর্য একমাসে
পরিক্রান্ত হোক।
বৃক্ষরাজি আকাশতলে
তাড়াতাড়ি
নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে,
কত স্তন্যদাত্রী—নির্মলা নদী—
বিলুপ্ত হবে,—
আর
দাম্ভিক, অযুত মজ্জাগ্রাসী
মহাপাপী সভ্যতা
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে,—

অশ্রু-আকীর্ণ দিগন্তরেখার ওধারে
দিনগুলো চলে যাক—
বেদনা প্রলম্বিত করতে
ওদের থাকতে বলো না
তোমাদের হাড় পৃথিবীতে হারাবার ভয়ে।

একটি অভূতপূর্ব সভ্যতা আছে—
বহুদূর শুভ-সময়ে ॥

দাক্ষিণাত্যে ॥ জিষ্ণু দে

তামাকের পাতা লাল হয়ে এলো আজ
দূরে পাহাড়েরা আজও কুয়াশায় ভরা
দুঃখের নদী মোহানার দিকে ছোটে,
তোমার প্রাণেই রূপসী বসুন্ধরা।

অচেনা ফসল টুকরো টুকরো জমি
সূর্যের প্রেমে ভাস্বর এই দেশ।
প্রেমিকের চোখ ক্লান্ত নয়তো আজও
গরীবের আজও প্রতীক্ষা নয় শেষ।

তোমাকে চিনি না তবুও হে সুন্দরী
প্রেমের তুফানে সাগরের পরিচয়।
এ বিস্তার তো তোমার আমার দেশ,
হাজার মাইলে সবই চেনা মনে হয়।

হুজুর বাহাদুর ॥ রণজিৎ সিংহ

হুজুর বাহাদুর, যাচ্ঞা করি কণামাত্র করুণার।
সুপারিশ করুন,
যেন পাই রুজির ফরমান।
ছা বৌয়ের মুখে ফোটাব হাসি
চালে তুলব নতুন খড়।

হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
ইদানীং হৃতপ্রাণ হতবল জরদ্গব
রাজী আছি—দেবো নাকে টানা খত।
কসুর করুন মাফ ;
রক্তের তেজে হয়েছিলাম বেচাল
পা ফস্কে নেহাৎই জুটেছিলাম আগুনের কারখানায়
বারুদের মালিকানায় আনচান।

তোবা তোবা
ভুখা নাঙ্গার জোটে কে আর যায়!

দেখে ঠেকে সমঝেছি এবার
মগজের হঠাৎ আলোয় সমঝেছি এবার,
আপন বাঁচাই সার
স্ত্রী পুত্র সংসার সত্য
ইয়ার দোস্ত তত্ত্ব তর্ক অস্তিমে কোন ছার—
এই বোধি এই দিব্যজ্ঞান।

হুজুর বাহাদুর,
অধীন নয় কাতর
লিখে দেবো আত্মশুদ্ধির পবিত্র দাসখত।
নই বেইমান
নিত্য জোগাব নয়া শত্রুর লোভনীয় সমাচার।
নই নিমকহারাম
বাজারে বৈঠকে রটাব অপার প্রশস্তি
জান যায় যাবে ওই পদযুগ সেবায়।

কিন্তু হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
শেষ আর্জি এই :
যেন ভবিষ্যৎ বাঁধা থাকে ;
যেন বেঁকে না বসে
বিনয় নীতি কর্মজ্ঞান বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষ্য লেখে ইতিহাস

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মাঝরাতে সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

অচেনা জায়গায় ঘুম তার এমনি ভেঙে যায়। গভীর ভাবে ঘুমোতে অবশ্য সে কোনোদিন পারে না, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত সেই হালকা ঘুমটুকুর জন্যেও তার দরকার সেই নিজের ছোট ঘরখানা। সেখানে জানলায় জামগাছ সারারাত ছায়া বুলোয়। জামগাছের পিছনে সারারাত মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। হাওয়ায় হাওয়ায় জামগাছের সরু সরু ডালগুলো কখনো সরে যায়, কখনো আলোটা মুখে হাত ঢাকা দেওয়ার ভান করে। সেই ঘরের ভেতরের দেওয়ালে সব জায়গায় পলস্তারা নেই। মাঝে মাঝে খসে গেছে। বাইরে থেকে বিদ্যুতের আলো না চাইতেও ঘরে ঢোকে। ঘুম না এলে যে জায়গায় পলস্তারা নেই সে জায়গার ইঁটের সংখ্যা গুণত সুব্রত। উনষাট কিংবা উনসত্তর খানা লালচে ইঁট গুনতে গুনতে কোনো কোনোদিন ঘুম আসত। সুব্রতর ছোট ভাই প্রিয়ব্রত, আর প্রিয়ব্রতর সঙ্গে পড়ত, এখন বৌ, নন্দিনী পাশের ঘরে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। সুব্রত বুঝতে পারত। মফঃস্বলের ছোটগলির পল্লী এগারোটার পরেই নিঝুম হয়ে যায়। প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়লে এ বাড়িতে শুধু শোনা যেত ওর মায়ের হাঁপানির কাসির শব্দ। মাঝে মাঝে এক একদিন মাঝরাতে সুব্রতর এমনি অকারণেই ঘুম ভেঙে যেত। মায়ের কাসির শব্দ শুনে আবার নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরে ও ঘুমোতে চেষ্টা করত। এক দুই তিন করে মায়ের কাসিও গুনে ফেলতে চাইত সুব্রত। এতেও কোনো কোনো দিন ঘুম আসত।

আজ এখানে মাঝরাতে সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

তাদের শহরটা এই উদ্বাস্তু কলোনি থেকে এমন কিছু দূরে নয়। রেললাইনের হিসেব ধরলে দুটো স্টেশন পরে। কিন্তু এখন তার কাছে

অগম্য। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে আসার পর সে শ্যামনগর গেছে বটে দু-তিনবার। কিন্তু রাত্রে গেছে, রাত্রেই ফিরে এসেছে। এবং একবারও নিজেদের বাড়িটায় যেতে পারে নি। নিজের ঘরখানাতেও না। এখানে ওদের বন্ধু প্রকাশদার বাড়িটা এখন ওর আস্তানা। যতক্ষণ না ওপর থেকে নির্দেশ আসে ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে। প্রকাশদা প্রৌঢ়। রোগা। লম্বা। প্রকাশদার বৌ সুনয়নী সবসময় ক্লান্ত। মেয়ের নাম রুচি। সুব্রতর মেয়েটিকে ভাল লাগেনি। বড় বেশি কথা বলে। প্রকাশদা এখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করে। সেই স্কুলেই সকালে মেয়েদের বিভাগে রুচি পড়ায়। দু-দিন হলো সুব্রত এখানে এসেছে। দু-রাত্রি এ বাড়িতে সে কাটাল। মস্ত বড়ো পুরনো বাড়ি। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কোণের দিকে খানতিনেক ঘরে প্রকাশদার গেরস্থালি। চারদিকের ভাঙা ঘরদোর জানলার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশদার গেরস্থালির দিকে তাকালে মনে হয় যেন সব ঘরের দাবি এক এক করে ছাড়তে ছাড়তে প্রকাশদা এই শেষ তিনখানা ঘরে এসে ঠেকেছে। এই তিনখানা ঘর সদর দরজার কাছ ঘেঁষে। এর পরেই বড়ো রাস্তা। রাস্তার ওপারে একফালি মাঠ। তারপরেই নতুন নগর উদ্বাস্তু কলোনি।

ঘুম ভেঙে গেল সুব্রতর। কত তারিখ আজ, এগারোই নভেম্বর, না বারোই, উনিশ শো উনপঞ্চাশ সাল।

এখন কত রাত? অনেক হবে নিশ্চয়। ঘুম ভাঙতেই অভ্যেসমতো মায়ের কাসির শব্দের জন্য কান পাতল সুব্রত। কে একজন কাসছে বটে। মা নয়। উঠে পড়ল সুব্রত। আকাশে কোথাও বোধহয় একটুখানি চাঁদ আছে। এদিকে রাস্তায় আলো জ্বলে না। মেটে মেটে আলোয় শির শির করছে কার্তিকের রাত। যে লোকটা কাসছে, সে রাস্তার উল্টো দিকে কাঁচা নর্দমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বুক চেপে ধরে কাসছে। ভেতরের দিকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। 'মা' বলে রুচি ডাকল। এখন প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী বোধহয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর মা বুকে বালিশ চেপে ধরে জেগে জেগে হাঁফাচ্ছে। চিন্তাটা এই আকার ধারণ করতে সুব্রত একটু সতর্ক হলো। না। মায়ের হাঁফানো ছাড়া উপায় নেই। মা আর সারবে না। প্রিয়ব্রতরা সারাদিন খাটাখাটনি করে। না ঘুমিয়ে পড়ে ওরাও পেরে উঠবে না। যে লোকটা কাসছিল সে কাঁচা নর্দমাটা পেরিয়ে ওদিকের মাঠের ওপর গিয়ে উঠল। তারপর কে জানে কাদের একরাশ হোগলার গাদার ওপর

বসে বসে কাসতে লাগল। লোকটা আই-বির লোক হতে পারে। আবার অন্ধকার কেটে গেলে দেখা যেতে পারে যে লোকটা পার্টির ওপরমহলের পাঠানো কুরিয়ার। এটাকে ওটা ভাবার এবং ওটাকে এটা ভাবার অভিজ্ঞতা সুব্রতর আছে। কাজেই সে চঞ্চল না হয়ে চুপ করে জানলার ধার থেকে সরে এল। কুরিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া থাকত রাত্রে নক্ করবে না। কর্মীদেরও জানা আছে রাত্রে কুরিয়ার জানলেও আচমকা সাড়া দেবে না। বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলের তিনজন ধরা পড়ল শুধু এই ভুলটুকুর জন্য। সুতরাং ও যেই হোক ওকে অপেক্ষা করতে হবে সকাল পর্যন্ত। একটা সিগারেট ধরাল সুব্রত। দিন আসছে সামনে। দিন, সূর্যালোক এসব কথা ভাবলেই বিরক্ত হয়ে পড়ে সে। দিন মানে এই জানলাটা বন্ধ করতে হবে। নিঃসাড়ে পড়ে থাকা। মন্থর এবং ক্লান্ত প্রকাশদার স্ত্রী মাঝে মাঝে ঘরে এসে দাঁড়াবে। প্রকাশদা মাথায় তেল বুলোতে বুলোতে দেশের হালচাল জিজ্ঞাসা করবে। প্রকাশদার মেয়ে রুচি মোটা মোটা তুলোর পুঁটলি দিয়ে লাল লাল পোষ্টার লিখবে। আর সমানে বক বক করবে। দিন মানে, সুব্রত ঘরের মধ্যে পাইচারি করবে। সিগারেটের টুকরো ছিটোবে। মাঝে মাঝে রুচি এসে দাঁড়াবে বিবর্ণ চায়ের গ্লাস নিয়ে। এসেনবেরিতে লক আউট, কাকদ্বীপের সংঘর্ষ, সিঙ্গুরে কৃষক হাঙ্গামা—সারাদিন রুচি শুধু এক খবর থেকে আর এক খবরের উত্তাপে টগবগ করবে। আর সুব্রতকে জ্বালাতন করবে। মেয়েরা পারে কি না পারে বৌবাজারে দেখিয়ে দিয়েছি।

আজ সাতদিন জেলার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। সাতদিন আগে সেই যে রবিবার শেষরাত্রে হাজিনগরের ডেন্ থেকে পালাতে গিয়ে সুরজিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো সঙ্গে সঙ্গে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সুরজিৎ কোথায় গেল কোনো খবর করতেই পারল না। বাহাত্তর ঘণ্টা সে গৌরীপুরের পাঁচনম্বর কুলি লাইনের এক জায়গায় কাটিয়েছে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ভোররাত্রে সে যেখানে ছিল সেখান থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে রাউণ্ড-আপ হয়। সুব্রত জানত না পি-সির একজন নেতা ওখানেই শেল্টার নিয়েছিলেন। বিরাট কালো প্রিজন ভ্যানটা চলে যাবার পর সুব্রত নৈহাটি স্টেশনে এসে গাড়ি ধরে। এখানে প্রকাশদার বাড়িতে সে আগে একবার থেকে গেছে। জায়গাটা নিরাপদ। কিন্তু কদিন ধরে কোনোদিকে কারো সঙ্গেই কনট্যাক্ট্ করে উঠতে পারছে না। কেমন যেন দলছাড়া হয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। অন্ধকারে

হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতির টুকরোটা জ্বালাল। মোটা বইখানার ওপর টুকরো মোমবাতিটা রাখল সুব্রত। এইটা আসলে রুচির ঘর। এখন ও রয়েছে বলে ওকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। একটা দড়ির আলনায় রুচির কতকগুলো কাপড়। একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো বই। সুব্রত চিঠি লিখবে ভেবে বাতি জ্বালিয়ে বসে রইল। কী ভেবে চিঠি লিখল না। বাতির শিখাটা হেলবে দুলবে তাই দেখবে ভাবল। সেই অস্থির আলো সহসা গিয়ে পড়ল দেওয়াল টাঙানো একটা ছবির ওপর। মাঝরাতের একটু পরে নির্জন ঘরের বিবর্ণ দেওয়ালের সেই ছবির মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রতর ইচ্ছে করল একটু ঘুমিয়ে নেয়। আধো ঘুমের মধ্যে সে শুনতে লাগল বাইরের সেই লোকটা যে কুরিয়ার হতে পারে বা আই-বির লোক হতে পারে, কাসতে লাগল আর শ্লেষ্মা তুলতে লাগল। লোকটা যে কেউ হতে পারে। হোক। যাই হোক ওকে তার কাছেই আসতে হবে। শুধু শেষরাতের ওয়াস্তা। ওর তন্দ্রায় কাসির শব্দটা মিলিয়ে গেল। অনেক—বড়ো হয়ে হয়ে শেষে যেন আকাশে গিয়ে ঠেকল সেই দেওয়ালের ছবির মানুষের মুখটা।

মুখটা জোসেফ স্তালিনের!

মৃদু তন্দ্রা ছোট্ট পাখির মতো দ্রুত উড়ে গেল। ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল সেই মানুষের ছবিটা।

কে যেন খুট্‌খুট্‌ করে ভেতরের দরজায় শব্দ করছে। সুব্রতর নাম ধরে ডাকছে। প্রকাশদার গলা। সুব্রত উঠে দরজা খুলে দিল। একটা বিছানা-ঢাকা সুজনি জড়িয়ে প্রকাশদা ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

—কে ও লোকটা?

—বুঝতে পারছি না।

—অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।

—যদি এখানে এসে থাকে তো এইবার আসবে। আলো জ্বালাব?

—না, থাক। কাল রাত্রে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।

—কোনো খবর আছে?

—তোমাকে দেবার খবর কেউ দেয় নি। আমি শুনলাম একটা খবর। রমেন? কেমন ফিস্‌ ফিস্‌ করে উঠল প্রকাশদা।

—হ্যাঁ, কী হয়েছে?

—পরশু পুলিশ হাসপাতালে মারা গেছে।

—কার কাছে শুনলেন ?

—রমেনের দাদা ভূমেন, সেই সনাক্ত করেছে। মাথায় আর কিডনিতে গুলি লাগে। হাজিনগরে কোনো একটা ডেন্ থেকে পালাতে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে যে ছিল সে ছেলেটা কেটে বেরিয়ে যায়। ওকে প্রিজন ভ্যানে তোলে। ও প্রিজন ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে। ছুটছিল। সেই অবস্থায় গুলি লাগে।

মশারিটা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল সুব্রত। রমেনের নামই সুরজিৎ। এখন পার্টির ওপরে নিচে সবাই ওকে সুরজিৎ বলেই জানে। একসঙ্গে ছিল ওরা। এই সাতদিন সে রমেনের কথাই ভেবেছে। তার কেমন দৃঢ় ধারনা হয়েছিল যে রমেন—না সুরজিৎ—না রমেন, ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবে। মনে মনেও এ কদিন রমেন বলেনি সুব্রত। সুরজিৎ বলেছে। এখন আর গোপনতা কেন ? এখন কি সুরজিৎ না রমেন ? নাকি কিছুই নয়—নাম মাত্রই আর নয়। রমেনও নয় সুরজিৎও নয়।

—ওর দাদা খুব মুষড়ে পড়েছে।

—কার ?

—রমেনের।

—(সুরজিতের।)

—ভাইটার ওপর খুব ভরসা করেছিল। পর পর তিন বোন, নাবালক দুটো ভাই। বড়ো সংসার তো ?

—মরবার সময় জ্ঞান ছিল ?

—টনটনে জ্ঞান ছিল। দাদাকে দেখে প্রথমটা যেন চিনতেই পারে না। পুলিশের ডাক্তার ওর দাদাকে আড়ালে বলে যে নামঠিকানা কিস্যু দেয়নি। ওর কাছে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাই দেখে পুলিশ ভূমেনকে খবর দেয়। ভূমেনকে দেখে রমেন—

—(না সুরজিৎ)

—সটান হাঁকিয়ে দেয়, আপনাকে চিনি না আমি, কে কার দাদা, বাড়ি যান। সেইটা ভূমেনের খুব মনে লেগেছে। ও ভাবছে যে বকতঝকত এ সব হাঙ্গামার জন্যে সেই অভিমানে বুঝি রমেন ওকে চিনতে চাইল না। আসলে তো ব্যাপারটা তা নয়। বুঝতেই পারছ।

সুব্রত চুপ করে বসে রইল। তাহলে রমেন মানে সুরজিত কাগজপত্র

আর চিঠির প্যাকেট সমেতই ধরা পড়েছে এবং তাহলে প্রাদেশিক কমিটিকে লেখা সুব্রতর চিঠিগুলোও পুলিশের হাতেই পড়েছে। আর কিছু নয়, শুধু অনেকগুলো নাম পেয়ে যাবে পুলিশ। আর তার সম্বন্ধে অনেক কিছু।

—তুমি কিছু খবর পাও নি ?

—না।

—রমেনের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয়েছে কবে ?

কোনো জবাব দিল না সুব্রত। বোঝাই যাচ্ছে প্রকাশদা বিচলিত হয়েছেন খুব। তা নইলে যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন। সুব্রত আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল সেই মানুষটার গম্ভীর প্রশান্ত মুখের দিকে। আজারবৈজানের টম্যাটো, বেইলোরুশিয়ার আলু, তুর্কমেনিস্তানের খুবানি···কত দীর্ঘ, চড়াই উৎরাই ভাঙলে তবে পৌছনো যায় ? ঘরের মধ্যে আলো ঢুকছে এসে। ভোর হয়ে আসছে। ভোরের এরোপ্লেন দমদমের দিকে উড়ে গেল। একটা ভাঙা স্টোভের গর্জন শোনা গেল বাড়ির মধ্যে। রুচি চা করবে এবার—অনেকখানি হেঁটে যেতে হবে ওকে। ও তাই এখন থেকে প্রস্তুত হয়। ভোরের প্রথম ম্লান আলোটা বাঁকা হয়ে সেই ছবিটার ওপর পড়ছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রতও লক্ষ্য করল ছবিটাকে পোকায় কাটছে। সময় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। কুর কুর শব্দে সেই সময়ের হাত যেন ছবিটাকে কাটছে। তার হাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে ছবির মানুষটা কিন্তু আশ্চর্য প্রশান্তিতে স্থির।

—মুস্কিল হয়েছে কী জান সুব্রত, কাউকে বলা যাচ্ছে না। ওর বুড়ো বাবা কিছুই জানেন না। রমেন কোথাও পার্টির কাজে গেছে—এই জানেন তিনি। প্যারালিসিসে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক বুঝতে পারছেন কিন্তু, যে কিছু একটা হয়েছে। তিনি কেবলই জিজ্ঞাসা করছেন, ও ভূমেন অত ছোটাছুটি করছিস কেন রে ? উনি মনে করছেন যে, রমেন বোধ হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কেবলই বলছেন, আহা বল্ না আমাকে, ধরা পড়েছে তো, সে আর লুকনোর কী আছে। কিন্তু সত্যিই বলা তো যায় না। ওরা ডেড্‌বডি নেয় নি···

সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে নিয়ে আসে ট্রাক্‌টরের দিন, জোসেফ—কার লেখা, সমর সেনের ? পোকার কির কির শব্দটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একটা আশ্চর্য চটুল চড়ুই প্রথম কিচ্ করে ডেকে উঠল। তাহলে সকাল। স্টোভের আওয়াজটা হঠাৎ দম-আটকানোর মতো থেমে গেল।

—সেটা আবার এক হিসাবে এ বাড়ির পক্ষেও ভালো হয়েছে।

—কেন ?

একটু গলা খাঁকারি দিলেন প্রকাশদা। স্টোভটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি। পোকার দিয়ে পরিষ্কার করছে রুচি ?

—রুচি খুব শক্‌ড হবে।

—মানে ?

—তুমি কিছু জানতে না ?

—না তো।

—রুচির মাও ভেঙে পড়বেন। উনিও খুব আশা করেছিলেন।

আর বসে থাকতে পারল না সুব্রত। উঠে বাইরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুরজিৎ নয়, রমেনের মৃত্যুসংবাদই সে শুনল এবার। কে লোকটা বাইরে রয়েছে, কুরিয়ার না আই-বির লোক—এবার সে এগিয়ে আসুক। কার্তিকের শীত শীত সকালে মাঠের হোগলার ওপর শুয়ে শুয়ে যে লোকটা কখনো কাসছিল, কখনো ঢুলছিল, সেও এইবার উঠে বসল। গলার আর মাথার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলতে ফেলতে সে কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে এ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটা জানলার দিকে এগিয়ে এসেই গোঁফদাড়ির আড়াল থেকে একবার হাসল। চিনতে পারল সুব্রত। জেলা পার্টির কুরিয়ার। ওর নাম বিনয়। আসল নাম কী কে জানে।

—খুলুন, চিঠি চাপাটি আছে। কখন থেকে এসে জমে গেছি।

লোকটার দাড়িতে একটুকরো হোগলার আঁশ লেগে রয়েছে। চোখদুটো লালচে। গলার স্বর ভারী ভারী। ময়লা কাঁধ-ছেঁড়া শার্ট। ধুতি আর কাবলী চপ্পল ধুলোয় বোঝাই। প্রকাশদা উঠে ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। লোকটা বলল—বসুন, আপনারও খবর আছে। প্রকাশদা বললেন—একটু চায়ের জন্য বলে দিই। প্রকাশদা বাইরে যেতে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে লোকটা একটু রূঢ় কণ্ঠে শুরু করল—আপনি যে কাদের কাছে ইউ-জি, পুলিশের কাছে না পার্টির কাছে আপনার ব্যবহারে তা স্পষ্ট নয়। এখানে কবে এসেছেন ?

—বুধবার।

—আর আজ শনিবার। যে সব ডেনে, শেল্টারে আপনার থাকা সম্ভব তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, এ্যাণ্ড নো পাত্তা। একটা কন্‌ট্যাক্‌ট করার চেষ্টাও করেন নি। খবর সব জানেন?

—সুরজিৎ?

—হ্যাঁ, এ্যাণ্ড এভরিথিং ইজ ইন দি হ্যাণ্ড অব্ দি পুলিশ।

নিচু গলায় উত্তেজিত স্বরে লোকটি কথা বলে যেতে লাগল। লোকটি উঠল, জানলার কাছে গিয়ে গলার কফ পরিষ্কার করল, আবার এসে বসল। 'একটা সিগারেট খাওয়ান'। 'আমার সেই পুরনো অ্যালার্জির সর্দি আবার চেপে ধরেছে'। 'কই, প্রকাশদা চা হলো'। এসবের মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছিল 'জোলিও কুরি বলবেন বোধহয়'। 'হ্যাঁ ময়দানেই র‍্যালি হবে'। 'দেখবেন আপনি যেন মিটিং-এ যেতে গিয়ে আবার গেঁথে যাবেন না'। 'এই নিন চিঠি'। দু ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি লম্বা খামটা হাতে নিল সুব্রত। ছিঁড়ল। পার্টি তাকে জানাচ্ছে যে অনতিবিলম্বে সে যেন এ স্থান ত্যাগ করে। তার কতকগুলো কার্যকলাপ সম্বন্ধে পার্টির বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ আছে। আজ বেলা দশটার সময়ে সে যেন নৈহাটি স্টেশনের সামনের চায়ের দোকানে শেখরের জন্য অপেক্ষা করে। শেখর তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। পড়ে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলল সুব্রত।

—তাহলে তো উঠতে হয়।

—আমি আগে চলে যাই, দাঁড়ান।

লোকটি উঠে প্রকাশদার কাছে গেল। নিচু স্বরে কী সব কথা বলতে লাগল। প্রকাশদা গম্ভীর হয়ে শুনতে লাগলেন। হুঁ আর না-এর মাঝামাঝি ঘাড় নাড়তে নাড়তে একসময় প্রকাশদার কথা শোনা শেষ হয়ে গেল। স্টোভের আওয়াজ থেমেছে। পাখিগুলোর ডাক শোনা যাচ্ছে। রুচি নতুন লোকটিকে কী সব কথা জিজ্ঞাসা করে চলেছে। লোকটি পাশ কাটানো জবাব দিচ্ছে। চা খেতে খেতে পেয়ালা হাতে নিয়ে রুচি একবার সুব্রতর ঘরে ঢুকল। সেই ফাঁকে লোকটি প্রকাশদার কাছে বিদায় নিল। রুচি জিজ্ঞাসা করল সুব্রতকে—

—আপনি কি এখনি চলে যাবেন?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়।

—কী হয়েছে? থম থম করছে রুচির মুখ। বেশী কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে ওর।

—কোথায়, কার?

—কোথাও, কারো একটা কিছু হয়েছে।

—আমি কিছু জানি না, রুচি।

চায়ের পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়ে আবার নামিয়ে আনল সে।

—আপনার সঙ্গে রমেনদার দেখা হয়।

—এর আগে তো কয়েকবার হয়েছে।

—এবার যদি দেখা হয় বলবেন তো এদিকে এলে যেন আসে। পুলোভারটা হয়ে গেছে।

—বলব। কথাটা বলেই সুব্রতর মনে হলো যেন সে নিজে বড় অসৎ।

—সুরজিৎ কে?

চমকে উঠলেও চুপ করে কঠিন হয়ে তাকিয়ে রইল সুব্রত। তারপরে বলল, জানি না।

—আপনি জানেন না হতেই পারে না। নাকের ডগাটা একটু যেন ফুলে উঠল।

রুচির হাতে একজোড়া লাল প্লাস্টিকের চুড়ি। চায়ের কাপটা যখন সে নামিয়ে রাখল তখন তার হাতটা কাঁপছিল। বহুভাষিণী মেয়েটা, সুব্রতর মনে হলো, হঠাৎ যেন ভেতর থেকে বাধা পেয়ে চুপ করে যাচ্ছে। অথচ এই মৌনকে সে মেনে নিতেও পারছে না। প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে নিজেকে সামলাতে চাইছে।

—রমেনের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—বছর খানেকের। এখানে উনি বার তিনেক শেল্টার নিয়েছেন। রুচির শ্যামল রঙে একটু যেন রঙের ছোপ লাগল।—এবারে অনেকদিন খবর পাই নি। বলেছিলেন একবার নভেম্বর মাসে আসবেন। সুব্রতর ইচ্ছে করছিল রুচিকে বলে যায় সব। নিরর্থক প্রতীক্ষা, বন্ধ্যা প্রত্যাশার হাত থেকে মেয়েটা রেহাই পাক। কতদিন লাগবে ভুলে যেতে? এই উদ্বেগঘন মুহূর্তটাকে বোমার মতো ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। রুচি সেই মুহূর্তে সচকিত হয়ে কী যেন শুনল।

তারপর ভেতরে গিয়েই, একটু বাদে ফিরে এল। তীব্র ভর্ৎসনা ঘনিয়ে এল ওর গলায়—বলছিলেন না কেন? এই তো সবই জানলাম।

মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল সুব্রত—তুমি শুনেছ সব?

—হ্যাঁ, মা কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে আমার অদৃষ্টকে গালাগাল দিতে দিতে সব বলল। সুব্রত আর রুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো অনেক কথাই বলা যেত। রুচিকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। এই নৈঃশব্দ্যটা যেন একটা ভারী পাথরের দরজা। এটা খুলতে পারলে হয়তো সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যায়। কিন্তু খোলার কথাটা কারো মনে এল না। একটা মানুষের কাছ থেকে প্রতীক্ষা কেড়ে নিলে তাকে কেমন দেখায় সেটা সুব্রত কখনো দেখে নি। রুচিকে দেখে সেটা জানল। সুব্রত বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলো। রুচি ভেতরে চলে গিয়েছিল। সুব্রত বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আবার ফিরে এল—দাঁড়ান। ফোলা ফোলা চোখদুটো সুব্রতর ওপর মেলে ধরে সে বলল—রমেনদার জন্যে এই পুলোভারটা বুনেছিলাম। শীত আসছে। ও বলেছিল তাড়াতাড়ি করতে। শীত তো আসছেই। আপনারও তো গরম কিছু নেই। এটা নিয়ে যান।

দু-ফোঁটা গরম চোখের জল পুলোভারটার ওপর পড়েছিল। হাত দিয়ে সযত্নে সেটাকে মুছে ফেলে সুব্রত ওটা কাগজে মুড়ে নিল। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—যাই।

ক্যালেণ্ডারটার দিকে অকারণে একবার তাকালো সুব্রত। নভেম্বর মাস। উনিশ শো উনপঞ্চাশ সাল যাই যাই করছে। ঘর বাঁধবে বলে কারা বাঁশ কাটছে কোথায়। বাঁশ কাটার আওয়াজ সুব্রতকে বরাবরই বিমর্ষ করে তোলে। পথে নেমে সুব্রত বুঝতে পারল শীত আসছে। রোদ মিষ্টি।

নিবাত নিষ্কম্প শেষ কার্তিকের মন্থর সকালবেলা। দুপাশে ধান জমি। পরিণত শস্যরাশি সম্ভাবনায় আনত। মাঝে মাঝে নিথর গাছপালা। ঝোপের বুকে বুকে টুনটুনি অথবা অন্য কোনো ছোট্ট পাখির ঝাঁক। আকাশ নিঃসীম নীল। চকচকে নারকোল গাছের পাতার ঝালরে শ্রান্ত চিল ডানা মুড়ে বসছে। একটু-একটু পাকা রং ধরেছে মাঠে—কালো কালো মানুষগুলোকে সেই পটভূমিতে সুন্দর মানিয়েছে। চলতে চলতে সুব্রত একটা সুপুরীগাছে ঘেরা দীঘির ধারে এসে পড়ল। দীঘির জলে সামান্য ঢেউ। সুপুরি গাছের ছায়া সেই জলের গভীরে সাপের মতো কাঁপছে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক

পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। যেমন শত শত বছর ধরে গেছে, শত শত বছর ধরে যাবে। দীঘিতে স্নান করছে যে মেয়েটি সে সূর্যপ্রণাম করছে। তার সুঠাম অঞ্জলিতে বহু আকাংক্ষা। পথের ধুলোয় কতকগুলি চড়ুই কেন কে জানে ধুলো মাখছে গায়ে। নিমের বিবর্ণ পাতা ঝরে পড়ছে পরম প্রশান্তিতে। অর্ধপক্ক ফলের মতো রমণীয় সেই মেয়েটির মুখ, স্তোকনম্র দুটি বুক, দৃঢ় উরু-ভঙ্গিমা। বিশাল ভ্রূ দুটি যেন ডানা মেলে দেওয়া পাখি।

আমার কোনো অধিকার নেই—সুব্রতর সমস্ত অন্তর দীর্ণ করে শুধু এই স্বগতোক্তিটাই যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। এ সবের দিকে তাকানোর আমার কোনো অধিকার নেই। শুধু আমার কেন—এই যুগের, এ পৃথিবীরই বোধহয় নেই। জীবন যদি ভাঙাচোরা, যদি খণ্ডিত এবং বিধ্বস্ত—তাহলে প্রকৃতির এই অবারিত প্রসাদও গ্রহণ করা যায় না। সেই প্রসন্ন প্রকৃতির বুক থেকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সুব্রত রমেনের কথা ভাবল। হাসপাতালে রমেন বস্তুত কাকে আশা করেছিল? নিশ্চয় রুচিকে। শেষ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেও সে হয়তো সেই আশাই করেছে। এ কথা ভাবতেই সে ক্রুদ্ধ হল নিজের ওপর। রমেনের শবভস্ম এখনো মাটির সঙ্গে মিশে যায় নি, অথচ সে এখনি আকাশকে স্নিগ্ধ বলে ভাবতে পারছে। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়-সঞ্চারী সেই শিশির-ছিটোনো হেমন্তের সকাল স্পর্শ করতে লাগল সুব্রতকে। নিমের বিবর্ণ পাতা আলগোছে তাকে ছুঁয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত, অধিকার নেই একথাটা ফণা ধরতে পারল না। ফণা নামাতেও পারল না।

চলতে চলতে একটা খালের ওপরে সাঁকোর মাথায় দাঁড়িয়ে সে নৈহাটির চটকলের বাঁশী শুনতে পেল। ঠিক করল নৈহাটি ষ্টেশনে পৌঁছে, হয় বাস নয় ট্রেন ধরে যেখানে যাবার সেখানে পৌঁছবে। পশ্চিমমুখো কাঁচা রাস্তা। নৈহাটির দিকে চলে গেছে। হাটে যাচ্ছিল একটা শাকওয়ালী বুড়ি। কাঁকালে শাকের ঝুড়ি। হাতে লাঠি। শনহুড়ি চুল। আপন মনে বক্ বক্ করতে করতে বুড়ি পথ হাঁটছিল। দুপায়ে শুকনো কাদায় সাদা রঙ ধরেছে। কাপড়ের গিঁটগুলোয় কাদা শুকিয়ে জমে গেছে। ঘোলাটে চোখে পিচুটি। সুব্রত ভাবল তার যদি শৈশব থাকত তাহলে সহজে বুড়িকে বলতে পারত —দাও বুড়ি, তোমার ঝুড়িটা আমি বয়ে দিচ্ছি। ছোটবেলায় ওদের বাড়ির সামনে একটা মুচি বসত। তার খৈনি কিনে এনে দিত সে বাজার থেকে।

পিঞ্চিস বলত সেই মুচিটা পেরেক তোলার যন্ত্রটাকে, হাম্বর বলত হাতুড়িটাকে। পিঞ্চিস বললেই কেমন খৈনি খেয়ে পিচ করে থুতু ফেলার কথা মনে পড়ে যায়—মুচিটা এদিক ওদিক থুতু ছিটোতো। বুড়িটার ঘোলাটে চোখ সুব্রতর চেনা চেনা লাগল। এখনি যেন সেটা সে দেখে এসেছে রুচির চোখেই।

—কোথায় যাচ্ছ, বুড়ি মা?

—কোথায় আর যাব বাবা, হাটে। তা যাতি পাল্লি তো যাবো, কাঁকালের বাতে পেড়ে ফেলেছে, আর যাওয়া! এক্কেবারে মুক্তোপুরের ঘাটে গেলি বাঁচতাম, তা পোড়া যমের কী আর নজর আছে বাবা, আমাকে চোখে দেখেই না।

—তা তুমি আর এই বয়সে হাটে যাও কেন, তোমার ছেলে মেয়ে নেই।

—আ কপাল, তা থাকলে আজ আমার এ দশা। এক এক করে সব তো খেলাম গো। পেরথম সোয়ামি। একটু আধটু সোয়ামি নয় বাবা, এই দশাসই এত্তোখানি মদ্দটা। তারপরে ছেলে, ছেলের ঘর ভর্তি এণ্ডিগেণ্ডি ছিল। বৌটার তখনো গরম বয়স, বলল, বুড়িকে নিয়ে ঘর করতে পারবোনি। দিলে আমাকে খেদিয়ে।

—তা তুমি বললে না যে আমার সোয়ামি-পুতের ভাত থেকে আমাকে কেউ ঠেলতে পারবে না?

—ওমা বলতে যেন কিছু বাদ রাখলাম। শুনলে তবে তো। বৌটার ভাই এল, ভাইয়ে পিছু পিছু ভাজ, ভাজের মা এল, দেখতে দেখতে বাবা, বাবা এসে জমল, ভাজের ভাইবাও বলল তবে আমরাই বা বাদ থাকি কেন? দেশে আকাল নাগল যখন, ত্যাখন সব এক এক করে ভাগল। জমিটুকু সতীশ বাগের কাছে আটকা পড়ল।

—তোমার বউ গেল কোথায়?

—নৈহাটিতে একটা ধানকলে কাজে নেগেছে। সে দপদপানি আর নেই। ব্যামোয় ধরেছে, মেয়েমানুষের রোগ। তার ওপর পা ফোলে, পেটে বোধ হয় জল। ছেলেগুলো কোনোটা আছে, কোনোটা মরেছে। একটা টেরেনে ভিক্ষে করে।

—এখন তুমি ঝাড়া-হাতপা একেবারে।

—না বাবা, তাই বা কোথায় বলো। মেয়ের পেটের একটা নাতি আছে। মেয়েটা ঐ ছেলেটাকে রেখে অনেক দিন হল মরে বেঁচেছে। বাপ

আবার বিয়ে করে পরিবার ঘরে আনল, সে মাগী এসেই ছোঁড়াটাকে তাড়াল। ছোঁড়াটা এসে জুটেছে আমার কাছে। এল যখন তখন চিনতেও পারি না, সারা শরীরটায় হলুদ গুলে দিয়েছে যেন। চোখ দুটো যেন কণ্টিকারির ফুল। মুখ ফুলে ঢোল। আমার কাছেই আছে। কুতুবপুরের তাগা পরিয়েছি। শাওন-কালীর মালা দিয়েছি মাথায়। তা কই, আরামের তো কোনো কিনারা দেখছি না।

—ওষুধ খাওয়াও, ওষুধ না খাওয়ালে সারবে কী করে?

—কোথায় ওষুধ পাব বাবা, কুতুবপুরের মাগনার ডাক্তার আছে। সরকার থেকে দিয়েছে। তাদের কাছে নিয়ে গেছলাম ছোঁড়াটাকে। তা দেখলে যত্ন করে, মিথ্যে বলব না। দেখলে, ওষুধ লিখে দিলে। কমপাণ্ডার বলে কী যদি একটা আধুলি দাও তো ওষুধে কাজ হবে, নয়তো ওষুধ ঢোঁড়া করে দেবে। কোথায় আধুলি! তাও কষ্টে ছিষ্টে একদিন যোগাড় করলাম। কোমরের বাতে নিজে নড়তে পারি না, ছোঁড়াকে বললাম যা ওষুধ নিয়ে আয়। দুপপুর বেলা ছোঁড়া ঘরে ফিরে এল, বলল পয়সা হারিয়ে গেছে। তারপর এই নামুনি, এই নামুনি। পরে শুনি কী যে সে আবালসিদ্ধির হাটে গুপির দোকানে তেলে ভাজা খেয়েছে বসে বসে। কপালের কথা আর কী বলব বলোদিনি। একটু গোলা দুধ দেয় বাবুদের সদর থেকে, সে দুধটুকুনি গয়লাদের কাছে বেচে বেচে আধুলিটা করনু, এই আকালে সেটাও মাটি।

—তা বলে ফেলে রেখে দেবে অমনি।

—তাই কি পারি বাছা, আমার পেটের মেয়ের পো, কথায় বলে আসলের সুদ, ফেলতে কি পারি! দেখি সামনের শীতে মুচকুন্দপুরে বাবার থানে হত্যো দেবো না হয়। বাবার দয়া হলে বাবা ওষুধ বলে দেন, বিশ্বেস নিয়ে খেলে আর কথা নেই। কলিমুল্লার বড় মেয়ের পাথুরি হয়েলো। মোছনমান —তাও বাবার দয়া হয়েলো। বললো থানের পেছনে বুনো ওল আছে উপড়ে খা গা যা। বললে পেত্যয় যাবা না—পাথুরি কোথায় কমনে মিলিয়ে গেল, হপ্তা পোয়ালো না অবধি। সুব্রত চুপ করে শুনতে শুনতে পথ হাঁটছিল। বুড়ির পায়ের কাদার চাপড়া শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পথের ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। লাঠি ধরে ধরে বুড়ি এগিয়ে চলেছে। পায়ের গিঁটের কাছে কালো কালো কারের সঙ্গে একটা কড়ি বাঁধা। পা ফুলছে বুড়ির।

—দোষ তো হত্যে বলছি, যা বাতের দশায় ভুগছি, কোমরই সোজা

করতে পারি না। চোখের নজর কমে গেছে। সেই ভোর রাতে উঠি। পোয়াতে তারা তখন ঐখেনে দপদপ করে। এ-পুকুরে ও-পুকুরে শাকঘাস দুটো ছিঁড়ে শহরে যাওয়া—একটু জিরেন তো পাইনা, কোমরের আর দোষ কি দোষ বলো। তোমার ঘর কোথায়, বাবা ?

—এখানে নয়।

— ঘরে কে আছে তোমার ?

—মা আছে। তোমার মতো বুড়ি।

—আর ?

—ভাই আছে, আর কেউ নেই।

—আ কপাল। বুড়ি মাতারে যত্ন করে কেডা, পরিবার নেই তোমার ?

—না। ইচ্ছে করেই বলল না স্থব্রত যে ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে।

—হেই মা। তা বৌ এনে দাও মাকে। কী ছেলে মা! কোজ্জাবো। বিয়ে করো। বৌ আনো। ঘর ভত্তি সোমসার হোক। খোকা, খুকি, ঘর বাডবে, মানুষ বাড়বে, খাবার লোক বাড়বে, তবে তো। হঁ্যা বাবা···বুড়ি বকতে বকতেই চলল, কলমল্ করবে খোকা খুকি, তবে তো ঘর—স্থব্রতব ভাল লাগল খুব। রুচির দেওয়া পুলোভারে আর বুড়ির দেওয়া পরামর্শে হয়তো কোনো মিলই নেই। কিন্তু বুড়ির কথাগুলো শুনতে শুনতেই ও আনমনে পুলোভারটা চেপে ধরল। ভাবল আর একবার রুচির কথা। যে মেয়েটা ভয়ানক বক বক করত বলে সে বিরক্ত হত।

দিনের বেলায় নৈহাটী স্টেশনের চেহারা অনেকদিন দেখে নি স্থব্রত।

নতন নতুন উদ্বাস্তুর দল দিনের পর দিন এদিকে চলে আসছে। রাণাঘাট আর নৈহাটী স্টেশনের ওপর উদ্বাস্তুদের ভীড়ের চাপ পড়েছে সবচেয়ে বেশি। সরকারি ক্যাম্পগুলো সম্বন্ধে নানা গুজব। পুনর্বসতির ব্যাপারে অবিশ্বাস। একজায়গা থেকে উৎখাত হবার ফলে মানসিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি মানুষগুলোকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে। পাকিস্তান থেকে আসা প্রতি ট্রেন থেকেই শত শত সংসার নামছে। তার অন্তত আদ্ধেক বেশ কিছুদিনের মতো ঠেকে থাকছে প্লাটফর্মে, স্টেশনের গাড়িবারান্দায়। বেলা নটা। স্থব্রত স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসল। ভাঙা তোরঙ্গ, ঝুড়ি আর পুঁটলি দিয়ে সীমানা তৈরি করে সংসার পেতেছে এক একটা গেরস্থগুলি। এরি মধ্যে

উনুন, বিছানা, রোগীর যন্ত্রণা। বাসি ভাত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পোঁটাপরা হাডবেরকরা বাচ্ছা ছেলে। মাই খাওয়াতে খাওয়াতে প্রৌঢ়া মা কোলের ছেলেকে পিটছে। আট দশ বছরের একটা ছেলে একটা মোটা পুলিশ কনস্টেবলের ঘাড়ে মালিশ করছে। এদিকে একটা হাত আয়নায় গোঁফের পাকা চুল তুলছে একটি পুরুষ মানুষ। মাদুরে শুয়ে শুয়ে—পরম নির্ভাবনায়। জলে কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে গোটা তল্লাট। এখানে ওখানে ছোট ছেলেরও মত। ঝগড়া, সীমানা নিয়ে, কলের জল নিয়ে। চেঁচামেচিতে, ইঞ্জিনের ষ্টীম ছাড়ার শব্দে, যাত্রীদের চিৎকারে শব্দের নরক। এঁটোয় আবর্জনায় বমিতে পায়খানায় গন্ধের নরক। এর মধ্যেই একটা কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে একটা রূপোর পানের ডিবেওয়ালা বাবু। আর এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সুব্রতর নজরে পড়ল একটি মেয়েকে। মাথার ঘোমটা খসে গেছে তার। স্ফীতোদর। ক্লান্ত মুখ। বসা চোখ। এই সমস্ত গোলমাল হৈ-চৈয়ের মধ্যে সে যেন একান্ত একলা। বড়ো বড়ো চোখ দুটোয় আতঙ্ক মাখানো। রুক্ষ সিঁথিতে প্রায়-বিবর্ণ সিঁদুর। ভরা পোয়াতি মেয়েটা। স্থির চোখে এই জটিল জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বোধ হয় চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে। উদ্বেগে যেন বোবা হয়ে গেছে সে। তার পাশে বসে যে দলটি তাস খেলছিল তারা হয়তো বৌটারই কেউ হবে। আবার নাও হতে পারে। দোকানীর কাছে সুব্রত চায়ের দাম জানতে চাইল। আর সে বৌটির দিকে ফিরে তাকালো না। চা খেতে লাগল; যারা তাস খেলছিল তাদের ডাক শুনতে লাগল। আছি—আছি—

নাকে রুমাল চেপে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে একজন পুলিশ-কর্মচারি, মনে হল উঁচু পদের, এদিকে এগিয়ে আসছেন। সুব্রত তাড়াতাড়ি চায়ের ভাঁড়ে মুখ ডোবালো। অফিসার ভদ্রলোকটি চায়ের দোকানের সামনে এসেই দাঁড়ালেন। চলেই যাচ্ছিলেন, কী ভেবে আবার তাকালেন। তারপরে একেবারে সুব্রতর হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—সুব্রত না?

-- দেবু? দুজনেই খানিকটা চুপ করে রইল। তারপর স্মিত মুখে দ্বিতীয় জনা শুরু করলেন—

—চিনতে পারলে তাহলে?

—না চেনারই কথা। বদলেছ। ধড়া-চুড়োয় তো বটেই। আড়েও খানিকটা—

—অপরের জায়গা এন্‌ক্রোচ করছি, এঁ্যা? সম্মিলিত হাসি হল খানিকটা।

—আছ কোথায়?

—মিড্‌না পোহ্‌, সদর। তোমার খবর বলো।

—আছি। আটচল্লিশ—আছি, উনপঞ্চাশ, আছি।

—এসো, ওয়েটিং রুমে চলো, বসা যাক খানিকটা। অনেকদিন পর।

ফার্স্টক্লাশ ওয়েটিং রুমের চাবি থাকে এ, এস. এমের কাছে। তাকে ডাকিয়ে চাবি খুলিয়ে ভেতরে গিয়ে ওরা বসল। তারপর দু পেয়ালা চা আনালো ওরা। কালো পালিশ করা গোল টেবিলে বক-শাদা পিরিচ রাখল। সোনালি পাড়-আঁকা টি-পট থেকে পাতলা পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল ওরা। তারপর কাঠ-বেতের সোফায় হেলান দিয়ে ওরা কথা বলতে লাগল।

—তোমাকে এ বেশে আশা করি নি দেবু।

—কেন? কী আশা করেছিলে?

—চাদর দোলানো অধ্যাপক? তুমি নিজেও বলতে তাই? বলতে না?

—বলতাম! কাকে কাকে বলতাম বলো তো?

—আমাকে বলতে, মঞ্জুশ্রীকে বলতে।

—মজাটা এইখানে তুমি মনে রেখেছ যে বলতাম, মঞ্জুশ্রীর মনেই নেই।

—লেকপোয়েটদের ওপরে থিসিস করবে বলেছিলে।

—এতদিন বাদে নামটা আবার শুনলাম, যেন স্ট্রেঞ্জ নেম্ মনে হচ্ছে।

—সিগারেট দাও একটা। টিনটা টেবিলে রাখল দেবু।

—আমার বিয়ের খবর পেয়েছিলে? তুমি যাও নি, রমেন গিয়েছিল। ভাল কথা ওর খবর কী?

—ঠিক জানি না। নিপুণ পুরনো ভঙ্গিতে দেশলাই কাঠিটা হাওয়া তুলিয়ে নিভিয়ে ফেলল।

—মঞ্জুশ্রীকে তুমি জানতেই। সেমিনারে যখন প্রবন্ধ পড়তাম ও সামনে না থাকলে ভাল লাগত না। এ নিয়ে বন্ধুরা, তুমিও ঠাট্টা করতে। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই আমরা রেজিস্ট্রি করলাম। কন্টাই কলেজে ইংরিজির

লেকচারারের পোস্ট খালি ছিল। এ্যাপ্লাই করলাম। ওরা টেলিগ্রাম করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে। মঞ্জুশ্রীকে নিয়েই কণ্টাই চলে গেলাম। এ পর্যন্ত সব ঠিক যেমন ঘটবার তেমন ঘটল। গোল করে দুটো রিং করল দেবু। সুব্রত ছাইটা ঝেড়ে আড়চোখে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল। নটা-সতেরো।

—যেমন ঘটবার তেমন ঘটল মানে? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

—মানে আমাদের বাড়িতে স্টিফ অপোজিশন প্রথমটা, মঞ্জুশ্রীরা আমাদের স্বজাতি নয়। এবং আভিজাত্যে আমরাই নাকি পাল্লাভারি।

—তাতো বটেই তোমরা হলে নসীরামপুরের মুস্তাফি—

—একজ্যাক্‌টলি। আর মঞ্জুশ্রীর বাবাও ব্যাক করলেন আমার দাদা মায়ের অমত আছে শুনে। সে গোলমালের দিনগুলো রিকালেক্‌ট করতেও ইচ্ছে করে না। মা শয্যা নিয়েছেন। ফাদার বিকেম সোলেন। দাদারা বিদ্রূপ করছেন। বৌদিরা মজা উপভোগ করছেন।

—মঞ্জুশ্রী?

—শুকনো মুখে কফিহাউসে একবার করে দেখা করে আর জানতে চায় আমি কী ভাবছি? কিন্তু ওই যা বললাম যেমন যেমন ঘটবার সবই ঘটল। আমি এসব সত্ত্বেও বিয়ে করলাম। অনুপম আর মীনাক্ষী উইট্‌নেস। সেভেনটিনথ মার্চ, নাইনটিন ফর্টি এইট। এবং মাস দুয়েক বাদে আবার সোনার সংসার ফিলিমের শেষ দৃশ্য। মা মঞ্জুকে আশীর্বাদ করলেন। বাবা সেরিমনিয়াল ফিস্ট দিলেন—তুমি যাও নি। রমেন, ফৈজু, কাকারিয়া সব গিয়েছিল। জমেছিল খুব। কাকারিয়া সেদিন ফুল ফর্মে ছিল। বলদেব-সিরিজের পাঁচটা চুটকি ছেড়েছিল, সিম্পলি সাইড স্প্লিটিং।

—চমৎকার উপসংহার। এর মধ্যে গোলমাল কোথায়?

—সেইটাই পয়েন্ট। দেখতে গেলে কোনো গোলমাল নেই। গরমের ছুটিতে আমরা বাড়ি এসেছিলাম। ছুটি শেষ হতে কলকাতা থেকে আবার কণ্টাই ফিরে গেলাম। এ্যাণ্ড—এ্যাণ্ড কী বলো দিকি?

—কী?

—মঞ্জুশ্রী ইজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড!

—চেঞ্জড মানে?

—তুমি যে মঞ্জুকে জানতে সে আকৃতিতে ছিল রোগা, ফিগারের

প্রশংসা সবাই করতো, স্বভাবে শান্ত, মিক, সোবার, ডোসাইল। মাইনাস চারের চশমা চোখে বই মুখে বসে থাকত। দুমাস সে আমাদের বাড়িতে কাটালো। আমার বৌদিদের কাছে, বোনেদের কাছে। বৌদিদের সঙ্গে ওঠা বসা, দুপুরে ঘুমুনো, সন্ধেয় সামাজিকতা সব সে সমান তালে চালিয়ে গেল। দুমাসে মঞ্জুশ্রী বলব কি সুব্রত যাকে বলে মুটিয়ে গেল। আর কণ্টাইয়ে পৌছানোর দুদিনের মধ্যে সে আমাকে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসবার জন্য তাগিদ দিতে শুরু করল। আমি বই কেতাব ঝেড়েঝুড়ে লেকপোয়েটদের ওপর লেখাটা দাঁড় করাবার জন্য তখন ব্যস্ত। মঞ্জুর বায়না শোনার মতন অবস্থা নেই। ঠিক এমনি সময়ে, বিদিশাকে মনে আছে? বিদিশার সঙ্গে মঞ্জুর দেখা।

—বিদিশা কোথা থেকে এল ?

—বিদিশার বর তখনই কণ্টাইয়ের এস. ডি. ও হয়ে এল। ভগবানের দেওয়া রূপ প্লাস বাবার টাকা প্লাস এম. এ.-র রেজাল্ট সুতরাং আই. এ. এস জামাই পাকড়াতে সুরেশ চৌধুরীর মোটেই বেগ পেতে হয় নি। বিদিশার সঙ্গে মঞ্জুর কিরকম মাখামাখি ছিল জানতে তুমি—

—দেখাটা হল কোথায় ?

—কণ্টাইয়েরই একটা স্কুলে, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন সেরিমণিতে, এ্যাণ্ড মিসেস তলাপাত্র তার মানে বিদিশা গেভ্ অ্যাওয়ে দি প্রাইজেস। বোঝো অবস্থাটা। মঞ্জুশ্রী বাড়ি ফিরে আমাকে নোটিস দিল আমি পরীক্ষায় বসব কিনা তাকে জানিয়ে দেওয়া হোক। সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে টিপে দিতে দিতে দেবু গল্পের উপসংহারে পৌছল—তারপর ডবলিউ. বি. সি, এস—

—তারপর ?

—এখন আমি ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পোলিশ—মিডনাপুর। লেক-পোয়েট বাইশ হাত জলের তলায় চলে গেছে।

হাই তুলল সুব্রত। দেবুর মেদস্নিগ্ধ চিবুকের ভাঁজে কোথাও অতৃপ্তি নেই। লেকপোয়েটদের জন্যে তার মনগড়া দুঃখটা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। তবু দুঃখ করতে হলে যে এইরকম একটা ব্যাপার নিয়েই দুঃখ করতে হয় এ কাণ্ডজ্ঞানটুকু এখনো দেবুর আছে।

—অবশ্য বেশিদিন মিডনাপুরে থাকছি না। বিদিশার বাবাকে মঞ্জু ধরে রেখেছে। সুরেশবাবুকে তুমি জানোই, হোম-মিনিস্টার তো বটেই,

ডাঃ রায়েরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনি—ক্যালকাটায় নাহোক এদিকে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ওখানে বল্‌বো কি তোমাকে ভাই এ্যাসোসিয়েশন নেই।

—তুমি কি আপাতত সেই তদ্বিরেই কলকাতায় এসেছ নাকি ?

—আরে না না, তোমাকে তো আসলে খবরই বলা হয় নি। মঞ্জু তো কলকাতায়। নার্সিং হোমে রয়েছে। মিষ্টি করে একটু হাসল দেবু।—বড়দার তার পেয়ে কাল এসেছি। আমাদের একটা ছেলে হয়েছে সুব্রত।

—কনগ্র্যাচুলেশন। দেবুর মুখ একটু চকচক করছে সুব্রত দেখল।

—ন' পাউণ্ড ওজন হয়েছে ছেলেটার। মঞ্জুর অবস্থা কাহিল। অবশ্য নার্সিং হোমটা ভাল। দৈনিক তিপান্ন টাকা করে নেয় বটে এ্যারেঞ্জমেণ্টস খুব চমৎকার।

—তা এদিকে কোথায় চলেছ ?

—মঞ্জুর বাবাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। উনি তো সেই চোখের অপারেশনের পর ভাল দেখতে পান না। সংবাদটা দেওয়া হবে, আর যদি আসতে চান তো নিয়ে আসবো।

দশটা বাজে-বাজে। এবার উঠতে হবে, সুব্রত ভাবল।—কলকাতার দিকে চলে এসো, একদিন যাওয়া যাবে তোমাদের ওখানে।

—খুব খুশি হবে মঞ্জুশ্রী। নিশ্চয় যাবে। আন্তরিক স্বরেই বলল দেবু। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। ট্রেন এল। দেবু উঠল। এই গাড়িতেই ও যাবে। সুব্রতর হাতের ওপর হাত রেখে একটু ঘনিষ্ঠ হল দেবু। তারপরে, আচ্ছা, বলে দরজার দিকে এগুলো। সুব্রতও ওখান থেকে বেরিয়ে একনম্বর প্ল্যাটফর্মের গেট পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। কফিহাউসের দিনগুলোর জন্য আর সুব্রত কোনো কষ্ট হয় না। দেবুরও হয় না। কিন্তু দেবুর কষ্ট না হওয়াটা যেমন, তার না হওয়াটা ঠিক তেমন নয়। দেবুকে দেখে আর সমর্থন বা অসমর্থনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সুব্রতর ব্যাপারে, তার নিজেরই কাছে, ঠিক বেঠিকের প্রশ্ন আছে। এ কথাটা সুব্রতর বড় বেশি বেশি মনে হল যে সুব্রত ব্যানার্জি হয় ভুল করছে, নয় ঠিক করছে। কিন্তু এই ভুল আর ঠিক-এর ধাক্কা খেতে খেতে সে চলেছে যে এটাই তার কাছে বড় বলে মনে হল। বার্নস-এর কবিতা অনুবাদ করতে করতে অথবা লেকপোয়েটদের ওপর থিসিস বানাতে বানাতে কিসের টানে, কিসের ধাক্কায় দেবু এখানে এসেছে

তা দেবুও জানে না। একদিন কফিহাউসের সবুজ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবু বলত কোয়েস্ট, কোয়েস্টই হল আসল। এ কথাটা সে উচ্চারণ করত যেন দৈবী প্রত্যয় পেয়েছে। আজকেও দেবু কিন্তু খুঁজছেই। ছোট ছোট অহঙ্কারগুলোকে খুঁজছে। ন-পাউণ্ডের নবজাতক, তিপ্পান্ন টাকা দৈনিকের নার্সিং হোম, বিদিশার কলাকৌশল, মিঃ চৌধুরীর ডাঃ রায়ের সঙ্গে দহরম মহবম-—এ সমস্তই সেই ছোট ছোট অহঙ্কারের শিলাফলক। মির্জাপুর আর হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এর কাছে একটা বাড়িতে কারা কোকিল পুষেছিল। দুপুর রোদে ইউনিভার্সিটি থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দেবু। ট্রাম বাস অটোমোবিলের ট্র্যাফিক কলরোলের মাঝখানে কোকিল ডাকলে কেমন শোনায় জানতে গিয়েছিল ওরা।

আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ল সুব্রতর। বিরাট একটা মিছিলের যাত্রী ছিল ওরা। দীর্ঘ পথ ঘুরে ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিছিল জড়ো হয়েছিল। দুটি পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর হাতে একটি ফেস্টুন ছিল। শাদা কাপড়ের ওপর লাল হরফে লেখা ছিল—ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া। দেবু সেই ফেস্টুনটার দিকে তাকিয়ে সুব্রতকে বলেছিল-- সুব্রত ফেস্টুনের লেখাটা পড়লে কেমন মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দেবু বলেছিল—ফ্রি হয়তো একদিন হবে ইণ্ডিয়া কিন্তু হ্যাপি ইউথের দেখা পেতে আমাদের জীবন কেটে যাবে। দেবু আর এ দুঃখটাও করে না নিশ্চয়। দেবু একবারও কি দাঁড়ায় এই ভিড়ের মাঝখানে! নৈহাটী স্টেশনের সামনে কলকাতাগামী বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুব্রত আর একবার এই রাস্তাটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল। ঠিক এই রকম ইচ্ছেই তার করেছে অনেকবার অতীতে। রাস্তাটা সেই রকমই আছে। স্টেশনের উত্তরে রাস্তার ওপাশে নৈহাটী সিনেমার দেওয়ালে কোনো এক চিত্রতারকার বিশাল মুখ তুলি দিয়ে আঁকছে একটা লোক। বাসস্ট্যাণ্ডে হৈ-চৈ। সাইকেল রিকসাদের সমবেত ভেঁপু আর মোড়ের পুলিশের অশ্লীল মুখখিস্তি, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের কোচবক্সে বসে ঢুলুনি—রাস্তাটা সেই একই রকম আছে। বিধুর হোটেলের দোতালা থেকে উৎকলী পাচক ঝিকে ডাকছে। খাবারের দোকানের ছোকরা চাকর চাদরবোঝাই শ্যামাপোকা রাস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। বাসন্তী কেবিনে কাউণ্টারে বসে আছে মাধবদা। এখানেই শেখরের আসবার কথা।

এই সেই রাস্তা। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারির এক দ্বিপ্রহরে একে দেখেছিল সুব্রত। দিনটা ছিল রসিদ আলি-দিবস। জগদ্দল আতপুর কাঁকিনাড়ার মিলগুলোয় হরতাল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। হাজিনগর পর্যন্ত চটকলবাজার হঠাৎ যেন বুনো ঘোড়ার মতো কেশর ফুলিয়ে অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। ক্ষ্যাপা শ্রাবণে যেমন এক একদিন নানাদিক থেকে দলবেঁধে মেঘেরা এসে জোটে, নৈহাটীর এই স্টেশন রোডের তেমাথায় তেমনি সেদিন নানাদিক থেকে মানুষের মিছিল এসে জুটেছিল। হাতে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি। ফেব্রুয়ারির উত্তপ্ত রোদে গনগনে মুখের মেলা। মানুষ আর মানুষ। জয় হিন্দ শব্দ দুটো কখনো মনে হয়েছিল মেঘের ডাক, কখনো মনে হয়েছিল সমুদ্রের ঢেউ। হাজার হাজার গলায় মিলিত উচ্চারণ স্টেশন বিল্ডিঙের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। স্টেশন পাহারা দিচ্ছিল একঝাঁক গোরাসৈন্য। সকালবেলাতেই মিলিটারি ডাকা হয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে সুব্রতর দাউ দাউ করে জ্বলছিল মোকামা এক্সপ্রেস। ব্যাণ্ডেলে জনতা পথরোধ করায় ঘুরপথে নৈহাটী দিয়ে যেতে চেয়েছিল গাড়িটা। সকালবেলাতেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর নিচে আগুন জ্বলছিল দুপুর বিকেল সন্ধে। গুলি চলেছিল বিকেলবেলা। আর গুলি চলার পর কী আশ্চর্য থমথমে হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। তিনজনের লাস পড়েছিল এই তেমাথার ওপরে অনেক রাত অবধি। অনেক রাত অবধি আকাশটা লালচে ছিল জ্বলে যাওয়া মোকামা এক্সপ্রেসের আগুনে। মড়া তিনটের মধ্যে একটা ছিল রিকসাওয়ালা সুখলাল। দরাজ ছাতি চিতিয়ে টান করে সে যখন সাইকেলরিকসা প্যাডল করত মনে হত ঘোড়সওয়ার। সুখলালের মা স্টেশনবারান্দায় বসে বসে একা একা কেঁদেছিল পরের দিন বেলা নটা পর্যন্ত, সুব্রতরা শহিদমিছিলের যোগাড় করে মালা নিয়ে না আসা পর্যন্ত। মালা দেখে সে ভড়কে গিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া—সুখলালের লাস দেখে সুব্রত ভেবেছিল।

(ক্রমশঃ)

কোনো জন্মের রূপকথা

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দূর থেকেও, টিলার মাথায় অবস্থিত বলেই মন্দিরের প্রায়োজ্জ্বল চূড়া দেখা গেল। কোনো দূরগামী গোয়ালিনীর মতো, হঠাৎ গতি স্থির করে একপলকে সূর্যাস্ত দেখে নেওয়ার ঢঙে ফেরান মুখ, সেই কারণেই মাথার কলসির গা ঘুরে রক্তস্রোত হু হু করে ছুটে গেল আকাশে। মন্দিরের চূড়ার দিকে চোখ রেখে দল প্রধান জিজ্ঞাসা করল—পথে বিপদ আর ভয় আছে হে।"

বাকী তিনজন, কোনো কথা না বলে, দল প্রধানের মুখের দিকে চেয়েছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে আবার কেমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলে উঠল—"তোমাদের সাহস আছে তো?"

উচ্চারণ কালে শব্দগুলির স্বরভঙ্গতা দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রতিধ্বনিময় অন্ধকারের ন্যায় মোচড় খেয়ে মিশে গেল গলার মধ্যে।

দ্বিতীয় জন স্পষ্টতই দুবার দুদিকে ঘাড় হেলাল। তৃতীয় জন কেবল উন্মাদের মতই চিৎকার করে হেঁকে উঠল—নিশ্চয়।

তাদের সম্মুখে কুলহীন মজা-নদীর বালি, শ্মশান, অপরিচিত আত্মমগ্ন স্তব্ধ শূন্যতা, ভাঙা দেউল, জীর্ণ প্রাচীর ছিঁড়ে 'সর্পাকৃতির শিশুচারা' একাকী ম্রিয়মান ক্ষিতিঅপতেজমরুৎব্যোম, আর হাহাকার, নির্বাপিত প্রায় হাহাকার কূল ঘিরে।

মন্দির আর মজানদীর মাঝখানে দূর বিস্তারী বহু পথের ব্যবধান, ধুলা আর বেলাশেষের ম্লান আলোয় লাল পাহাড়ের সারি, নুয়ে পড়া বৃক্ষগুলি এতদূর থেকেও বিচ্ছিন্ন করা যায়, যেন প্রশাখায় প্রবাহিত কলকাকলী এখানেও কেঁপে যায়। মন্দির চূড়ায় অপেক্ষারত উৎকণ্ঠা তাদের মুখোমুখি ভাসছিল।

নদীপথ ধরে নেমে যাবার আগে তারা চারজন সহসা যেন শেষবারের মতো পিছনে ফিরে দেখল শ্মশান। শ্মশানের বিদীর্ণ প্রাচীরের পার ধরে গ্রাম্য রাখালিয়া পথ গোখুরের আভাসে অস্থির। গৃহবধূর দল সন্ধ্যার তুলসী

মঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছিল দল বেঁধে, জল উপচে কাঁখালের বেশবাসে অনুপম ময়াল লাবণ্য। গরবিনীর ভারী পিঠ জুড়ে কালো চুলে কুলছাপা মমতায় গৃহস্থ গোয়ালের গন্ধ। কোলে ভরা কলসি, অলঙ্কার শব্দ করছিল। কারুর আড়চোখ চাউনিতে বুকটাল খাওয়া বিস্ময়ের ঘোর, লজ্জা, ভাদরের ভরা ভারি দিকহীন বান, আকাশ ডুবে যায় তার স্রোত কলরোলে—"এ্যাই সেজোনি তোর কোলে আবার নতুন আসছে শোনলাম।"

সেজবউ ঘাড় আনত, কেমন অপটু আতুরে গা টানা গতি, উত্তরে ঘাড় তুলে ভরা মুখে চকিতে খামোখা হাসল বেশ বোঝা গেল। সে হাসির অন্ত নেই, গা গতর ছাপিয়ে ঢলে পড়েছিল শ্মশান নদীময় মাঠ ঘাট একাকার করে নিয়ে। অন্য একজন বয়স্ক অধিকারী অভিজ্ঞ মুখ টান করে কলকল করে উঠল—"দেখিস বাবা, সোহাগখাকী জামাই শালা আমাদেরকেও না ভোলে। তইলে···"

তাদেরই গা ঘেষে যখন হাঁটছিল তারা ভাঙাচোরা চিত্রময় অতীতের ছবি কেঁপে উঠছিল চোখের উপর। আবছায়া জ্যোৎস্নাময় স্মৃতি সেই নির্বাসিতদের বুক কাঁপাচ্ছিল বারবার: গোয়ালের গরুর অবিরাম হা-ম্মা ডাকে পথভোলা বাছুর তালকাটা চারপায়ে ঘরের উষ্ণতায় ডুবে গেল। আকাশের মতো দু পাশের ঘাড় কাত করা চালে মেঘ আর বুনো পাখি, বকের পাখনায় ভাসমান আশ্বিন কার্ত্তিকের রোদ টান টান নরম বেলা। শালুক বিলে চাপা আলোর গন্ধে পোক ওঠা গোড়ের মৌতাত। দিনগুলো রাতগুলো যেন আঁচলে জড়ান কড়ি খেলে খেলেই সময় পার করে। ···শঙ্খধ্বনিতে স্বামীরা গৃহমুখী, তেলের আলোয় বউ-এর ফর্সা মাজা মুখ যেন প্রতিমার মতো ডেকে নেয় তাদের। পথ ঘাটজুড়ে নামা অন্ধকারে কোনো রূপকথার ব্যস্ততা: দাওয়ায় লণ্ঠনের অপ্রাকৃতিক পরিসর মেপে সরে দাঁড়ান অন্ধকার মেটে দেওয়ালের ছায়ায় শিশু কণ্ঠে "তাপ্পর" মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ; বৃদ্ধার দু চোখে অহঙ্কার চক চক করে জ্বলে, কুলবধু অলঙ্কার বাজিয়ে উঠোন পার হয়, পায়ে আলতা, গায়ে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর বাহার ফেটে পড়ে।

সামনের দুস্তর পথভেদ জুড়ে অতঃপর স্থুরু হলো গ্রামগল্পের চির তরুণ পাঠ। প্রেম আর প্রয়োজনের কাহিনীতে গড়েওঠা সান্ধ্যক্ষণ। চন্দ্র কোলাহলের যত রাত প্রস্তুত হয় একে একে। দিগন্তের কাঁচা মাঠ পার হয়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্যত উজ্জ্বল শস্যরাশির মাঝ বরাবর অনন্ত মেঠোপথ জুড়ে

রাখাল বাঁশরীর শুদ্ধ রাগে আকুল হয়ে যায় সারা গ্রাম, শস্য ক্ষেত্র, ফসলের গায়ে হেলে পড়া লাল বাতাস। এই পথ ধরে গোধূলি নিয়ত পরিবর্তন নিয়ে আসে, সেইখানেই গৃহস্থের গল্পরাশি। আঁচলের জলে সিক্ত পথ বেয়ে কোনো গ্রাম্যবালক হারান রূপকথার খোঁজে নদী শ্মশান জনপথ ভুলে এক অপূর্ব রূপকথার আলোয় চোখ মেলে ধরে।

এমন সময় আচমকা দলপ্রধানই বলে উঠল—আজকে আর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না, আমরা অইখানের শ্মশান মন্দিরে আশ্রয় নেব।

বাদবাকী তিনজনও বেশ ক্লান্ত, কেমন অলস ঘুম ঘুম ভাবে দু চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছিল, সেই কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। আর না সামনে এগিয়ে ডানদিকের অপেক্ষাকৃত সরু পথ ধরে পোড়া মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়াল। ফাটা শ্যাওলা ঢাকা কাল হুমড়ি খেয়ে পড়া চার দেওয়ালের গায়ে মারাত্মক নীল জ্যোৎস্না হেলেছিল, গায়ে ছোটবড় শিশু চারার জট বাঁধা ছায়ায় বাঁকা চিড়ের ফাঁক দিয়ে এলোমেলো বাতাস শিস কাটছিল। কখনো জোরে, কখনো ঝিমধরা অবসাদগ্রস্ত। চাপা একধরনের ভঙ্গিতে কেউ যেন বোবা কান্না ছিটিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল এই শ্মশানের চারপাশে। বিভিন্ন দিক থেকে উঠে দাঁড়ান প্রাচীন ঠাণ্ডা কবন্ধ বুকের মতো চারটে ভাঙা চোরা দেওয়ালের মাঝে বসেছিল তারা। দক্ষিণ প্রান্তের একটা ভাঙা হাটকরা নিচু দরজা দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল সামনে। তার আলোয় সবারই চোখে পড়ল ক টুকরো পোড়া কাঠ, কাঁটাগাছ, খুরি কলসির কানা, ভাঙা কাঁচের চুড়ি, একপাশে জড় করা কিছু ধবল নদীর শামুক, শুকনো বট পাতা ঝরে পড়ছিল।

পিছনে ধ্বসনামা খিলানের ছায়া। মশা আর জোনাকীর মাঝখানে তারা বসেছিল গোল হয়ে। দূরের তালগাছে শকুনের কান্না আর মাঠে শিয়াল কুকুরের ডাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ছিল না যাতে তারা সাহস ফিরে পায়। চতুর্দিকেই যেন সেই অনাদি অনন্ত "দক্ষিনের দরজায় যেয়ো না" গোছের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা।

মাথার উপরে মন্দিরের হাঁ-করা মুখ জুড়ে পরিব্যাপ্ত কঠিন আকাশ, নক্ষত্রের ম্লানতম আলোয় চাঁদ খেলা করছিল, জ্যোৎস্না প্লাবিত নীল বাতাস-বাজান নিশুতি কোলাহল। পোড়ো অন্ধকারে তিনজনের মুখ অস্পষ্ট আলোয় জ্বলছিল। কালো সুগঠিত কোনো পাশ, একচোখের শাদা পাতা, কপালে

শিরা, ভাঁজ, ঝুঁকে পড়া বাঁকানো চোয়াল, চিবুক, কণ্ঠার মোটা শিরা আবছায়া ছিন্নভিন্ন ছবির মতো ভাসছিল শূন্যে।

—এ একরকম ভালই হলো, হাঁটতে ভালো লাগছিল না আর। একজন মুখের ঘাম মুছতে মুছতে অস্ফুট কাতরক্তি করল হঠাৎ।

—যা বলেছিস। সারা গায়ে আগুন জ্বলছে এখন, স্নান করে আসি নদীতে। বলে অন্যজনা তার শিরা টানা হাত তুলল মাথায়।

তখন তাদের চারপাশে মাঠ ঘাট, শ্মশান, ছায়াঘেরা পথ, জ্বলা-জোনাকী, মশার একঘেঁয়ে কান্নার শব্দে ঘুরছিল। নীল জ্যোৎস্না। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠা বোবা বাতাসে হাহাকার, হাহাকার ব্যাপ্ত চারিধারে সেই অপ্রাকৃতিক গল্প বিস্ময়ের অবরোধ, সব পথে যেয়ো কিন্তু দক্ষিন নিষিদ্ধ।

অথচ তাদেরই একজন দক্ষিণের নীল চৌকাঠ পার হয়ে নদী পথে নেমে গেল একা একা।

নদী তীরের দৃশ্যের উপর বড় ঐশ্বর্যময় জ্যোৎস্না টাল খেয়ে পড়েছিল তখন। বিশাল বৃক্ষসারি, মরাগুঁড়ি, তালবন অলৌকিক বিশাল আকাশের নিচে স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠছিল ধীরে ধীরে। কেমন অলস চোখ টান করা কতকগুলো অতিক্লান্ত ভারি শরীরের মতো। বন চাঁপার উগ্র গন্ধে বিস্ফারিত বাতাসে শ্বাস নেবার সময় মানুষটার সারা বুক খাঁ খাঁ করছিল থেকে থেকে। ধীর পরিশ্রান্ত ঢঙে টলে টলে নদীর উপর দিয়ে হাঁটছিল সে। পা বসে যাচ্ছিল মিহি বালির মধ্যে। বেশ কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে, তবু কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ তাকে নিশি পাওয়া মানুষের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সামনে। বুঝি কোন আদ্দিকালের ঘুম ভাঙার পর চোখ খুলেই চারপাশ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল নিমেষে। সাতরাজ্যির রঙ-তামাশা ঘন হয়ে জমল দু চোখ জুড়ে। মন্ত্রপূত জলে মায়া ঢেলে দিয়েছিল নজর ভরে।

শরীর আর বইছিল না তার, হাতপাগুলো সব খুলে পড়ছিল যন্ত্রণাতে, অবসাদে মাথা বুকের মাঝখানে ঝুলে পড়ছিল। ঘাড় তুলে চাইবার সাধ্যটুকুও লোপ পেয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। তবু একটা নেশা ছিল যেন হাঁটার মধ্যে। অপ্রাকৃতিক দৃশ্যের গোপনতম মায়ার স্বাদ নিবিড় হয়ে মিশে যাচ্ছিল স্নায়ুর সঙ্গে। বড় ভয়ানক সে জ্যোৎস্নাধীন প্রকৃতি, আলো ভাসা মাঠ, ফল-ফসলের বাতাস তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে নিয়েছিল সেই সময়। জলা,

ঝোপ, শ্মশান, গ্রাম, মরাগুড়ি, পুরাতন বট, ভাঙ্গা বিবর্ণ দেওয়ালের গা ধরে ঝুলে পড়া ফাঁপা মেঘখণ্ড, চাঁদ, ঝড়ো মগ্ন বালিয়াড়ির টানে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মনপ্রাণ।

বিশ্বসংসার তখন স্বপ্নময় অপলক চোখ খুলে সেই মানুষটাকেই দেখছিল কেবল। জন্মের পূর্বক্ষণের যাবতীয় বিস্ময়, আশঙ্কা, যন্ত্রনা, প্রেম, মোহ, এক একাকার হয়ে জমেছিল তার চোখে। আর সেই হতবাক্ দৃষ্টির উপর দিয়েই সে দৃশ্য থেকে দৃশ্যের গোপনতম উৎসের দিকে চলে যায় একা একা। শরীর ছেড়ে মনটাই যেন ছড়িয়ে পড়েছিল কাশবন, কেন্দুগাছ, আকন্দ মাদার ঝোপের আনাচে কানাচে, ঘুমন্ত পাখীর পালকে, শরীরের রঙে।

বালির উপর পা টেনে শ্লথ অবসন্ন বেহুঁশের মতো নেমে যাচ্ছিল সে। সম্মুখে পশ্চাতে সেই অলৌকিক আলোমাজা পটভূমি জুড়ে মধ্য নিশীথের চাঁদ আরো বেশি অপ্রাকৃতিক হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। ঢেউএর শিথিল জলরেখায় পুঞ্জপুঞ্জ আকাশ, মেঘ ভেঙে পড়েছিল। দু চোখ টান করে টলোমলে অবশ গতিতে সেদিকেই চলে যাচ্ছিল মানুষটা। দু পা পাথরের মতো শক্ত ভার ভার, ঘাম আর শুকনো বালির আঁচড়ে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে পড়ছিল, কপালের মোটা নীল শিরা উঠে এসেছিল সামনে। কাঁধের কাপড় দিয়ে হাতমুখের ঘাম মুছল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নদীপারের ডালপালা পাতার ফাঁকে বুনোফল চকচক করছিল পাতলা কাঁচের মতো অবিকল। মনে হচ্ছিল দামাল হাওয়ার এক টানে চুরমার হয়ে পড়বে এখুনি। নদীবক্ষে পড়ে থাকা কখও মেটে রঙের পুরনো ফাটা হাড়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার।

ফুলে ফুলে বড় অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল স্তূপাকার আকন্দের ঝোপঝাড়। মধ্যিখানে প্রায় ন্যাড়া কল্কে গাছের একদিক গুচ্ছের হলুদ ফুলে আগুনের মতো দপদপ করে উঠছিল। কোথায় রাতচরা পাখীর ডাকে চমকে বোকা মুখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না তার। কেবল শব্দটা টাল খেয়ে ডুবে গেল অন্ধকারে। ডান দিকে ঝুপসি শাল সেগুন বনের মাথায় বড় তারাগুলো কিছুটা আরো হেলে পড়ে এলিয়ে নদীর দিকে পাশ ফিরে ছিল। মেঘের ছায়ায় ডুবে যাওয়া পরপারের নিঃশব্দ অন্ধকার ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর শিরশির করে উঠছিল বারবার।

একটু এগিয়ে বাঁ দিকে একটা ছোট্ট বালির স্তূপ। তারই পাড় ঘেঁষে

অপরিসর অতল দহের কালো জলে তারা, আকাশের নীল ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল। জলে নামা দুধ সাদা শরীরের মতই একফালি মেঘ ঝুঁকে ছিল মাথার উপরে। ছোট বড় নুড়ি, ভারি পাথর ছড়ান নদীপারের ধু ধু মাঠে, ঢ্যাঙ্গা সারিসারি তালগাছের গায়ে জড়ান ছায়া ছায়া অন্ধকারে নির্বাক থমথমে হয়ে উঠছিল সব দিক।

ঘাটের পাশে এক খণ্ড বড় পাথরের উপর বসে পড়ল সে, নিঃশ্বাস নিল টেনে টেনে, ভিজে হাওয়ার ঝাপটায় বুঝি হাহাকার করে উঠল তার বুক। ঘাম শুকিয়ে নুনবালি জমা আঠালো কপাল ঘসল ডানহাত তুলে। এক দৃষ্টিতে জ্যোৎস্না ভেদ করে চেয়েছিল আদুর বুক খোলা ছায়াময় তাজা নরম মাঠের দিকে। জনমানুষ ছিল না কোথাও। মাঠ বাদাড় ঠেলে ছুটে আসা চাপা গন্ধে সারা বুক কেমন উদাস খালি মনে হয় তার। দমকা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে বুক চিরে। বোবার মতো সামনের খই ফোটা চাঁদের আলোয় বুকের অতলে ডুব দিয়েও সহসা কূল পায় না সে।

পিছনের লম্বা শরবন সেই বাতাসে আকুল হয়ে দুলছিল আপন খেয়ালে। শাঁই শাঁই শব্দটাই কেবল বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছিল একটানা। তার চওড়া মোটা হাড়ের দু হাত প্রার্থনার ঢঙে বুকের উপর আড়াআড়ি নামান। রুপোলি অজস্র পালকের মতো শরবন, কাশপাতা জলজল করছিল চোখের সামনে। অবিকল আশ্চর্য শাদা হাঁস যেন দু ডানা প্রসারিত করে শুয়েছিল বালির উপরে, মেলে ধরা পালকের রঙ নিশুতি থমথমে জ্যোৎস্নায় কাঁপছিল থরথর করে।

আচমকা কি এক চাপা শব্দে ভয়ে হিম হয়ে গেল সারা দেহের রক্ত। ঠাণ্ডা অনুভূতিতে জমে শক্ত হয়ে উঠল মস্ত ছাতিটা। সন্দিগ্ধ আশঙ্কিত চোখ ঘুরিয়ে জনমানুষ তো দূরের কথা কোনো রাতচরা জন্তুর ছায়াটুকুও নজরে পড়ল না তার। খালি বালির উপর গাঙ-শালিখের পায়ের দাগ এলোমেলো পাক্ খেয়ে দূরের জ্যোৎস্নায় ডুবে গেছে দেখল। আতঙ্কে পাতলা পাতার মতো নড়ে উঠল পাঁজরের ভিতরটা। বালির উপর গুঁড়ি মেরে কুঁজো জানোয়ারের মতো হাঁটু ঘসড়ে ঘসড়ে শরবনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সে। বেশ কিছুক্ষণ ঠায় শরীর টান করে বোঝার চেষ্টা করল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা মিহি গলায় গোঙ্গানীর মতো রুদ্ধস্বর হাওয়ায় জড়িয়ে কেঁপে উঠল ঠিক দু কানের পাশে। মেয়েলি কান্নার মতো একঘেয়ে আর একটানা

স্বর তুলে কঁকিয়ে উঠছিল কেউ। ঠিক বুকের কাছে উঁচু ঘন শরবনের পিছনে যেন কেউ মরণ যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিল পড়ে পড়ে। আরো ঝুঁকে কুঁজো হয়ে দু হাতে সাবধানে শরপাতা সরিয়ে যা চোখে পড়ল তাতে বুকের জমাট রক্ত লাফিয়ে উঠে এল মাথায়। আতঙ্কে বিলকুল থ গেল মেরে মানুষটা দশ হাত হয় কি না হয়, এমনি দূরত্বে নরম বালির উপর মুখ গুঁজরে পড়ে থাকা সোমত্থ মেয়েমানুষকে কুঁকড়ে আর্তনাদ করতে দেখলে কার বুকের রক্ত না জল হয়ে যায়। আদুর গা হাত পা। তেলচিটে ছেঁড়া নোংরা কাপড়টুকু একটা গাছের নিচু ডালে আটকে ঝুলছিল। তার ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল মুখের একপাশ, টান করা দুপা ধনুকের মতো দুমড়ে বেঁকে ছিল কঠিন হয়ে। কোথায় ডালের পিছন থেকে রাত-চরা পাখি ডাকছিল কুপ কু···প করে। আর কোনো শব্দ ছিল না আশে পাশে।

ডানহাতের মুঠোতে গুচ্ছের শরপাতা মুচড়ে ধরে টেনে টেনে দম ফেলল সে, বুকের মাঝখানে চাপা আতঙ্কে থম মেরে উঠেছিল তখন। শরগাছের বেড়া পার হয়ে দু চোখ পাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। মরে যায় নি তো রে বাবা। কিন্তু না মরে নি। পায়ে পায়ে একদম শিয়রের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মানুষটা, ফ্যালফ্যাল করে আহাম্মকের মতো চেয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। মরে নি, ক্লান্ত শিথিল ভারি শরীরটা কিসের যন্ত্রনায় টান করে পড়েছিল পায়ের তলায়। দু হাত মাথার পাশে ছড়ান, বিকৃত মুখে চাঁদের আলো পড়ে ক ফোঁটা ঘাম চিকচিক করছিল, বিস্ফারিত দু চোখের পাতা রুদ্ধশ্বাস চাউনি মেলে কাঁপছিল, আর দু কষ ভেসে গড়ান লালার সঙ্গে এক খামচা বালি মাখামাখি হয়ে ছিল গালের একদিকে। তামাটে কচি ছোট্ট চিকন কপালের উপর রুক্ষ চুল উড়ছিল, বালির উপর মুচড়ে ধরা ডান হাতে আঁচড় কাটছিল। তাকে দেখতে পেয়েই কেঁপে ওঠা দু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আঁ···আঁ···করে উঠল কয়েকবার। এক নিমেষে জলের মতই স্বচ্ছ হয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটাই।

—ওমা, ইকি কাণ্ড রে বাবা। এই আস্থায় পথে বার হয় মানুষে, এ্যাঁ, এই এখন তখন হাল শরীরের।

বলে চাপা স্বরে ধমকে ঝুঁকে পড়ে যেন বোবাটে মেরে গেল আবার। সর্বনাশ। বিলকুল সাদা ফাঁকা চওড়া সিঁথিতে সিঁদুরের ছিটে ফোঁটা নেই কোথাও।

—বিয়েও হয় নি, বাপরে।

বিস্ময়ে ভয়ে মাঝপথেই কেঁপে উঠল স্বর। আর জবাবে মেয়েটার যন্ত্রণা আচ্ছন্ন ঠোঁটের এককোণ বেঁকে কেমন একফালি শেষরাত্তিরের চাঁদের মতো নিস্তেজ হাসি জ্বলে উঠল একবার। ক্রমশ নীল হয়ে উঠতে লাগল সারা মুখের রঙ, বালিতে ছড়ান ডানহাত আড়ষ্ট ঢঙে টলে পড়ল ঘাড়ের পাশে, বড় বড় ভাষাহীন ঢলঢলে দুচোখ ঘিরে শ্রাবণের বাড়বাড়ন্ত মেঘের মতই অলস গভীর হয়ে উঠেছিল ডাগর কালো তারা দুখানি। শ্বাসরোধকারী সেই জন্ম সময়ের এক পরমাশ্চর্য অপেক্ষায় মেয়েটার কোমরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা মানুষটার দু-হাতের সব পেশী শক্ত কঠিন হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। রক্ত-মাংসের অন্ধকার থেকে উঠে আসা মূলকে আলোর সামনে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার উদ্যোগে সর্বশরীর শিটিয়ে উঠেছিল তার।

পূর্বাকাশে তাজা একফালি আলোর ফিনকিতে ভোররাতের বড় তারাটা দপদপ করছিল দুজনের মুখোমুখি নেমে এসে। ঝলকে ঝলকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া শিরশির করছিল শরীরের টানাটান চামড়ার পিঠে। বিস্ময়কর কোনো উত্তেজনায় দু-হাত সামনে মেলে মানুষটা সময় গুনছিল বসে বসে। আর জ্যোৎস্নাময় নদীতীর, নক্ষত্র সাজান পরিচ্ছন্ন আকাশ, মাঠ থেকে ঝাঁপ দেওয়া ফসলের গন্ধ, অস্ফুট হাওয়ার শব্দ, বালির বুকে গা-জাগা সবুজ রোদ্দুরে গ্রামগল্পের পরিচিত বিস্ময়বোধে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে এসেছিল। অপেক্ষমান ডানার গন্ধে আচ্ছন্ন বাতাসে বসে থেকে আচমকাই তার মনে পড়ল, কোথাকার পালাগানের আসরে এক পাগলা কবিয়ালের ছড়ায় এমনি একটা কথাই শুনেছিল সে, যে এই বাতাসই নাকি সমস্ত ফুলের কুঁড়ি খুলে ফেলার জন্যে ডালে ডালে কাঁপাতে থাকে তাদের।

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প

সুনীল সেন

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প সম্পর্কে অধুনা যে আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তা স্বাভাবিক। মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা শিল্প এবং উৎপাদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাস্তবকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক অনুসন্ধান পরিত্যাজ্য; মনে হয় অনুসন্ধানের ফোকাস্ পরিবর্তনের প্রয়োজন রাখে। প্রারম্ভে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে এই প্রশ্নের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের যুগে প্রতিরক্ষা শিল্প বৃহদায়তন হতে পারে নি কেন? স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রতিরক্ষা শিল্প কোন পথে অগ্রসর হয়েছে এবং কতটা প্রসার লাভ করেছে? প্রতিরক্ষা শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে কি? এই লক্ষ্য পূরণে বাধা কি, সমস্যা কি? উত্থাপিত প্রশ্নগুলির আলোচনায় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হয়।

প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিষ্ঠা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিষ্ঠা; এই পর্বেই স্থাপিত হয় ফতেগড়ের গান-ক্যারেজ কারখানা (১৮১৮) এবং দমদম ও কাশীপুরের অর্ডন্যান্স কারখানা (১৮৪৬)। বিংশ শতকের গোড়ায় তেরটি যুদ্ধাস্ত্র নির্মানের কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই কারখানাগুলিতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা প্রায় তের হাজার। ১৯০৭ সালে ইছাপুর (ইসাপুর) কারখানায় রাইফেল নির্মাণের শুরু।

বোধহয় বলা বাহুল্য, প্রতিরক্ষা শিল্প তখন অতি ক্ষুদ্রায়তন থাকে; প্রতি বৎসর 'অর্ডিন্যান্স স্টোরস' খাতে ভারতের মূল্যবান স্টার্লিং বিলাতে জমা হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের মারফত 'অর্ডিন্যান্স স্টোরস' আমদানি করতে হতো। অর্থনীতিবিদগণ এই বিরাট অর্থনৈতিক 'ড্রেইন'-এর অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, ভারতের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থার উপর কি প্রচণ্ড চাপ এর ফলে

সৃষ্টি হয়েছিল। অর্ডন্যান্স কারখানার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এবং মেশিনগান, কার্টরিজ, বন্দুক বিলাত থেকে আমদানি হতো। ভারত ছিল বিলাতী অস্ত্রনির্মাণ কারখানার বিরাট বাজার। এই অর্থনৈতিক 'ড্রেইন'-এর সামান্য হদিস মেলে 'অর্ডন্যান্স স্টোরস' বাবদ যে টাকা বিলাতে পাঠানো হতো, তার হিসাব থেকে। এই হিসাব এইরকম :

বৎসর	পাউণ্ডে মূল্য
১৮৮৩-৮৪	১৬৩,৯০২
১৮৯৯-১৯০০	১৮৯,৮৩৪
১৯০৪-০৫	১,১৪২,৫৪৬
১৯০৯-১০	২৪৯,২২৫
১৯১৩-১৪	৫০০,৩২৮

(Accounts of the Home Treasury থেকে সংগৃহীত)

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত মজবুত করে এই বিরাট ব্যয়, স্টার্লিং-এর অপচয় কমানোর (বন্ধের নয়) প্রচেষ্টা হলো না কেন? অর্ডন্যান্স বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই বিষয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁদের জোর সুপারিশের ফলেই ভারত-সচিব কাশীপুরে ইস্পাত উৎপাদনের এবং রাইফেল নির্মাণের ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কাশীপুরেই সর্বপ্রথম ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরীক্ষা সাফল্য অর্জন করেছিল। সাময়িক প্রয়োজনের বাস্তব সমস্যা শাসকশ্রেণী একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

যুদ্ধের ধাক্কা

সাময়িক প্রয়োজন উপেক্ষা করা সত্যই বড় কঠিন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে এই প্রয়োজনের মোকাবিলা করতে হলো। ভারতে ভারি শিল্পের অনগ্রসরতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বিদেশের উপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা—এই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে শাসকশ্রেণী 'লাস্সা ফেয়ার' বা 'যদৃচ্ছা চলা' নীতিতে অবিচল থাকতে পারলেন না। কবে ব্যক্তিগত মালিকানায় উদ্যোগে

ভারি শিল্প এবং প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে উঠবে, তার জন্য সমস্যার সময় বা সুযোগ আর ছিল না। এই প্রসঙ্গে লেনিনের সুবিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে :

> "সব যুধ্যমান রাষ্ট্রই এক নাগাড়ে কতকগুলি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার প্রায় প্রত্যেকটিই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, এমন ধরনের সব সংস্থা সৃষ্টি ও লালন করে যাতে সরকারের প্রতিনিধিরা অংশীদার, যার উপর জারি থাকে সরকারি তত্ত্বাবধান।"
>
> (সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ভারত সরকার অর্ডন্যান্স কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় ইছাপুরের মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টিল ফ্যাক্টরি, অধুনা যে কারখানা আরো বৃহদায়তন হয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের গৌরব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বেও দেখা গেল এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সরকার প্রতিরক্ষা শিল্প গড়বার কাজে "কিছু না করবার"-নীতিতে অবিচল রইলেন ; তখনো ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগের উপর তাঁদের প্রচণ্ড আশা। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামরিক প্রয়োজন পুরণের জন্য সচেষ্ট হলেন। অর্ডন্যান্স কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্য চার কোটি টাকা বরাদ্দ হলো : জামালপুর, প্যারেল, কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া প্রভৃতি রেলওয়ে ওয়ার্কশপগুলিকে প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে লাগানো হলো (ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন, অক্টোবর, ১৯৪১)। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান কারখানা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে প্রথম বিমান তৈরি করল। অনেকের হয়তো মনে পড়বে, সেদিন অনেক ফলাও করে এই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে স্বভাবতই ভারত সরকারকে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্পে ভারতের অগ্রগতির মূল্যায়নে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পটভূমি স্মরণীয় ; মনে হয় এই পটভূমি পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি স্তম্ভ : এক, বিদেশের উপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে এই শিল্প হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং দুই, এই শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রধান

ভূমিকা পালন করবে। ব্যক্তিগত মালিকানার ধ্বজাধারীরা যাই বলুন, তাদের হাতে এই শিল্প সঁপে দেওয়া বিপজ্জনক। আমেরিকা ও ইউরোপের দৈত্যাকায় কারখানা Du Ponts, Krupps, Vickers, Schneider প্রভৃতির স্থান ভারতে নেই। ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে এই কারখানা-মালিকদের চক্র যবনিকার আড়ালে কি ভাবে অবিরাম যুদ্ধচক্রান্ত চালিয়ে গেছে। পণ্ডিত নেহেরু এই চক্রের কার্যকলাপের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

> "এরা হচ্ছে নরহত্যার পাইকারি ব্যবসাদার ; এদের মৃত্যুবর্ষী যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে তাকেই বেচতে রাজী।···বিভিন্ন দেশের এই রণসজ্জা নির্মানের কারখানাগুলোর পরস্পরেরর মধ্যে নিবিড় যোগ আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা।···এদের গুপ্তচরেরা প্রত্যেক দেশের উর্ধ্বতন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করে।"
>
> (বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ)

আমাদের সৌভাগ্য, ভারতে এই চক্র গড়ে উঠতে পারে নি ; ভারতের শিল্পনীতি (ইণ্ডাসষ্ট্রিয়াল পলিসি রিজোলিউসন, এপ্রিল, ১৯৫৬) এদের পথে বাধা। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগে আমাদের দেশে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বৃহদায়তন কারখানা স্থাপিত হতে পারবে না ; প্রতিরক্ষা শিল্প রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে উঠছে এবং উঠবে।

অবিচলিত আস্থা নিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে ভারত সরকারের উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। ১৯৬০-৬১ সালে অর্ডন্যান্স কারখানা-গুলিতে তৈরি বিবিধ স্টোর্সের মূল্য দাঁড়ায় ৩০.৩৬ কোটি টাকা ; আগের বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ২৫.১৪ কোটি টাকা। অর্ডন্যান্স কারখানাগুলি তৈরি করে বন্দুক, মেশিনগান, ভারি মর্টার, বোমা, প্যারাস্যুট, বস্ত্রদ্রব্য ইত্যাদি ; বিবিধ যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের Machine-tool Proto-type Factory এবং ব্যাঙ্গালোরের কাছে স্থাপিত ভারত ইলেকট্রনিকস্ কারখানায় ; বিমান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ব্যাঙ্গালোরের কারখানা। প্রযুক্তি-বিদ্যায় পুরানো দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশে গড়ে উঠছে দক্ষ শ্রমিকের বাহিনী, যার গুরুত্ব সময়ে প্রতিভাত হবে। প্রতিরক্ষা শিল্পের অগ্রগতির ফলে ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে যে 'অর্ডন্যান্স স্টোর্স' আমদানি হতো,

তার পরিমাণ কমেছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচেছে। বিগত পাঁচ বৎসরের 'অর্ডন্যান্স স্টোর্স' আমদানির হিসাব নিচে দেওয়া হলো :

বৎসর	লক্ষ টাকা
১৯৫৭	১৮,৫৩
১৯৫৮	৪,০২
১৯৫৯	৭৪
১৯৬০	৩,২৭
১৯৬১	৩৫

(India, 1962 থেকে সংগৃহীত)

এই সব হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর তার ফলে বিলাতের অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলির পক্ষে লোভনীয় পুরনো দিনের ভারতীয় বাজার সংকুচিত হয়েছে। তাই কি "বিতাড়িত" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন বিশেষ মহলের বিশেষ আক্রমণের কেন্দ্র? ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বলে যে প্রচার শোনা গেছে তা মুখ্যতঃ অজ্ঞতাপ্রসূত কিংবা অভিসন্ধিমূলক বলেই মনে হয়। বাস্তবকে অতিরঞ্জন বা বিকৃত না করে আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় ১৪ই নভেম্বরের বক্তৃতায় (যে বক্তৃতা নানা কারণে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে) বলেছেন :

> "We did build up, I think fairly adequately, our armament industry, not as much as we could have liked. It was being progressed.···It has grown about 500 per cent."

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

বলা বাহুল্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে আমাদের প্রতিরক্ষা শিল্পের এখনো অনেক বাকী। কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে, ১৯৪৭ সালের তুলনায় প্রতিরক্ষা শিল্প অনেক বেশি শক্তিশালী ; বর্তমানে ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে ভারি শিল্পের ভিত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত। ভারি শিল্পের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পের আরো অগ্রগতির সম্ভাবনা আজ

বাস্তব, তা ভাববিলাস নয়। বিশেষ মহলের অবিশ্রান্ত প্রচারের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য বোঝা কঠিন নয়। এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ভারতের শিল্পনীতি, যা প্রতিরক্ষা শিল্পকে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প হিসাবে বিকশিত করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করার নীতির উপর দণ্ডায়মান। বহুনিন্দিত কৃষ্ণ মেননের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রিয় হলেও, বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> "There are those who cavil against planning not only for ideological reasons, but against our development measures. They light heartedly argue that the resources and the strength of the nation have gone into social services or industrial development and thus starved defence resources ! We have to tell our people, without timidity, that defence, even into goods, are less available from its own resources to a nation and that external resources are less patent in serviceability if we are not progressive in production and development."

(লিঙ্ক, ২৭শে জানুয়ারি)

দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষ করে ভারি শিল্পের বিকাশের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করা সম্ভব, সেই পরিকল্পনাকে কবরস্থ করলে প্রতিরক্ষা শিল্পের পঙ্গু হয়ে থাকবারই সম্ভাবনা। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বোধহয় এই শিক্ষাই দেয়।

ডাক বাংলার ডায়রি

সুবচনী

লাল মাটি

'মালপত্তর সব সাবধান। চোর এই কামরাতেই আছে।'—

পোস্টাপিসে দশটা-পাঁচটা কলম পিষে, দু জায়গায় ছেলে পড়িয়ে, বৈঠকখানার বাজারে বাস্তুপুজোর বাজার সেরে স্টেশনে পা দিতেই শেষ লোকাল ছেড়ে যাওয়ায় সাতাশ-আটাশ বছরের যে ছোকরাটি অগত্যা আমাদের ট্রেণে উঠে পড়ে ঘুমে ঢুলছিল, হঠাৎ চেকারবাবুর গলা শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'অন্যমনস্ক হয়েছেন কি ঐ য্-যাঃ হয়ে যাবে'—চেকারের বক্তৃতা শুনে সবাই একটু সামলে-সুমলে বসল। ওপরের বাঙ্কে এক মোটা ভদ্রলোক তুড়ি দিয়ে সশব্দে হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'এর নাম গয়া প্যাসেঞ্জার।'

ট্রেণে ভিড় ছিল না। বেঞ্চির ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত্তিরে মাঝরাস্তার কোনো স্টেশনে লোকজনের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কামরার মধ্যে গিজগিজ করছে লোক।

ট্রেণটা নড়ে উঠতেই দরজা খুলে ভেতরে লাফ দিয়ে পড়ল এক বৈরাগী! বয়েস বেশি নয়। কুচকুচে কালো দড়িপাকানো চেহারা। মুখের মধ্যে চকচক ঝকঝক করছে এক জোড়া চোখ আর দু পাটি দাঁত। কিছুক্ষণ ধরে সমানে সে গজগজ করতে লাগল। আজকালকার ভদ্রলোকদেরও বলিহারি। এতক্ষণ সে পাশের কামরাতেই ছিল, সঙ্গে টিকিট না থাকায় চেকার ডেকে প্যাসেঞ্জাররা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে, তাকে ষোল আনা পয়সা খামোখা দণ্ড দিতে হলো। এ অন্যায় ধর্মে সইবে না, কিছুতেই নয়। লোকগুলো ওলাউঠো হয়ে মরবে।

চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। হঠাৎ একতারার আওয়াজ শুনে তাকালাম।

বৈরাগীর চোখদুটো বন্ধ। ভয় দেখাবার আঙুলটা দিয়ে তারের ওপর সে এখন মিষ্টি সুর তুলছে আর সেইসঙ্গে তন্ময় হয়ে গাইছে—

হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় কই ?
কোথা কে দিবানিশি
আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।

হরি, সকালবেলায় মন করিলাম
জপিব এখন,
গোপাল এসে কোলে বসে
জুড়িল ক্রন্দন।···

দুপুরবেলায় স্নান করে যখন
উঠিলাম ডাঙায়
নাগরীগণ কলসী কাঁখে
সম্মুখে দাঁড়ায়।
দেখে ঐ রূপের বর্ণ
হয়ে জ্ঞানশূন্য
আপনা আপনি ভুলে রই।

সন্ধ্যেবেলা আচমন করে
গিন্নি এসে গর্জন করে···
ক্রমে ক্রমে রাত্রি হলো
দ্বিতীয় প্রহর।
ক্ষুধার চোটে অঙ্গে ধরে কাঁপুনি
বলে লক্ষ্মীকান্ত, চাল বাড়ন্ত
কে আনিবে তুমি বই।···

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বোলপুরে যখন নামলাম, তখনও বেশ অন্ধকার। স্টেশনের হাতায় পোঁ পোঁ শব্দে হর্ন বাজাতে বাজাতে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে: জয়দেব কেঁদুলি। জয়দেব কেঁদুলি।

চায়ের লোভ ছাড়তে না পেরে প্রথম বাসটা ছেড়ে দিতে হলো। দ্বিতীয় বাস ছাড়ল কড়া লিকারে দুধ পড়বার মতো করে যখন রাত ফরসা হলো। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। জয়দেব অব্দি এমনিতে বাস চলে না। মেলা বলেই চলছে।

সুপুর, রায়পুর পেরোতে দুধারে খোয়াই আর তালডাঙা। রামনগরের পর চৌপাহাড়ি জঙ্গল। অফুরন্ত শালের বন। জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম বল্লা। বন শেষ হলে সুখবাজার। তারপর এক দমে ইলামবাজারে এসে বাস একটু দাঁড়াল। বড় বড় বাড়ি। পুরনো মন্দির। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। ডানদিকে ঘুরে গেছে রাস্তা। বাস চলতে লাগল। পায়ের, হরিষা, হুনমুড়ি ছাড়িয়ে উত্তরকোণা। সর্ষেক্ষেতে সবুজ হয়ে আছে মাঠ। বাস এবার বাঁ দিকে বাঁক নিল। মাঠরাস্তায় ধুলো ওড়াতে ওড়াতে খানিক পরে এসে থামল টীকরবেতায়।

নদীর ওপারের গ্রাম বেতা। এপারে টীকরবেতা। টীকর মানে উঁচু। কেঁদুলির সঙ্গে এ গ্রামের শুধু গোটা কয়েক মাঠের ফারাক।

আমার তেমন মোটঘাটের বালাই নেই। কিন্তু আমার বন্ধুটির আধমণী সুটকেস আর হোল্ড্অল। দুজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যেতে হলো। আমাদের কপাল ভাল, যে বাড়িটা চাইছিলাম সেটা হাতের কাছেই পেয়ে যাওয়া গেল। কড়া নাড়তেই বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকালেন—'আপনারা ?' মনে মনে দমে গেলেও খানিকটা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা থেকে।' যে অনুপস্থিত বন্ধুটির পরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের আসা, তাঁর নাম করে বললাম, 'চিঠি পান নি ?' 'কই, না তো।'—শুনে আরও মিইয়ে গেলাম।

অবশ্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হলো না। প্রথমে এল হাতমুখ ধোওয়ার জল, তারপর লোভনীয় চা-জলখাবার। কিন্তু আমাদের তখন হে-ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অবস্থা। ভাবছি একটা ছুতো করে দুপুরের আগেই অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। শুধু আধমণী সুটকেস আর হোল্ড্অলটার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় পিওন এসে বাড়ির কর্তাকে চিঠি দিয়ে

গেল। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'দেখুন কাণ্ড, কবেকার লেখা চিঠি কবে এসে পৌছুল।' শুনেই বুঝলাম সেই চিঠি, যার অভাবে আমরা মরমে মরে ছিলাম।

সুতরাং খোশমেজাজে বেরিয়ে পড়া গেল মেলা দেখতে।

মাঠের আলরাস্তা ধরে গেলে কেঁদুলি মোটেই দূর নয়। কামারপাড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা গিয়ে পড়েছে মাঠে। হাতুড়ির ঠুক ঠাক আর হাপরের কাঁপা কাঁপা আওয়াজে গমগম করছে গোটা পাড়া। ঘরে ডাঁই হয়ে আছে বাসন, দাওয়ায় মহাজনের লোক বসে।

আলরাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে খানিকটা দূরে সদর রাস্তা বরাবর সার দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, মধ্যে মধ্যে বাসলরি আর তিন চাকার টেমেপা। দুপাশে খেজুর গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো খাচ্ছে।

সামনে আধডজন ধানকাটা মাঠ। তারপরই অনেকখানি জায়গা নিয়ে সিনেমার তাঁবু। জেনারেটরের শব্দে মাত হয়ে আছে সারা তল্লাট। লাউডস্পীকারে চল্‌ছে অবিরাম হিন্দী গান। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একজন দাঁতন করছিলেন। বেড়ার এধারে দাঁড়িয়ে দুটো চারটে কথা হলো। ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানি ওঁদের। বর্ষার কয়েকটা দিনই যা বসে থাকতে হয়, বছরের বাকি সময়টা মফস্বলে সিনেমা দেখিয়ে বেড়ান। হিন্দী নাচগানের ছবি হলে তো কথাই নেই। বাংলা ছবিও চলে, তবে সুচিত্রা-উত্তমের বই হওয়া চাই। 'তবে আর বলছি কী, গ্রাম কি আর সে গ্রাম আছে, মশাই।' যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটা পোস্টারে এক রংদার মেয়ে বুক চেতিয়ে আড়নয়নে চেয়ে হাসছিল। তাকিয়ে দেখি বেড়াটার গায়ে লোক ভেঙে পড়েছে।

দু পা এগোতেই একেবারে মেলার আওতার মধ্যে এসে গেলাম। দোকান-পাট উপ্‌ছে এসে পড়েছে মাঠে। স্তূপাকার হয়ে আছে দরজা-জানলার পাল্লা, গরুর গাড়ির চাকা, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পাতকুয়োর পাটা।

রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান। এক জায়গায় সাইকেল রিক্সায় বসে কোনো এক বিড়ি কোম্পানির লোক মাইকে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। তার পাশে পর পর দুটো হোটেল। উনুনে চায়ের জল ফুটছে। তার ঠিক পরেই টিম টিম করছে একটা হুঁকোর দোকান। হুঁকোর খোল আসে কোচিন

থেকে। আগে ছিল জমজমাট ব্যবসা। এখন গ্রামদেশে বিড়িটাই বেশি চলছে। বাইরে চলতে ফিরতে হুঁকো নিয়ে বড় ভজোকটো।

মোহন্ত বাবাজীর কাছ থেকে মেলার 'ডাক' হয়েছে এবার হাজার তিনেক টাকায়। দোকান করতে গেলে হাত হিসেবে ভাড়া। জায়গা বিশেষে তিন টাকা থেকে আট আনা হাত।

সংখ্যায় কাপড়ের দোকানই বেশি। খদ্দের বলতে বেশির ভাগই গাঁয়ের চাষী। এখন তারা ভালমন্দ বাছাই করতে, দরদস্তুর করতে শিখেছে। বলে, 'অমুক ধরনের শাড়ি চাই।' ছাপা শাড়ির খুব চাহিদা। আগেকার দিনে? যা দেওয়া হতো তাই নিত। সাঁওতালরা আগে কিনত নিরেস ধরনের ছাপা রুমাল। এখন কেনে ভাল ক্যালিকো।

মনিহারি দোকানগুলোতে সাবান পাউডার পমেটম থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের শৌখিন জিনিস। দেখে বোঝা যায় গ্রামের গায়ে শহরের হাওয়া লাগছে। খেলনার দোকানে যত খেলনা সবই প্ল্যাস্টিকের,—কাঠের নয়, টিনের নয়, মাটিরও নয়।

অ্যালুমিনিয়মের দোকান দেখে মনে হলো লোকের কাছে এখন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রের চাহিদাই বেশি। এ চাহিদা সাধ করে নয়, দায়ে পড়ে। কাঁসাপিতলের দাম যা। অবশ্য সুবিধেও আছে। খোয়া যাওয়ার ভয় কম।

মেলায় দোকান দেখতে হয় মিঠাইয়ের। থরে থরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু ক'রে সাজানো। রঙেরও কত বাহার। শ' তিনেক দোকান। গড়ে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিক্রি। রসটুকুও ফেলা যায় না। তাই দিয়ে বোঁদে আর জিলিপি হয়।

নদীর ধারের রাস্তা জুড়ে কাতারে কাতারে বসে আছে কুষ্ঠরোগী। ভন্ ভন্ করছে মাছি। দেখে গায়ের ভেতর কেমন করে ওঠে। আরও একটু এগিয়ে গোটা দুই বইয়ের স্টল। বটতলার বই। লক্ষ্মীচরিত্র। প্রেমের গোপন পত্র। রোজা হইবার সহজ উপায়। ভৈরবীতন্ত্র। যাদুবিদ্যা। লতাপাতার গুণ। সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত। আরও কত কী। যারা বই কিনবে তাদের এর ভেতর থেকেই পছন্দ করতে হবে। কেননা সব দোকানেই এই এক বই। কেন তারা শুধু বটতলার বইই রাখে? বটতলার বইওয়ালারা ওদের মোটা কমিশন দেয় যে।

পেণ্ট করা সিনের সামনে কালো কাপড়ে ক্যামেরা ঢাকা দেওয়া ফটোর দোকান। এসেছে চিৎপুর থেকে। মেলায় মেলায় ছবি তুলে বেড়ানোই এদের কাজ। রোজগার? তা রোজগার না হবে তো আসবে কেন? আজকাল তো মরলে ফটো, বিয়ে হলে ফটো, বিয়োলে ফটো। কাল রাত্তিরেই তো এক গাঁ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। টাকাও পেয়েছে ভাল।

তার পাশেই একজন পয়সা নিয়ে ম্যাজিক শেখাচ্ছে। তার পাশে কাটামুণ্ড; মৃত্যুকূপ; বিদ্যুৎকন্যা; আজব চিড়িয়াখানা।

চব্বিশ পরগণা থেকে এসেছে মাছধরা জাল। নদীয়া থেকে আড়ি বা ধান মাপার ধামা। বর্ধমান, বৌবাজার, চালভাজা, খাঁপুর থেকে মাটির জিনিস।

মেলার শেষ প্রান্তে গিয়ে চক্ষু স্থির। গোটা পঞ্চাশেক কলার দোকান। জীবনে একসঙ্গে এত কলা কখনও দেখিনি। কলা নিয়ে এসেছে সতেরোটা ট্রাক। চন্দননগর থেকে, ব্যাণ্ডেল থেকে, কাটোয়া থেকে। একেক ট্রাকে গড়ে চার শো কাঁদি। একেক কাঁদিতে তিন পণ। বলতে গেলে এ মেলায় প্রায় সাড়ে ষোলো লক্ষ কলা বিকোবে। খবরের মতো খবর বৈকি। আগে এ অঞ্চলে কলা হতো না; এখন বাজার আছে দেখে চাষীরা করছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন আজ। গেরস্থরা লক্ষ্মীপুজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধ্না পরব, পয়লা মাঘ ডোমহাড়িদের এখ্যানপুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়।

দুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন।

আগে দু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁদুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে। নতুন আখড়া বলতে শিরসার পশুপতি নায়েকের। তিন দিন ধরে খাওয়ানো; দিন দুশো লোক খায়। দিনে একবার খাওয়া। সব আখড়া মিলে পাঁচ সাত হাজার লোক খায়। এর খরচ ওঠে কিছুটা জমিদারের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে, কিছুটা বারোয়ারি চাঁদা থেকে, কিছুটা গুরুর দৌলতে।

বৈষ্ণবদের মেলা তিন দিন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে একমাস ধরে বাজার থাকত। তখনকার দিনে বাজারে প্রধানত বিক্রি হতো মশলাপাতি,

তামাক, কাপড়, মনিহারি জিনিস আর চাষের যন্ত্রপাতি। এখন আর তামাক আসে না!

সে সময়কার জিনিসের দাম? এখন শুনলে হাসি পাবে। দশ টাকায় সম্বৎসরের তামাক, মশলাপাতি কেনা যেত। টাকায় জিরে পাওয়া যেত আট সের, গোলমরিচ ছ সের, সুপুরিও ছ সের। একটা লাঙল চার আনা, জোয়াল ছ আনা। তৈরি দরজা-জানলা তখন আসত না।

আমোদপ্রমোদ বলতে ছিল বৈঠকী গান। আসরে বসে কালোয়াতী গান গাওয়া ভাগ্যের কথা ছিল। আর হতো বাউল গান। পরে বৈঠকী গান উঠে যায়। সে সময়ে আসত কীর্তনীয়াদের দলের মূল গায়েনরা।

মেলায় ডিম মাংস বিক্রি হতো না। এখন ব্যবসাটাই প্রধান হওয়ায় বৈষ্ণবেরা আড়ালে পড়ে গেছে। বৃন্দাবনী ছাপের কাপড় আসত জয়পুর, বৃন্দাবন থেকে। এখন সে সব বন্ধ। কাপড় আসে এখন হাওড়ার হাট থেকে।

তেপাতি (তিন তাস), তেহুঁটি, ছক—এই নিয়ে সেকালে জুয়ো খেলা হত খুব। এখন উঠে গেছে।

জয়দেবের মেলার সময় দেওয়ানী আদালত বন্ধ থাকত। নানা জেলা থেকে বাবাজী মাতাজীরা আসত। দূরদূরান্তর থেকে আসত যাত্রীর দল।

আর শুনলাম খোটরে-বাবার গল্প। শ্মশানের বটগাছের কোটরে থাকত, সেই থেকে নাম হয়ে গেছে খোটরে-বাবা। অন্য জেলার লোক; মন্বন্তরের বছরে এ গাঁয়ে এসে প্রথম যখন আস্তানা গাড়ে, তখন তার ছোকরা বয়েস। কোটরে থাকতে থাকতে ভোলা ডোম তাকে একটা তালপাতার কুঁড়ে তৈরি করে দেয়। মেলার যাত্রীরা এসে তাকে খাবারদাবার পয়সা দিত। তার কোনো জাতবিচার ছিল না। একবার হলো কী, খোটরে-বাবার জড়িবড়িতে মোহন্তের অম্লশূল সেরে গেল। খুশী হয়ে মোহন্ত তাকে সোনার তাগা গড়িয়ে দিলেন। আর সেইসঙ্গে শ্মশানে তৈরি হয়ে গেল খোটরে-বাবার আশ্রম। এখন তার বিস্তর বিষয়সম্পত্তি। ফি বছর চব্বিশ প্রহর হরিনামসঙ্কীর্তন করে। চাষীরা সেই উপলক্ষে ঢেলে টাকা দেয়। সেই টাকায় আজ তার বিঘে চল্লিশ জমি। এখন সে ঘোর বাবু। সেবাদাসী আছে।

আখড়ায় আখড়ায় এখন পাল্লা চলেছে কে বেশি চেলা পাকড়াতে পারে।

রাত্তিরে মেলায় গিয়ে তা বিলক্ষণ টের পেলাম। বছর কয়েক হল এক বাবাজী রীতিমতভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। মাথার ওপর বাহারে

চাঁদোয়া। রঙীন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবাজী বসে। পরনে তাঁর দামী সিল্কের গেরুয়া। বেশ গোলগাল চেহারা। চতুর্দিকে টাঙানো তাঁর ফটো। বেশির ভাগ ফটোই তাঁর সমাধি অবস্থায় তোলা। সেইসঙ্গে বিলি হচ্ছে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল। টেবিলের ওপর বিক্রির বই রয়েছে—বাবাজীর কথামৃত। লাউডস্পীকারে কীর্তন হচ্ছে। ওপাশে পর্দাঘেরা জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াই। স্তূপাকারে কুটনো কোটা। উনুনগুলোও যেন রাবণের চিতা। মাঝবয়সী হালফ্যাশনের কিছু মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। বাবাজী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখেশুনে সর্বদিক বজায় রেখে আসছেন। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে আছে।

এদিক ওদিক ছোটবড় আরও অনেক আখড়া। যার যেমন ট্যাঁকের জোর তার তেমন জৌলুশ। কোথাও গান হচ্ছে লাউডস্পীকারে, কোথাও খালি গলায়। কোথাও ডে-লাইট, কোথাও হারিকেন।

বাউল এসেছে হাজারের ওপর। নানা জেলার নানা জায়গায় তাদের আখড়া। কাজ বলতে শুধু ভগবানের নাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফ্রয়েড-পড়া হেল্‌থ সেণ্টারের এক ডাক্তার। বিন্দুসাধনের সঙ্গে গাঁজার এবং আখড়ার সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছিলেন। হঠাৎ দেখলাম বোষ্টমবোষ্টমিদের দঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আমার এক পরিচিত ছোকরা। 'কখন এলে—' শুনে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকাল। অন্যমনস্ক থাকায় আমাকে চিনতে তার এক মুহূর্ত লাগল। তারপর একটু রহস্যের মতো করে আমাকে একপাশে 'শুনুন' বলে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল: বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক কাকা নতুন বিয়ে করেছিল। কাকিমা লেখাপড়াও একটু আধটু জানতেন। সেই সময় গ্রামে এক সাধু এসে গাছতলায় আস্তানা গেড়েছিল। একদিন দেখা গেল গাছতলা খালি। সাধু চলে গেছে। এদিকে কাকিমাকেও পাওয়া গেল না। সেই থেকে কাকিমা নিরুদ্দেশ। আজ এই একটু আগে হঠাৎ কাকিমাকে দেখলাম। গলায় কণ্ঠি, কপালে রসকলি। আমি এগিয়ে যেতেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কথাটা শেষ করেই কাউকে বোধহয় দেখে হন্তদন্ত হয়ে সে এগিয়ে গেল। ফ্রয়েড-পড়া ডাক্তার ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলাম।

পেছন থেকে কে একজন হঠাৎ আমার কনুইটা ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি একজন চেনা লোক। নিচু গলায় বলল, গান শুনবেন? সেরা বাউলদের গান?

এক কথায় রাজী হয়ে আমরা তার পেছন পেছন চললাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। খানিকটা এগিয়ে একটা পাচিল। পাচিলের মাঝখান দিয়ে দরজা। ভেতরে ঢুকে মনে হল কোনো আশ্রম। উঠোনের একপাশে একটা শানবাঁধানো বেদি। টিম টিম করছে একটা ফুটো হারিকেন। মধ্যিখানে আগুন। চারদিকে কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একতারা বাজছিল। উঠোনে জুতো খুলে রেখে আগুনের কাছে উঠে বসলাম। বেশ শীত। রাতও হয়েছে মন্দ নয়।

আগুনটাকে প্রায় কোলের মধ্যে নিয়ে বোম হয়ে বসে ছিল এক বুড়ো থুথ্‌রে বাউল। হাতে তার ন্যাকড়া জড়ানো একটা কল্কে। কাঁপা কাঁপা হাতে চিমটে দিয়ে কল্কেতে আগুন চড়িয়ে সামনেই একজনের হাতে দিল। একতারাটা নিয়ে এতক্ষণ সে শুধু টুং-টাং করছিল। সুর আসছিল না।

পেছন থেকে কে একজন খুরিতে করে চা এগিয়ে দিল। শীতের মুখে গরম চা বেশ জমল। খুরিটা নামিয়ে রাখতেই কানে এল এবার গবগবিয়ে একতারা বাজছে। বাউল এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গানও শুরু হয়ে গেল: 'ওগো নাগরি, জাত গেল পেট ভরল না গো গাগরী।...গোসাঁই কবির চাঁদে কয়: মোদের নাইক লাজ ভয়, সবাই মিলে বল মোদের গৌরহরির জয়।'

আসর দেখতে দেখতে জমে উঠল। টিমটিমে আলোয় ভাল করে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছায়াগুলো মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠে কেমন একটা রহস্যের জাল বুনে চলেছে। গান একজন শেষ করে তো আরেকজন ধরে: 'মানুষে কী আছে, মানুষ আসতেছে আর যাইতেছে। মানুষে কী আছে। আমার আমায় রেখে আসছে মানুষ, ভবের হাটে মানুষ বসে তার কাছে। মানুষে কী আছে। হৃদয় মাঝে কল আছে। নীচে কলের যোগ আছে, চারদিকে চার ডাল আছে—মানুষ পাতায় নড়তেছে।...মানুষে কী আছে!'

উঠে আসব আসব করছি। দরজা ঠেলে কে একজন ঢুকতেই আসরটা কলবলিয়ে উঠল। তার হাতেও একতারা। মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। পিঠের ওপর ঝুলি রেখে বসতেই কল্কেটা এগিয়ে গেল। তারপর কষে

কয়েকটা টান। ঠিকরানো আলোয় লোকটার মুখের ওপর দিকটা বারকয়েক ঝিলিক দিয়ে উঠল। কোথায় যেন দেখেছি-দেখেছি মনে হলো।

একতারায় একটা চেনা সুর বেজে উঠল। তারপরই শুরু হল গান :

হরি তোমায় ডাকিবার
আমার সময় হল কই···

গলাটা খুবই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে গয়া প্যাসেঞ্জারের কথা মনে পড়ে গেল। সেই বিনা টিকিটের যাত্রী বাউল—পাশের কামরার ভদ্রলোকদের যে শাপমুক্তি দিয়েছিল।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে লোকটা সুরের এমন এক মায়াজাল বিছিয়ে দিল যে, কিছুতেই উঠে আসতে পারলাম না।

বাইরে বেরিয়ে বাউলদের ভিড় ঠেলে আসতে আসতে একজন বলল, 'ঐ দেখুন, এক বোষ্টম বোধহয় এক বোষ্টুমীকে ভাংচি দিচ্ছে।' মেলায় নাকি আকছার হয়।

পরদিন ভোরে উঠে বন্ধু ফিরল কলকাতায়। আমি চললাম মল্লারপুর। সেখান থেকে হাঁটাপথে যাব নিমপাহাড়ি।

মল্লারপুরের এক বাড়িতে স্নানখাওয়া সেরে, বেলাবেলি রওনা হওয়া গেল। শুনেছিলাম ঝুমুরের দল আছে এখানে। খোঁজ নিলে মন্দ হতো না। কিন্তু কথাটা তুলতেই গাঁয়ের লোকেরা এমনভাবে মুখ বিষ করে তাকাল যে ও নিয়ে আর এগোবার সাহস হলো না। স্পষ্টই বুঝলাম গাঁয়ের লোকে ওদের পাড়ায় যাওয়াকে ভাল চোখে দেখে না। ওদের সব নোংরা ব্যাপার-স্যাপার।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই দেখি দীঘি। আর সব দীঘিই তালদীঘি। এই একটা গাঁয়েই নাকি শ-দুই দীঘি! চোখে যা দেখলাম শুনে খুব অবিশ্বাস হলো না। গরুর গাড়ির চাকা-বসা লম্বা রাস্তা। অনেক দূরে আকাশের গায়ে মেঘ-মেঘ পাহাড়। রাজমহল।

ক্রোশখানেক যাওয়ার পর গাড়ির রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিল। বাঁদিকে ঘাগার বন। বনের পায়ে-চলা রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কথায় বলে, নদীর কূল আর শালের মূল—যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। লাল কাঁকর-মেশানো অদ্ভুত মাটি। জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে ঝামা-পাথর।

পায়ের দিকে না থাকিয়ে চললে হোঁচট খাওয়ার ভয়। বনের ভেতর এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা।

যেতে যেতে গাছ দেখি আর নাম জিজ্ঞেস করি। পাতা দেখেই বুঝতে পারি কোন্‌টা শাল, কোন্‌টা সেগুন। মহুয়াও পারি। আম জাম কাঁঠালের তো কথাই নেই। কিন্তু পিয়াল গাছ আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। জেওলা আর চাকল্‌তাও নয়। ধোয়া আর মুরগা তো নয়ই। মুরগা গাছের ভালো কাঠ হয়। আর আছে গাব, করমচা, বৈঁচি, বনফুল, বকুল, অনন্তমূল, শতমূলী, হরিতকী, আমলকি, বহেড়া। ঘাগার বনে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম আলু—একেকটার আধমণ, তিরিশ সের ওজন।

খরগোশ আর বেজি ছাড়া কোনো জন্তু চোখে পড়ল না। শুনলাম বনে সাপ তো আছেই, বাঘ আর শুয়োরও আছে। খরগোশকে এখানকার লোকে বলে 'শশা'; নথীর চেয়ে খুরীর মাংসে স্বাদ বেশি।

পাখির মধ্যে এ বনে পাওয়া যায় ময়না, টিয়া, ট্যাশকোনা, শালিখ, কোকিল, কাকাতুয়া, চোখ-গেল, বউ-কথা-কও। শিকারের পাখির মধ্যে তিতির, গেরুল, ডাবুক, ঘুঘু। গেরুল পাখিকে মুরগাভিও বলে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ মালুম হচ্ছিল ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছি। খানিকটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আবার হয় গাছের জটলা নয় কাঁটা বন। কাঁটা একবার কাপড়ে বিঁধলে ছাড়ানো মুস্কিল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সামনে এঁকে বেঁকে গেছে একটা খাল। খাল পেরোবার সাঁকোয় পৌঁছুতে আরও বেশ খানিকটা হাঁটতে হলো। পশ্চিমে সূর্যের বেশ চোখ-ঢুলুঢুলু অবস্থা।

খাড়া রাস্তায় বেশ খানিকটা উঠতে হলো। উঠেই নিমপাহাড়ি। সামনে কয়েকটা টোপাকুলের গাছ। তার আড়ালে টুকুর্দার বাড়ি। তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। কিন্তু সব উৎসাহ জল হয়ে গেল যখন শুনলুম টুকুর্দা বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গেছে পরব করতে। বউ থাকবে। টুকুর্দা রাত্তিরে ফিরবে খাওয়াদাওয়া সেরে।

নিমপাহাড়ির টুকরো টুকরো খবর পরে টুকুর্দার কাছ থেকে পেলাম। টুকুর্দারা অনেক পুরুষ ধরে এখানে। এ গাঁয়ে আগে দুশো আড়াইশো ঘর লোকের বাস ছিল। টুকুর্দার ছেলেবেলাতেই তো এ গাঁয়ে একশো ঘর লোক ছিল। এখন পঁচিশ ঘর লোকে এসে ঠেকেছে। এ গাঁয়ে হাঁসদা,

টুডু আর বেস্‌রাদের বাস। মুরমু, মারডি, কিস্‌কু, হেমব্রম, সোরেন, চঁড়েরা থাকে অন্য অন্য গাঁয়ে। টিকুর্দার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে; টিকুর্দার বউ পীছার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। টিকুর্দার শশুরদের পারিশ হলো মারডি।

টিকুর্দার কর্তাবাবা শালকুর ছিল তিন কুড়ি বিঘে জমি। তার সাত বেটা তুই মেয়ে। খরার বছরে পাঁচ মণ ধান কর্জ করেছিল বলে মাট দশ বিঘে জমি মহাজনের পেটে চলে যায়। এ গাঁ ছেড়ে যারা আসামের চা-বাগানে কিংবা বর্ধমানে পালিয়ে গেছে, তারা সবাই গেছে অজন্মায় জমিহারা হয়ে। টিকুর্দারা পাঁচ ভাই: রেগু, গোড়ল, টিকু, রাকদা, লুম্বু। সেজো আর ছোটই শুধু এখন বেঁচে। পাঁচ ভাইয়ের ছিল পাঁচ বিঘে পৈতৃক জমি। এখানে জমি বলতে সবই প্রায় ডাঙা জমি। বৃষ্টি হলে তবে ফসল হয়। ভাল বৃষ্টি হলে বিঘেতে পাঁচ ছ মণ হবে। জষ্টি মাসে বুনলে ভাদ্দরে ওঠে কতু ঘাস। বিঘেয় এক মণ। এক মণ কতুতে চাল হয় তিরিশ সের।

পাশেই কলাইপাহাড়ি জঙ্গল। জঙ্গলটা আগে ছিল মোহন্ত ভগবানদাসের। জমিদারি উচ্ছেদের পর এখন সরকারি বন। এই বনের কিছু কিছু জমিতে সাঁওতালরা আগে মকাই চাষ করত। জমিদার তার ভাগ নিত। বন সরকারি হওয়ার পর থেকে সাঁওতালদের চাষ বন্ধ।

বরবটি-কলাই এ জমিতে ভাল হয়। ভাল করে সার দিলে বিঘেতে চার-পাঁচ মণও হতে পারে। সয়াবিনের চাষও হতে পারে। এ জমিতে আর ভালো হয় কাঁঠাল গাছ। আশেপাশে পতিত জমিও কিছু আছে যেখানে চাষ হতে পারে। কিন্তু সেচের সমস্যাই আসল।

এদিকে ক্যানেলটা যেভাবে কাটা হয়েছে, তাতে ডাঙা জমির জল ডামড়ার মাঠে যেতে পারছে না। ক্যানেলের বাঁধে সে জল আটকে যাচ্ছে। আগে বনের পাতা-ধোয়া জল জমিতে সারের কাজ করত। এখন ডামড়ার মাঠে ক্যানেলের জল না নিলে চলে না। সে জলে আগেকার মতো ফসল হচ্ছে না। আবার ক্যানেলের জলও কি বছর পাওয়া যায় না।

এ অঞ্চলে কাঁদরের জল আসে পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে। তু দোণ, তিন দোণ জল। বারো মাসই কিছু না কিছু থাকে। বাঁধ দিয়ে জল জমিয়ে রাখলে এ অঞ্চলের চেহারা বদলে যায়। চার-পাঁচটা বাঁধ হলেই হয়। নিজেরা চাঁদা তুলে করবে সে উপায় নেই। খাজনাই দিয়ে উঠতে পারে না, চাঁদা দেবে কোত্থেকে? তবে তারা গতরে খেটে দিতে রাজী।

টুকু্দারা বাড়িতে কেউ নেই দেখে, দূর থেকে মাদলের শব্দ শুনে ঝোলাঝুলি রেখে আমরা গেলাম নামালের দিকে গ্রাম দেখতে।

সূর্য ডুবে গেলেও বাইরে তখনও আলো। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে একটানা রাজমহল পাহাড়। জায়গায় জায়গায় তার একেকটা করে নাম। কোথাও বলে শালবনী, কোথাও মনসা, কোথাও বেনাগুড়িয়া, কোথাও বাঁশপাহাড়ি, কোথাও কাঠপাহাড়ি, কোথাও বলে কাঁড়াকাটা।

সব চেয়ে উঁচুতে নিমপাহাড়ি গ্রাম। তার আশপাশে ছড়ানো রায়পুর, পলাশবনী, ধরমপুর, হুচুকপাড়া, উলপাহাড়ি, বড়জোল, গড়িয়া, আগুইয়া, হামিরপুর, ডামড়া। রায়পুরে বেশির ভাগ জোলার বাস; ডামড়ায় তেলী আর ঘোষ—আর আছে বাউড়ি, লেট, বাগ্দী, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, বেণে, নাপিত।

ধরমপুর যেতে বেশ খানিকটা নামতে হয়। রাস্তার দুপাশে মজার মজার পাথর। দেখে মনে হবে কাঠের টুকরো, হাতে নিলে দেখা যাবে পাথর হয়ে গেছে।

উপরপাড়া আর নামালপাড়া মিলিয়ে ধরমপুরে একশো ঘর লোক। পুরোপুরি সাঁওতালদেরই গ্রাম। উপরপাড়া গরীব—কিষাণ, মাহিন্দার আর ভাগচাষীরা থাকে; এদের বলে রাঙাই হড়। আর নামালপাড়ায় থাকে কিষণ হড়—তাদের ঘর-গিরস্থি আছে।

মাদলের আওয়াজ হচ্ছিল নামালপাড়ায়। আমরা সেইদিকেই ছুটলাম। কাল এ গাঁয়ের বন-ঝাড়ার দিন। সবাই তাই নেচে গেয়ে তৈরি হচ্ছে। বাঁধনা পরবের শেষ হয় বন-ঝাড়া দিয়ে। গাঁ-সুদ্ধ লোক জঙ্গলে শিকারে যায়—তারই নাম বন-ঝাড়া।

বনে সারা দিন ঢুঁড়েও একটা দুটো খরগোশের বেশি কিছু মিলবে না। গোটা গাঁয়ের তাতে কী হবে? একেক দিন একেক গাঁয়ের বন ঝাড়বার পালা। তাও আগেকার সেই জঙ্গল আর সে জঙ্গলে আগের মতো শিকার থাকলে কথা ছিল। সারাদিন বন ঠেঙিয়ে সন্ধ্যেবেলা যার যার বাড়ির শুয়োর মুর্গী মেরে পরবের ভোজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিকার না মিলুক, বন-ঝাড়ার দিন আরও নানা মজা হয়—জোড়ায় জোড়ায় শিকার যতটা নয়, শিকারের ভান করে তার চেয়ে বেশি মজা।

চাল কুটতে কুটতে এ সব কথা বলছিল গাঁয়ের এক বুড়ি। বুড়িকে বললাম, গান শোনাও। প্রথমে গাঁইগুঁই করল, তারপর কাঁসার বাটিতে গরম

চা এগিয়ে দিয়ে একটার পর একটা গান শোনাল। সোজা বাংলায় গানগুলো এই :

অনেক কুটুম এসেছে
ছোট ছোট মুর্গী আর শুয়োর
আমি ভাগ করতে পারব না, বাবা—
তুমিই কুলিয়ে দাও, বাবা।

—

এতদিন বাঁধ্‌না কোথায় ছিলি ?
পৃথিবীতেই ছিলাম ;
পৌষ মাসের
কুড়ি দিন পুরতেই
আমি আস্তে আস্তে চলে এলাম।

—

যেমন যেমন
পৌষ মাস ফুরোচ্ছে
আমিও তেমনি
এগিয়ে এগিয়ে আসছি।

—

আজ তো স্নান হলো
দলমাদল (বাঁধা) পুকুরে ,
ঘরে কাল শুয়োব-মুর্গীর পূজো হবে।

—

ঘর তো বড় বটে,
লোক মেলাই।
জলকল্‌সি তো নেই,
লোক মেলাই।
কল্‌সী কী হবে ?
ঘরে তো আছে পাঁচ ঘড়া
ঘড়া দিয়ে পুকুর থেকে জল আনো।

নামালপাড়া থেকে যখন উঠলাম, সঙ্গের হারিকেনটা জ্বালতে হলো।

আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে

গত শারদীয় 'পরিচয়'-এ যে কয়টি অনবদ্য মননশীল রচনা পরিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শূন্য প্রেক্ষাগৃহ ও করুণ কুশীলব' নিঃসন্দেহে অন্যতম। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার জন্মকাল থেকে সাম্প্রতিক কালের তরুণ কবিদের কাব্য-প্রয়াস পর্যন্ত যে আলোচনা তিনি তাঁর স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করেছেন, তা একদিকে যেমন প্রশংসার্হ, অন্যদিকে তেমনি মনোমুগ্ধকর! কবিতার ব্যাপারে পাঠক-সমাজের ঔদাসীন্য যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, আর সীমাহীন এই নিস্পৃহতার কারণের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা কবিতা দুর্বোধ্য'—এমন একটা অভিযোগও যখন কোনো কোনো মহলে এখনো পর্যন্ত প্রচলিত, তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতার আলোচনা কাব্য-প্রেমিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এতে সাধারণ পাঠকদের অহেতুক কাব্য-ভীতি ক্রমশ প্রশমিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং দিশেহারা পাঠক সমাজ সরোজবাবুর আলোচনার জন্যে এদিক থেকেও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আধুনিক বাংলা কবিতা সমৃদ্ধির দিক থেকে বিস্ময়কর; বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যবান। আয়তনে ছোট হলেও সরোজবাবুর আলোচনার সময়-সীমা তিরিশ বছরের বেশি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের জন্যে কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হওয়া অনিবার্য কারণে স্বাভাবিক। যেমন অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে তাঁর সঙ্গে যে কেউ কেউ একমত হতে পারবে না এক নিশ্চিত; এবং কারো কারো কাছে মনে হবে তাঁর এই উক্তি অংশত সত্য। অবশ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অমিয় চক্রবর্তী "জীবনের আটপৌরে মুহূর্তের চিত্রায়ন" করতে ভালোবাসেন এবং "সহজের মাধুর্যকে" প্রকাশ করার প্রবণতাই তাঁর বিশিষ্ট কবি-স্বভাব। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতার সঙ্গে তাঁর বহু কবিতার আত্মিক মিলও দৃষ্টি এড়ায় না কারো। এদিক থেকে অমিয় চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী। তবু না মেনে উপায় নেই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের পুনরাবৃত্তি নন কিছুতেই; বরং ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেও,

স্বকীয়তায় তিনি তর্কাতীতভাবে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক চেতনা থেকে তাঁর চেতনা মূলগতভাবে পৃথক। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অতীন্দ্রিয়; মাটি থেকে জন্মলাভ করেও, তাঁর কবিতা মুহূর্তে আকাশচারী হয়ে যায়। অথচ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ওই অতীন্দ্রিয় ভাবনা প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁর কবিতায় আমরা যা পাই, তা আমাদের চারপাশে ছড়ানো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ। প্রত্যক্ষ পৃথিবীর বাস্তব জীবনযাত্রার ইতিবৃত্তকে তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। দেশ-কালের সীমানা ধ্বসে পড়ে তাঁর চোখের সামনে। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, ট্রেনে যেতে চোখে-পড়া ধানের মরাই, কলাগাছ, ঘাসে-ছাওয়া খিড়কি-পথ, গ্রেনাডিন দ্বীপের সমুদ্র-তীরের নারকেল-বীথির নিঃসঙ্গ হাতছানি, মার্কিনী জীবনযাত্রা, যুদ্ধ-বিতাড়িত ডানজিগের মেয়ে, ইহুদি পরিবার, স্পানিশ উদ্বাস্তু, যান্ত্রিক সভ্যতার অভিশাপে ক্লিষ্ট নরনারী, বোমা-বিধ্বস্ত জার্মানির বেদনা—এক কথায় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এসে ভিড় করে তাঁর কবিতায়। আর, আমার মনে হয়,—এখানেই অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতা।

"জীবনের সহজের মাধুর্যকে তিনিও সবস্ব বলে ভেবেছেন" বলে যে মন্তব্য সরোজবাবু করেছেন, তা যে অন্তত অংশত অমূলক, তারও প্রমাণ রয়েছে "একমুঠো"র 'যুদ্ধের খবর,' "মাটির দেয়াল"-এর 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', "পারাপার"-এর 'অন্নদাও', 'সনেট', 'সন্দ্বীপ' প্রভৃতি একাধিক কবিতায়। "দূরযানী" এবং "অভিজ্ঞান বসন্তের"-এর কতিপয় কবিতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সামাজিক অসঙ্গতি, আধুনিক সভ্যতার নির্মমতা, তেরোশ' পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মর্মন্তুদ কাহিনীর চিত্রায়নও যে তাঁর রচনায় অনুপস্থিত নয়, উল্লিখিত কবিতাগুলিই তার প্রমাণ।

"প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অজিত দত্তের কাছে, অন্নদাশঙ্কর এবং অমিয় চক্রবর্তীর হাতে আধুনিক কবিতার ঋণ অনেক হলেও, কালের জটিল লিপির পাঠোদ্ধারে এঁদের আগ্রহ ছিল অনুগ্র"—সরোজবাবুর এই উক্তি পীড়াদায়ক। উল্লিখিত চারজন কবির মধ্যে তিনজন সম্বন্ধে আপাতত নীরব থাকাই সমীচীন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবলী পড়লে, সরোজবাবুর উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে; কারণ তাঁর কবিতায় বর্তমান কাল ও সমকালীন জীবন নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত।

জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের লক্ষ্য করে

সরোজবাবু বলেছেন, "এঁরাই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত গীতলতার পিছুটান না ছিন্ন করলে তিরিশের ভাবনাকে কাব্য-শরীর দান করা যাবে না।" সরোজবাবুর এই মন্তব্য যথার্থ। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমিও একমত। বাংলার ঐতিহ্যগত তরল গীতলতার সঙ্গে তিরিশের আধুনিক কবিরা এও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সুরের ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন কবিরা তাঁর "সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লেন।...এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুল লক্ষণ ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি বলে আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করলেন তাঁরা।"[১] পূর্ববর্তীদের এই ভুল থেকে শিক্ষা নিলেন তিরিশের কবিরা ; আর সেই সময় থেকে কবিতায় ভাবালুতা পরিহার করার সাধনায় তৎপর হলেন তাঁরা। অমিয় চক্রবর্তীও এই সাধনার প্রতি বিমুখ ছিলেন না কখনো এবং তাঁর সিদ্ধিও এদিক থেকে, আমার বিশ্বাস, তর্কাতীত। "বিষয়-ভাবনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে" তাঁর কবিতা "কিছুটা সময় গাদ্যিক ঋজুতার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও, হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় সঙ্গীতের দিকে"—সরোজবাবুর এই উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ভাবালুতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি, তাহলে সরোজবাবুর সঙ্গে একমত হওয়া দুঃসাধ্য। মূলত হৃদয়াবেগ থেকে যে-সব কবিতার জন্ম হয়েছে, অমিয় চক্রবর্তীর সেই কবিতাগুলিও চোখ-ছলছল করানো অসংবৃত উচ্ছ্বাসে বাষ্পাচ্ছন্ন নয়। আর "ভাবালুতা" থেকে কবিতাকে মুক্ত করে এবং কবিতার নতুন প্রকরণ আবিষ্কার করার পরেও, সঙ্গীতের দিকে প্রবণতা ছিল তিরিশের কালের অধিকাংশ কবির মানস-ধর্ম। এবং জটিল আধুনিকতার দর্পণ রচনাতেও তাঁরা কখনো অসফল হন নি। বিষ্ণু দে, যিনি সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে সবচেয়ে কীর্তিমান বলে সরোজবাবু বলেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্যও যে সঙ্গীত-ধর্ম এবং বিশুদ্ধ আবেগই যে তাঁর কবিতার প্রাণশক্তি—সরোজবাবু নিশ্চয় তা স্বীকার করবেন। বিষ্ণু দের বিখ্যাত এবং বহুপঠিত 'ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা', 'ওফেলিয়া', 'মহাশ্বেতা' এবং আরো অনেক কবিতার সুরের আশ্চর্য সম্মোহনে পাঠক-মন আলোড়িত হয়ে ওঠে ; আর পড়বার পরও কবিতাগুলির সঙ্গীতের অনুরণন থেমে যায় না সহজে। বিষ্ণু দে সঙ্গীতের মধ্যে, ছন্দের বিচিত্র অর্কেস্ট্রায় যে

(১) বুদ্ধদেব বসু (সাহিত্য-চর্চা, পৃষ্ঠা ১১০-১১১)

সহজ হন, সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং কবিকুশলতার সিদ্ধিতেও যে দুর্জয় বলে প্রতীতি জন্মান আমাদের—আমার ধারণা—তা তাঁর কবিতায় সঙ্গীত-ধর্মের প্রাধান্যের জন্যই। সঙ্গীত আর আবেগের ওপর তাঁর অনুরক্তি যেখানে শিথিল, যেখানে বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুকে অন্য কোনো প্রযুক্তির সাহায্যে গাণ্ডিক ঋজুতায় প্রকাশ করার প্রয়াস প্রকট, সেখানে তাঁর অনন্যতাও ঈষৎ ক্ষুণ্ণ।

"গীতল মুহূর্তের প্রতি আনুগত্যের ফলে শেষ পর্যন্ত কাব্যের নতুন প্রকরণ রচনায়" অমিয় চক্রবর্তী "আর আগ্রহী হন নি"—সরোজবাবুর এ-রকম উপসংহারেও সায় দেওয়া রীতিমতো দুঃসম্ভব। অবশ্য সরোজবাবু এই কথাও বলেছেন যে, "তিনি (অমিয় চক্রবর্তী) চেয়েছিলেন গাণ্ডিকতা এবং ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের শুভ মিলনে নিজস্ব বাণী বিন্যাস। সংক্ষিপ্তি আর দ্রুততায় তাঁর বাক্‌ভঙ্গি অবস্মরণীয়।" সরোজবাবুর উপর্যুক্ত উক্তি দুটি পরস্পর বিরোধী। "কাব্যের নতুন প্রকরণ রচনায়" "যিনি আগ্রহী হন নি", তাঁর পক্ষে "অবিস্মরণীয় বাক্‌ভঙ্গি" অর্জন করা কি করে সম্ভব হলো—ভেবে অবাক হতে হয়।

উত্তর-তিরিশের অধিকাংশ তরুণ কবিদের ওপর জীবনানন্দের প্রভাব যেমন অপ্রতিরোধ্য এবং বিপুল, তেমন কোনো সর্বগ্রাসী প্রভাব সাম্প্রতিক কালের কবিদের ওপর অমিয় চক্রবর্তী হয়তো সঞ্চারিত করতে পারেন নি; তবু তরুণতর কবিদের মধ্যেও যে কেউ কেউ তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি, অন্তত তাঁর রচনার রূপভঙ্গি যে আকৃষ্ট করেছে তাঁদেরও—নিচের উদ্ধৃত কবিতাটি থেকে স্পষ্ট তা প্রতীয়মান হয়। সংক্ষিপ্তি আর দ্রুততা; যা তাঁর প্রকরণের অন্য এক চরিত্র-লক্ষণ, উদ্ধৃত কবিতাটির অবয়বে সেই প্রকরণ-কৌশলই নির্ভুলভাবে উপস্থিত।

"যাওয়ার যা তা যাবেই
তবু
যাওয়ার ঘণ্টা বাজে যখন
মনটা ফাঁকা:
'এবার গেলে ফিরবে সে-মন।'
দুঃখ শোকের ছায়াছবি সারা স্টেশন।

নীল আলোয় সংকেতিত
ট্রেনের চাকা

রুমাল ওড়ে
ভাঙা বুকের হাওয়া ধোঁয়ায়
বাষ্পে ঢাকা ॥"

(পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য)

সাম্প্রতিক কালের অন্য একজন বিশিষ্ট কবি—সিদ্ধেশ্বর সেন। ইনি আয়ত্ত করেছেন, যতিহীন ভাঙা ভাঙা পংক্তির নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গি। আত্মায় না হলেও, তাঁর কবিতার বহিরঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর উপস্থিতি লক্ষণীয়—এ রকম কথা বলতে কখনো কখনো আমি লুব্ধ হই। অন্তত, ভাঙা ভাঙা পংক্তির কবিতা অমিয় চক্রবর্তীতে দুর্লভ নয়। যেমন :

"নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোপাটি, ছোলাক্ষেত, শর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো-লতানো চাল
—বাংলা—"

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার আমি একজন অনুরাগী পাঠক। অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব আবিষ্কার করে তাঁর কবিতার কলঙ্ক রটনা করা উদ্দেশ্য নয় আমার। কারণ আমি জানি যে, অমিয় চক্রবর্তীতে যা ছিল আভাস, সিদ্ধেশ্বর সেন-এ তা পরিণত রূপ। সুতরাং আমার যা বক্তব্য—তা শুধু এই যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার কাব্য-শরীর নির্মাণেও অমিয় চক্রবর্তীর দান যে অপরিসীম তা না মেনে উপায় নেই কিছুতেই।

বিকাশ দাশ

পুস্তক সমালোচনা

পরিচয়ের পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে আমার নিজের মনে কতকগুলি ধারণা জন্মেছে। সেই ধারণা থেকে যে মতবাদ আমাকে পীড়িত করছে, সেই পীড়িত বেদনার স্বরূপটিকে লিখে প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশে জন্মাবার অধিকারেই অনেকে লেখক হয়ে থাকেন। তার জন্যে মুন্সীয়ানার কোনো প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন বা তরুণ কবি আছেন, কবিতা কি তা জানেন না ; কিন্তু স্কুল বয়স থেকে পদ্যপ্রবণতার প্রবল প্রত্যয় যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বে তাঁকে একদিন লেখক হিসাবে, কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও এর ব্যত্যয় হয়েছে বলে মনে

হয় না। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর লোকই সাহিত্যাকাশে তারার আলো নিয়ে ছেয়ে আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভূতির বাণীমূর্তির জন্যে যে-লোক অহরহ অন্তর্বেদনায় প্রকাশমান হচ্ছে, তার কৃতিকে আমরা তেমন স্থান দিই না, মৃত্যুর পর হয়তো দিই। কিন্তু তাতে কার কি আসে! এহেন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সমালোচনার তক্‌মা আঁটেন অনেকেই। কেন না তাঁরা বোঝেন, সমালোচনা মানেই হলো, কিছু নিন্দা ও বক্ষ্যমান পুস্তকের কিছু উল্টো কথা। তাই লেখকের মতো সমালোচকও আজ আমাদের ঘরে ঘরে। ওপারের বাজারে এমন বাঁটোয়ারি লেখক আজ নেই, সে কথাও বলছি নে, বরং সংখ্যার হারে বাংলাদেশের মতনই। সুনীতিবাবুর ভাষাতত্ত্বের আলোচনার বইয়ের, সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে সমালোচনার ভার দেওয়া হলো এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি হয়তো প্রুফ সংশোধন করে কবি হিসাবে কিছু খ্যাতি পেয়েছেন। বড়ো পত্রিকায় এমন হামেশাই ঘটে, সুনীতিবাবুর বইয়ের প্রকাশকেরা তাঁদের আপ্যায়নও করেন। কেননা, প্রকাশকেরা বাংলাদেশে সাহিত্যবোদ্ধার চরম মাপকাঠি, তাঁদের ওপরই লেখকের রুটিরুজি। এহেন সাহিত্যের বাজারে সৎলেখক বা পুস্তক সমালোচনা সম্বন্ধে নির্ভয়ে কিছু বলা কষ্টকর।

পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে আমার ভালো লাগলো বা মন্দ লাগলো—এই কথাটাই চরম কথা নয়। ভালোলাগার আনন্দকে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নবীন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু সমালোচকের দায়িত্ব তা নয়। কোনো একটি বিশেষ মতবাদে আস্থা রেখে সমালোচনা করতে যাওয়াও বিশেষ মারাত্মক ভ্রান্তি। মানুষের জীবন ও জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরিবর্তমান, লেখকের জগতও তেমনি। মানুষ ও জগৎ যেমন অনবরত পরিবর্তনের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সৎ লেখক তাকেই ধরতে চেষ্টা করেন। নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে জগতের আত্মার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা জানি নে, মানুষ হিসাবে লেখকের আকাঙ্ক্ষা থাকে, যার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা নেই সে মৃত। রুদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে স্তব্ধ। তাঁকেই আমার মতে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। সমালোচকও এই রীতিতে বিশ্বাসী হবে। সমালোচককে লেখকের চেয়েও বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমালোচক চিত্র, ছবি আঁকতে পারেন না বটে, সংগীতের সুর তার কণ্ঠ থেকে বেরোয় না বটে, কিন্তু চিত্র, ছবি, সঙ্গীত, মানুষ, জগৎ, ন্যায়, অন্যায়, মূল্যবোধ, পরিবর্তন পরিণাম সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর

ধারনার তপস্যা তাঁকে করতে হয়। লেখকের লেখায় অসংলগ্নতা ও ভুলকে ধরতে গেলে, সমস্ত জগৎসংসারের বিচারক সাজতে হয়। এই বিচারক উপরওয়ালার নির্দেশ মানেন না, বিবেকের সঙ্গে জাগতিক ন্যায়নীতি মঙ্গল কামনাই তাকে সর্বব্যাপ্ত বিশ্বআত্মার সঙ্গে এক করে দেয়। বিচারক যেমন সমবেদনার অনুভূতিতে সমস্ত ঘটনার অভ্যন্তরে নিজেকে একাত্ম করে আপন কার্যের ফলাফল নির্ণয় করেন, সমালোচকও সেই ভাবে প্রতিটি গল্পের ঘটনায়, কবিতার রসে, নাটকের দ্বন্দ্বে লেখকের বস্তুতাৎপর্য পরিণামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তার মর্মার্থ বোঝেন। লেখক কি বলতে চান, এই বলতে চাওয়ার সঙ্গে গল্পকাহিনী, চরিত্র, ভাষা, ছন্দ, রীতি কি ভাবে কেমন করে কেন ব্যবহৃত হয়েছে—এগুলি বিশেষ লেখকের বিশেষ সত্তা নিয়ে সমালোচকরূপী বিচারককে অনুভব, বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হয়। গল্পের বিচার নাটকের বিচার নয়, নাটকের বিচার কবিতার বিচার নয়। কিন্তু সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য ও রস, পরিণাম কিন্তু একই। এমন অনেক সমালোচনা দেখা গিয়েছে যাতে লেখককে গালাগাল করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে, অথচ মূলত সমালোচকের বক্তব্যের সঙ্গে লেখকের বক্তব্য সমধর্মী, একাত্ম। যেমন 'পরিচয়'-এ আমার নিজের 'স্ফুলিঙ্গ' বইয়ের সমালোচনায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন আমার নাটকের ভূমিকাতে সেই কথা অন্যভাষায় মাত্র বলেছি। এখানে সমালোচকের অসতর্কতাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই অসতর্কতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে কবিতার আলোচনায়। দলভুক্ত কবিদের কিছু না পড়েই কয়েক পংক্তি তুলে সৎ কবি বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হলো, এবং বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল বা তরুণ কবির বিরুদ্ধপক্ষদের নিন্দাবাদ করা হলো। সমালোচনায় নিন্দাবাদের কোনো স্থান নেই। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক সমালোচনাতেও নেই। আমি অস্বীকার করছি নে যে সমালোচকের নিজের ব্যক্তিত্বের ও রুচির চিহ্ন সমালোচনায় থাকে না। কিন্তু না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেন না উন্নত লেখকের আদর্শও অনেক সময় ভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে এমন অনেক লেখককে প্রশংসা করেছেন যাঁদের লেখা সাহিত্য নয় বলেই আজ আমরা পড়ি না। সমালোচক যদি কবি হন, কবিতার আলোচনায় তাঁর নিজের ছন্দ খুঁজতে থাকেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার একটি সনেটে ছন্দদোষ ধরলেন, অথচ আমি জানি তাতে ছন্দদোষ নেই। এটি বিশেষ রুচির প্রশ্ন। সমালোচক শুধু বোঝেন না, বোঝান। তাই তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন

যৌক্তিক বিশ্লেষণ মুখর হবে। সমালোচক যে বক্তব্য বা মন্তব্য করবেন, তার যথাবিহিত প্রমাণসাপেক্ষ উদাহরণ বক্ষ্যমান বই থেকে তুলতে হবে। সাবজেক্টিভ আলোচনা সেই স্তরেই স্বীকার করা হবে, যে স্তরে লেখক ও লেখকের বইয়ের কাহিনীর একাত্ম অনুভূতিতে সহায়তা করে। পুস্তক সমালোচনার স্থান সংক্ষেপে আলোচনার হত্যা অসহ্য।

প্রবন্ধ বা গবেষণাগ্রন্থের সমালোচনার পথ নির্দেশ আমার সাধ্যাতীত; তাই নিরস্ত হলুম। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশে পিপীলিকা গবেষণার কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

বার্ণিক রায়

'অভিযান' ও সমাজবাদী বাস্তবতা

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' সম্পর্কে ধ্রুব গুপ্তের আলোচনাটি সর্বতোভাবে মেনে নিতে পারলাম না। বাংলাদেশের চিত্রসমালোচকরা যেখানে অবিদ্যাপ্রসূত অকারণ প্রশংসায় কখনো বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, কখনো বা চরম অবিনয়বশত ছবিটিকে 'বাণিজ্যিক ছবি' ব'লে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে ধ্রুব গুপ্তের স্থিতধী আলোচনাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্যগুলি পূর্ণত আমার কাছে গ্রাহ্য নয়।

প্রথমেই ধ্রুববাবু বলেছেন, "তাঁর ছবি থেকে মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এমন কোনো অভিজ্ঞতা আমরা আশা করতে অভ্যস্ত হয়েছি যা আমাদের অনুভাবনাকে অনেকদিন পর্যন্ত অধিকার করে থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের বোধকে সমৃদ্ধ করবে। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমাদের সেই অভিজ্ঞতার অংশভাক্ করেছিল—তারাশঙ্করের উপন্যাসাশ্রয়ী এই ঘটনাবহুল বিপুলকায় ছবিটি উপভোগ্য হলেও সে রকম কোনো অভিজ্ঞতায় মনকে সমৃদ্ধ করে না।"

অসুবিধেটা হয়েছে এইখানে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় কোনো একটা ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী ছিল না, ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জটিল সম্পর্কের কয়েকটি আপাত অসম্পৃক্ত দৃশ্য, বুর্জোআ ও পেটি-বুর্জোআর সামাজিক স্ট্যাটাস-জনিত দ্বন্দ্ব, জরিষ্ণু বুর্জোআ সমাজের ভ্রান্ত সম্পর্ক (বিশেষত, বিবাহ-সম্পর্ক) ও ছদ্ম-ইউরোপীয়মন্যতা (হাঁচির শব্দে রায়বাহাদুরের থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া)—সব মিলিয়ে কতকগুলি বিমূর্ত ভাব বা আইডিআর সংঘাত, চিন্তার দরজায়

তার আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী। কিন্তু 'অভিযানে' রয়েছে এক আশ্চর্য গতিময়তা, নিটোল একটি কাহিনী, এবং চোখ ও মনকে আকর্ষণ করার মতো আশ্চর্য অভিনয়, ক্যামেরার কাজ, দৃশ্যপট ও আরও অনেক কিছু। তদুপরি নরসিং-এর গাড়ির সঙ্গে প্রথম থেকে দর্শক ছোটার আনন্দটাই উপভোগ করে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় কিন্তু স্থির বিস্ময়ে সংলাপ অনুসরণ করা ছাড়া দর্শক অন্য কিছুতে ব্যাপৃত থাকতে পারত না।' 'অভিযান' "ঘটনাবহুল" বলেই ক্রিয়ার সংঘাত অর্থাৎ কন্‌ফ্লিক্ট অফ্ অ্যাকশান্‌টাই মনকে অধিকার করে থাকে, ভাবের সংঘাত অর্থাৎ কন্‌ফ্লিক্ট অফ্ আইডিআর অন্তঃশীলা ধারাটা চোখে পড়ে না। অথচ, এই ভাবের সংঘাতটা ভালোভাবে উপলব্ধি করলে আমরা মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এ ন অনেক অভিজ্ঞতাই পেতে পারি যা আমাদের বোধকে সত্যিসত্যিই ফলশ্রুতিতে সমৃদ্ধ করবে।

ধ্রুববাবু ঠিকই বলেছেন, "অভিযানকারী চরিত্রটির…সমস্যা দ্বিবিধ—সামাজিক স্তরভেদের নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের প্রচেষ্টা, এবং একই সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীর সঙ্গে সম্পর্কজনিত জটিলতা।" কিন্তু তাঁর মতে সমস্যা দুটি লঘুভাবে চিত্রিত হয়েছে, এবং অভিযানকারী চরিত্র "নরসিং আমাদের কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য বলিষ্ঠ প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।"

কিন্তু প্রশ্নটা এই, নরসিং-কে কি সত্যজিৎ রায় কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিভূরূপে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন? শেষ দৃশ্যে জোসেফ চলে যাওয়ার পর নরসিং-এর অরুন্তুদ আত্মজিজ্ঞাসা, এবং গুলাবীকে সুখনরামের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে এই সত্যই মূর্ত হয়ে ওঠে যে নরসিং কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ নয়, সেই শ্রেণীটির নৈতিকতার প্রতীক। নরসিং-কে যদি প্রলেতারিএতের প্রতিভূ বলা হয়, সেটা বোধহয় ভুল বলা হবে, সে প্রলেতারীয় নীতিবোধের প্রতীক। এবং 'অভিযান', প্রকৃতপক্ষে বুর্জোআ মায়া ভেদ করে প্রলেতারীয় নীতিবোধের, যথার্থ এবং সুস্থ মানবিকতার মুক্তি অভিযান।

প্রথম দৃশ্যেই নরসিংকে দেখা যায় তারই এক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে-নরসিং কি সত্যিকারের নরসিং? তাই তাকে পর্দায় দেখানো হয় না, দেখানো হয় তার প্রতিবিম্বকে। নরসিং যদিও মোটর ড্রাইভার, এবং অপর মদ্যপায়ী নস্করও তাই—তাহলেও নরসিং নিজেকে তার সঙ্গে

একাত্ম ভাবে না। নম্বর বোঝায়, তারা দুজনেই মোটর ড্রাইভার, দুজনেই ট্রিপ দিচ্ছে—তফাৎটা কোথায়? নরসিং মানে না; সে হলো রাজপুত, আভিজাত্য তার বংশগত, সে 'ভদ্রলোক', নম্বরের মতো ছোটোলোক ড্রাইভার নয়। প্রথমেই তাই সত্যজিৎ রায় দেখিয়ে দেন, নরসিং মোটেই সাধারণ বা গড়পড়তা প্রলেতারিএত নয়, তার মধ্যে এঙ্গেল্স্‌-কথিত একপ্রকার "bourgeoise 'respectability'" রয়েছে। তাই সে 'তুমি' বললে ক্ষেপে যায়, 'মিস্টার সিং, জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান' হবার ইচ্ছা তার অদম্য। একা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল নরসিং, তিন বছরের চেষ্টায় সার্ভিস খুলেছিল, বুর্জোআ দুলালবাবু একচেটিয়া কারবার খোলায় তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেলো। "শালারা দাঁড়াতে দেবে না, নিজের পাওয়ে দাঁড়াবে তো মার ডাণ্ডা"—এখানে কিন্তু নরসিং-এর বুর্জোআ-বিরোধী স্বরূপ পরিস্কার হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভদ্রলোক হতেই হবে। যে শ্রেণীকে সে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে, তাদেরই সমগোত্রীয় তাকে হতে হবে। (বিলেতের রাগী ছোক্‌রাদের উপন্যাসবিশেষের নায়কের মতো) ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা হলো না, পাকচক্রে নরসিং জড়িয়ে পড়ল সুখনরামের সঙ্গে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—শুধু সার্ভিস খোলা নয়, একেবারে তিন মাসের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে ট্রান্সপোর্ট কম্পানির একচেটিয়া কারবারে অংশীদার হওয়ার সুযোগ। হায়রে! যে-একচেটিয়া কারবারের প্রকোপে তাকে কারবার গুটোতে হলো, শ্যামনগরে সে আবার সেই একচেটিয়া কারবারেরই অংশীদার হচ্ছে! ভদ্রলোক হওয়ার আকাশকুসুমে সে প্রথমেই বিসর্জন দিল তার স্বভাবজ মানবিক নীতিবোধ, অবহেলা করল গুলাবীর প্রেম, স্বীকার করল আফিম চালান দেওয়ার বেআইনী দুর্নীতিমূলক কাজ করতে। বুর্জোআ-ভবনের স্বপ্নসাধে নরসিং ভুলল তার স্বাভাবিক প্রলেতারীয় সত্তাকে।

যে-লাইটার গ্রহণের মাধ্যমে সত্যজিৎবাবু প্রলেতারীয় নৈতিকতার বর্জন প্রতিভাত করেছিলেন, সে লাইটার কিন্তু বারবার ধরিয়ে দিয়েছে—এ মেকী, এ খাঁটি নয়। সন্দেহ করেছে বাস-ড্রাইভার, জোসেফ, সবাই। প্রলেতারিএতের এ বুর্জোআত্বের ভান কারুর কাছে ঢাকা পড়ে নি। শেষ দৃশ্যেও নরসিং-এর আত্ম-উপলব্ধি বোঝানোর জন্য সত্যজিৎবাবু সেই প্রতীকেরই ব্যবহার করেছেন, লাইটারটা বিসর্জন দেওয়ায় তার সেই প্রাকৃত সত্তার পুনরুজ্জীবনই পরিস্ফুট হয়েছে। অনিকেত ফিরেছে ঘরে।

মোহের কি শেষ নেই? নরসিং তার সেই প্রিয়তম গাড়ি, ক্রাইসলার ৩০-কেও ভদ্রলোক হবার আশায় ছেড়ে দিতে রাজি আছে! একটু দুঃখ অবশ্য হয়, কিন্তু ভদ্রলোক হবার রঙীন স্বপ্নের কাছে সে কিছুই নয়। থাক গাড়ি। রামা পারল না, গাড়ি ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তবু মোহাচ্ছন্ন নরসিং-এর মোহভঙ্গ হলো না। জেনে শুনে চলল আফিম চালান দিতে। এসে দাঁড়াল গুলাবী। 'এতে পাপ নেই?' কিন্তু নরসিং অন্ধ। দুনিয়া জুড়ে পাপ চলেছে, সে তো নিমিত্তমাত্র। পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ বোধ তখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সে ভদ্রলোক হতে চলেছে। পথে জোসেফ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কথা বলতেই ইতস্তত করছিল নরসিং, হঠাৎ ধরা পড়ে গেল জোসেফের কাছে। জোসেফ ত্যাগ করল তাকে। আর নরসিং? নির্বান্ধব জায়গার একমাত্র বন্ধু জোসেফ-কে ক্রুদ্ধ নরসিং মেরে বসল! ভদ্রলোক হতে গিয়ে এ কী অমানুষ হয়ে গেছে সে?

'সাবাস রাজপুত!' নরসিং-এর কি মনে পড়ে গেল আগের কথা। নিজের কাছে সে কি নিজেই বেইমানি করছে না? সে যে আজ একা! রামা নেই, গুলাবী নেই, জোসেফও চলে গেল। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা —এ সব হারিয়ে সে কি করে বাঁচবে? ফিকে হয়ে এলো ভদ্রলো হবার, বুর্জোআভবনের বাসনা। সবাই চলে গেলে ট্রান্সপোর্ট কম্পানি নিয়ে সে কী করবে? পাপ, অন্যায়—এ-পথে যদি ভদ্রলোক হতে হয়, তবে কী প্রয়োজন সেই ভদ্রলোক হওয়ায়? ফিরে আসবে সে, ফিরে আসবে আবার সেই লুপ্ত মনুষ্যত্বে, প্রত্যাবর্তন করবে প্রলেতারীয় নৈতিকতায়—যা বৈষয়িক সুবিধার জন্য পাপ-পুণ্য সমার্থক ভাবে না, ভাবে না বাঁকা পথে চলাটাই স্বাভাবিক, সোজা পথকে যে ন্যায়ের পথ বলে জানে। সুখনরামের গাড়ি থেকে গুলাবীকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরায় সোচ্চার হয়ে ওঠে প্রলেতারীয় নীতিবোধের জয়, বুর্জোআ দুর্নীতির তুলনায় তার শ্রেষ্ঠতরতার কথা।

"আবার গিরিবরজে দেখা হবে"—বলে চলে যায় নরসিং, রামা আর গুলাবী, জোসেফকে ছুঁড়ে দেয় সুখনরামের সেই লাইটারটা।

এতে কি কোনো শ্রমজীবী শ্রেণীর কথা বলা হয়, না, উচ্চতর শ্রেণীর আরোহণের ভ্রান্তিবিলাসই প্রতিপন্ন হয়?

অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, লঘুত্বের! হিউমারপ্রাধান্যের জন্যই কি নরসিঙের আচরণ হাস্যকর ঠেকেছে? কিন্তু, অন্তরে গভীরতা না থাকলে কী যথার্থ হিউমার আসে? নরসিং-এর ক্ষেত্রে সে-ভাষা বলা স্বাভাবিক, যা ভাবা প্রকৃতিসিদ্ধ—তা যদি আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকে, সেটাকে কোনো দোষ বলা যায় না। কারণ উচ্চতর শ্রেণী আরোহণের ইচ্ছাটাই হাস্যকর। এবং নরসিং-এর সঙ্গে রামার বিচ্ছেদ সাধনের পর হাসি আপনা থেকেই থেমে যেতে বাধ্য, গুলাবীর দৃপ্ত প্রত্যাখানে গভীরতা আরও কেন্দ্রিত রূপ নেয়, এবং জোসেফকে মেরে ফিরে আসার সময় তা কঠিন, প্রস্তরীভূত হয়ে ওঠে। পর্বতকন্দরে সেই 'জোসেফ' ডাকের প্রতিধ্বনি, নরসিং-এর ছুটতে ছুটতে ফিরে আসায় যে অসামান্য মুহূর্তগুলি রচিত হয়—তা তো ব্যাপারটার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। অথবা যে সময়ে নরসিং লাইটারটি তুলে নেয়, বা ট্রান্সপোর্ট কম্পানি সংক্রান্ত কথাবার্তা বলে, সেখানে তো গাম্ভীর্যের কোনো অভাব ছিল না। মূল মুহূর্তগুলিতে যখন ত্রুটি নেই, তখন রসগ্রহণের ক্ষেত্রেই বা ক্ষতিটা কোথায়?

এ ছাড়া, ধ্রুববাবু একবার অনাবশ্যকভাবে 'অযান্ত্রিক'-এর উল্লেখ করেছেন। একমাত্র গাড়ির common factor ছাড়া আর কী কারণে যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও ভিন্নবক্তব্য চিত্রের প্রতিতুলনা করা হয়—বুঝলাম না। 'অযান্ত্রিকের' মতো প্রথম শ্রেণীর ফিল্মে 'অভিযানের' বক্তব্য আরোপ করলে যে ফল হতো, 'অভিযানে' 'অযান্ত্রিকে'র গুণ নেই—বললে ব্যাপারটা ততোধিক খারাপ দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎ মিত্র

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শেষ রোমান্টিক সুরস্রষ্টা

ফ্রেডারিক ডেলিয়াস (১৮৬৩-১৯৩৪)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মারা গেলেন আর্থার সুলিভান্। সুলিভান্ ছিলেন এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক সুরকার, সৃজনশীল কন্সার্টো-রচয়িতা এবং জনপ্রিয় অপেরা পরিচালক। তাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডের সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিল।

এডওয়ার্ড এল্গারের যুগ তখন। তাঁর 'ড্রিম অব জিরোন্টিয়াস্' সবে মঞ্চস্থ হয়েছে ; তাঁর সুরসৃষ্টির খ্যাতিতে চতুর্দিক মুখরিত। এল্গারের মৌতাত কাটিয়ে উঠে অন্য সুরকারের দিকে কান দেবার মতো তখন কারো মনের অবস্থা নয়। সাবেকী একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি এবং চটুল রস উৎপাদনের প্রচেষ্টা সঙ্গীতকে ক্রমশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীরাও সঙ্গীতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। জর্জ বার্ণার্ড শ' ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কতটা বলবার মতো জানি না. তবে কথা হলো লণ্ডনে সঙ্গীত জিনিসটা মরতে বসেছে।'

ফ্রেডারিক ডেলিয়াস নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের সঙ্গীতের এই দুর্দিনের প্রত্যক্ষদর্শী। সঙ্গীত জগতের এই সংবর্ত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ডেলিয়াস ঠিক এই সময়েই সুরসৃষ্টির জগতে প্রবেশ করলেন এবং তারপরই বোঝা গেল সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। বছর কয়েক আগে ডেলিয়াসের সঙ্গীত-কৃতির মূল্যায়ন করেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও সুরকার টমাস্ বীচ্হাম। বীচ্হামের মৃত্যুর পর ডেলিয়াসের নাম আজ আবার লোকে ভুলতে বসেছে।

সুরের উৎস

অসুস্থতা ও পারিবারিক নানারকম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে ডেলিয়াসের শৈশব কেটেছে। কিন্তু তিনি সব ব্যথা বেদনার সান্ত্বনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে। প্রথম জীবন তাঁর বৈষয়িক উন্নতির ব্যর্থ চেষ্টায় কাটে ; তারপর শুরু হয় তাঁর সঙ্গীতের জীবন। ছোটবেলা থেকেই মোৎজার্ট

ও শোপ্যার সুর তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করত। সুরের জগতে প্রবেশ করেই ডেলিয়াস ফ্লোরিডাতে ফিবে এলেন বসবাসের জন্যে। সুরসৃষ্টির রহস্যের দ্বার এই সময়ই তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়। তিনি সর্বসময়ই বিশ্বাস করতেন যে, সুর রচনা নির্ভর করে সুরকারের ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর, বাইরের জগৎ ও পরিবেশ তাকে রূপ দিতে সাহায্য করে মাত্র। কোনো ব্যাকরণ, কোনো ধরাবাঁধা পদ্ধতি সুরসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ বলে তিনি কখনই মেনে নেন নি। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মূলমন্ত্র ছিল : "composition like contemplation cannot be tought."

প্যারিসে কিছুদিন গর্গ্যা ও স্ট্রিণ্ডবার্গের সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন ডেলিয়াস্। গর্গ্যার প্রিয় শিষ্যা জেল্‌কা রোশেনকে বিবাহ করার পর ডেলিয়াস্ জীবনের নতুন মূল্য খুঁজে পেয়ে ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেল্‌কা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। গ্রেজ নামে একটি সুন্দর গ্রামে গিয়ে ডেলিয়াস্ দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁর অনুপ্রেরণার কেন্দ্র ছিল। 'ইন্ এ সামার গার্ডেন', 'সামার নাইট ইন এ রিভার' ও 'অন হিয়ারিং দি ফার্স্ট কুকু ইন স্প্রিং' তিনি এখানেই রচনা করেছিলেন। এই তিনটি রচনাই ইংলণ্ডের সঙ্গীত জগতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সুরের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক কালে ইংলণ্ডের প্রায় কোনো অনুষ্ঠানেই সুখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালকেরা ডেলিয়াসের সুর পরিবেশন করেন না এবং স্বভাবতই তাঁর রেকর্ডও খুব দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রে ডেলিয়াসের কোনো রচনাই শোনানোর রেওয়াজ না থাকায় ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে ডেলিয়াসের পরিচয় এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সার টমাস্ বীচ্‌হামের কল্যাণে গত তিন বছর ধরে কখনও কখনও কদাচিৎ ডেলিয়াসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পরিচয় আমরা কিছু কিছু পেয়েছি।

ডেলিয়াসের সঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন না থাকার উৎস সন্ধান করতে গেলে একটা বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ডেলিয়াসের সুর গভীর ধর্মীয় অনুভূতি থেকে উৎসারিত। কিন্তু আবার খুব বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি কখনও স্তোত্র

রচনায় নিযুক্ত থাকেন নি। এই কারণেই সম্ভবত চিরপ্রচলিত ধারা ও আঙ্গিকের আওতায় ডেলিয়াসের রচনা কখনও পড়ে নি। 'প্যারি' ও 'সং বিফোর সান্‌রাইজ' এই দুই রচনা শুনলে মনে হয় সবকিছু বন্ধন ছিন্ন করে প্রচণ্ডবেগে সুরের গতি যেন ছুটে চলেছে। ডেলিয়াসের জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুই রচনায় খুব সজীব হয়ে উঠেছে। ডেলিয়াস সব সময়ই সঙ্গীতের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই কারণেই তাঁর রচনায় সহজ কোনো আবেদন নেই। মনে হয় অর্কেস্ট্রা ও সমবেত সঙ্গীতের মিশ্রণে 'অ্যাপোলেসিয়া' ডেলিয়াসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বীচ্‌হ্যামের পরিচালনায় এই সৃষ্টি যেন অনবদ্য হয়ে উঠেছে। অ্যাপোলেসিয়া' উত্তর আমেরিকার প্রাচীন রেড্ ইণ্ডিয়ান নাম। মিসিসিপি নদীর গতির ছন্দের একটা কাল্পনিক রূপায়ণ এই সুরের তাল ও লয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অতীতের নিগ্রো ক্রীতদাসদের অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত জীবনের এক অসামান্য ছবি ডেলিয়াসের সুরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হারমনির দিক দিয়ে বিচার করলে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে এমন মহান্ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল।

'ব্রিগফেয়ার' সিম্‌ফনি ডেলিয়াসের সঙ্গীতবহুল জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দুজন গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার সুখাবিষ্ট জীবনের কয়েকটি মুহূর্তই এই সৃষ্টির প্রাণ। এই সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এর অবদান অপরিমেয় :

> "It was on the fifth of August
> The weather fine and fair
> Unto Brigg fair I did repair
> For love I was inclined,"

ডেলিয়াস নিজে একে 'ইংলিশ র‍্যাপ্‌সডি' বলে অভিহিত করেছেন।

বিদেশী সুরের প্রভাব

স্বদেশের লোকসঙ্গীত ও বিদেশী সুরের মিলন ঘটিয়ে ফ্রেডারিক ডেলিয়াস আধুনিক সুরস্রষ্টাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ফ্রান্সের সুরের সাবলীল ছন্দ এবং বিশেষ করে শোপ্যাঁর রীতিই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। 'এ সং অব এ গ্রেট সিটি' ফ্রান্সে রাত্রিযাপনের এক নিবিড় অনুভূতির ওপর রচিত। নরওয়ের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ তার প্রগাঢ় মাদকতা। ছন্দবিহীন বিষণ্ণ সুরই

নরওয়ের সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সুরের সঙ্গে ব্রিটেনের অর্কেস্ট্রা প্রয়োগ করে ডেলিয়াস 'ওয়ান্স্ আপন্ এ টাইম' রচনা করেছিলেন। সমবেত-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ডেলিয়াস অভিনব আঙ্গিকের সূচনা করেছেন। তাঁর 'এ ম্যাস অফ লাইফ' ও 'সী ড্রিফ্‌ট' আজও পৃথিবীর বিস্ময়। 'এ ম্যাস অফ লাইফ' নীট্‌শের 'দাজ্ স্পেক জরথুস্ত্র' প্রভাবে রচিত। এ সৃষ্টি যেন জীবনের জয়গান। অতিমানব জরথুস্ত্র হাসির শক্তি ঘোষণা করলেন উচ্চমানবতার কাছে। সুরের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হলো যখন জরথুস্ত্র প্রেমের চিন্তায় মগ্ন হলেন। গ্রীষ্মকালের তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে জরথুস্ত্রের সব বিষাদের অবসান ঘটল, কিন্তু রাত্রির দুঃখের রহস্য তিনি উপলব্ধি করলেন—"Joy craves eternal, never-ending day." হুইটম্যানের 'সী ড্রিফ্‌ট'-এর বেদনাময় কাহিনীর সমস্ত সূক্ষ্ম সংবেদনকে ডেলিয়াস আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রুতিসুখকর করে তুলেছেন। 'এ ভিলেজ রোমিও জুলিয়েট' পাশ্চাত্ত্য অপেরার ইতিহাসে এক অক্ষয় সৃষ্টি।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও ডেলিয়াস্

ডেলিয়াসের পর থেকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের যে ধারা তাতে 'জ্যাজ্'-এর প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায়। চটুল সুরসৃষ্টির উন্মাদনায় আজকের জগতের সুরকারেরা দীর্ঘ সময় নিয়োগ করে থাকেন এবং ডেলিয়াসের সৃষ্টি যেন এর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রোমান্টিকতার ছাপ স্পষ্টভাবে অনুভবগম্য এবং তা অন্তর স্পর্শ করে। স্বপ্নময় আত্মস্থ চৈতন্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতায় শ্রদ্ধা অনুভব না করে পারা যায় না। ডেলিয়াসের জীবনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করি।

সুহাস চৌধুরী

নাট্য প্রসঙ্গ

ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের অভিনয়

বিদেশী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ের পথ নানা কারণে বন্ধুর ; তবু পরিবহনের সমস্যা কম বলে সচেষ্ট হয়ে সে পথ কালেভদ্রে সুগম করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিদেশী নাট্যশিল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের উপায় সঙ্কীর্ণতর হয়েছে প্রধানত পরিবহনের ঝামেলা থাকায়। সত্যজিৎ রায়ের কোনো ছবি সহজেই ইউরোপ আমেরিকায় দেখানো যেতে পারে, কিন্তু 'রক্তকরবী' বা 'পুতুল খেলা'-কে ইউরোপীয় দর্শকের সামনে উপস্থিত করায় হাজার বাধা। তাছাড়া মূলত দৃশ্যবাহী হওয়ায় চলচ্চিত্রের আবেদন সহজে বিশ্বজনীন করা যায়—ভাষান্তর, সহলিপি ইত্যাদি যান্ত্রিক উপায়ে তা সহজতর করা যায়। কিন্তু মূলত বাক্যবাহী হওয়ায় নাটকের পক্ষে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অবশ্য ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের রসগ্রহণে ভাষার পার্থক্য এদেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রধান অন্তরায় নয়। গ্যারিক—আর্ভিং—টেরী—থর্নডাইক—গিলগুড—রেডগ্রেভ—অলিভারের দেশের নাট্যাভিনয় দেখতে স্বভাবতই আমরা উৎসুক হয়েই থাকি। দুর্ভাগ্যবশত সুযোগ ঘটে অল্প এবং সাধারণত যাঁরা আসেন তাঁরা সে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ক্ষমতার পরিচয় বহন করেন না। এ অবস্থায় ব্রিস্টল ভিকের ভারত-আগমনের বার্তা স্বভাবতই আমাদের উদগ্রীব করেছিল।

শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করা সত্ত্বেও লণ্ডনের ওল্ড ভিককে ব্যবসাগত পরাভবের দরুন লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরোতে হয়েছিল। এককালে এতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা অভিনয় করতেন। আজও এঁদের অনেকে দেশে দেশে অভিনয় করে বেড়ান—সম্প্রতি মিশরে গ্রীক নাটকের অভিনয় করেছেন, ভিভিয়ান লী ছিলেন প্রধান অভিনেত্রী। পুরনো দলের একটি শাখা 'আর্টস্ কাউন্সিল অব গ্রেট ব্রিটেন'-এর উদ্যোগে ব্রিস্টলের থিয়েটার-রয়ালে ১৯৪৬ সালে অভিনয় শুরু করে। এই হলো 'ব্রিস্টল ওল্ড ভিক'-এর জন্মকথা। ব্রিস্টলের অধিবাসীরা বহুকাল থেকে নাট্যসচেতন। থিয়েটার-রয়াল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৬৬

খ্রীষ্টাব্দে; আর এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গ্যারিকের মতো অভিনেতা। অতএব, এই দল যে বিশেষভাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পের ঐতিহ্যবাহী—এ বিশ্বাসের ভিত্তি আছে।

তিনটি মাত্র অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচনে এঁরা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শেক্সপীয়র তর্কাতীতভাবে অপরিহার্য। আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসাবে বার্নাড শ-র তাৎপর্য অনস্বীকার্য, আর আধুনিক পবে রাগী ছোকরাদের বিক্ষোভের বদলে এঁরা নিও-ক্লাসিসিস্টের মননশীলতাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করে ভালো করেছেন।

'হ্যামলেট'-এর জনপ্রিয়তা বহুকাল থেকেই কিংবদন্তীর আকার ধারণ করেছে। এই নাটককে কেন্দ্র করে বিদগ্ধকুলের বাগবিতণ্ডাও সুপরিচিত। ব্রাডলির দার্শনিক আলোচনাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে জে. এম. রবার্টসন বলেন, 'It (Hamlet) makes superb entertainment' কিন্তু 'it leaves the critical intellect unsatisfied'. টি এস. এলিয়ট-এর মন্তব্যও এই ধরনের। ট্র্যাজেডি হিসাবে 'হ্যাম্‌লেট'-এর শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের উপযুক্ত ক্ষেত্র এটা নয়, কিন্তু শেক্সপীয়রের একটিমাত্র নাটক অভিনয় করতে হলে 'হ্যামলেট'-এর নির্বাচন নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। পরিচালক ডেনিস কেরী এ নাটকটিকে এলিজাবেথান্ সারল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন। অল্প সরঞ্জাম আর অল্প জনবল নিয়ে রাজসভা, কবরখানা, মূকাভিনয়ের দৃশ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে রচিত হয়েছিল। হ্যামলেটের ভূমিকায় ২৯ বছর বয়স্ক সুদর্শন অভিনেতা ব্যারী ওয়ারেনের অভিনয় অন্তরস্পর্শী হয়েছিল। তাঁর চিত্রণে দার্শনিক বা বিজ্ঞ হ্যামলেটকে না পেয়ে অনেকে তাঁকে 'আধুনিক রাগী-ছোকরা হ্যামলেট' বলে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ত যুবকের আত্মদাহ তাঁর অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকট হয়েছিল। সকলেই জানেন, বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ডাইমেনশন-সম্পন্ন এইসব চরিত্র বিভিন্ন অভিনেতার বিভিন্ন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। ওয়ারেনের ব্যাখ্যায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় ছিল—দুঃখের বিষয়, দু-একটি জায়গায় মার্কিনী ঢঙের উচ্চারণ কর্ণপীড়ার কারণ হয়েছে। সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বরের অধিকারী অলিভার নেভিল্ ক্লডিয়াসের চরিত্রে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই দুজনের প্রশংসনীয় ব্যক্তিগত অভিনয় সত্ত্বেও হ্যামলেট শেষ পর্যন্ত সার্থক হলো না অন্যান্য চরিত্রের দুর্বল অভিনয়ের জন্য। পোলোনিয়াসকে হাজির করা হয়েছিল

বিদূষকের মতো; গার্ট্রুড আর ওফেলিয়ার প্রাণহীন অভিনয় দেখে তাঁদের মঞ্চঅভিজ্ঞতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অন্যায় নয়। ওফেলিয়ার চরিত্রে সারা বাডেল নিজেকে সুগায়িকা বলে পরিচিত করলেন মাত্র, বাকি সময়ে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সহ-অভিনেতৃবর্গের অভিনয় উপভোগ করেছিলেন। গার্ট্রুড রূপে ইভান্ কোলেং (পরিচালক ডেনিস ক্যারীর স্ত্রী) কোনোরকমে পংক্তিগুলি আবৃত্তি করে গেলেন মাত্র, তাঁর অক্ষমতার জন্য শয়নকক্ষে 'হ্যামলেট'-এর সুঅভিনয় সত্ত্বেও প্রত্যাশিত নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হলো না। প্রেতাত্মার পরিকল্পনাটি কৌতুকবহ হয়েছিল।

অপটু অভিনয়ের জন্য শ-এর 'আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান'ও শেষ পর্যন্ত বিশেষ সার্থক হয় নি। শ-এর নাটক সম্পর্কে ডাইড্যাক্টিক বা 'দেখবার নয়, পড়বার' বলে যে বদনাম বা সুনাম প্রচলিত আছে সেটা অন্তত পক্ষে 'আর্মস এণ্ড দি ম্যান' সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এ নাটককে মঞ্চসফল করা খুব কঠিন কাজ নয়, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সে সফলতা অর্জিত হয় নি। প্রযোজনাগত গুণপণার পরিচয় এতে কিছু কিছু ছিল। ফ্রেমের সাহায্যে রাইনার শয়নকক্ষের সেট্ বেশ ভালোভাবে নির্মিত হয়েছিল—সে দৃশ্যে আলোকসম্পাতেও কল্পনাশক্তির ছাপ ছিল। বাগানের দৃশ্যটি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বা শিল্পসম্মত হয় নি। পেট্‌কফের লাইব্রেরির দৃশ্যটি আসবাবপত্রে যথাযথ হয়েছিল বটে, কিন্তু বই-এর তাকে হাল আমলের 'পেঙ্গুইন পেপারব্যাক' পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছে! এ-জাতীয় 'অ্যামেচারশিপ' ত্রুটি কোনো কুশলী দলের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নয়, তবে সু-অভিনয়ে এ-জাতীয় দোষ ঢেকে দেওয়া যেত। কিন্তু রাইনার (সারা বাডেল) অভিনয় নিতান্তই দুর্বল হওয়াতে এ নাটকের অ্যান্টি-রোমান্টিক কমেডির কৌতুক ফুটে ওঠবার সুযোগই পায় নি। রোমান্টিক আতিশয্য যথাযথভাবে চিত্রিত না করলে অ্যান্টি-রোমান্টিক কমেডির মেজাজ তৈরি হবে কী উপায়ে? ব্লান্‌স্‌লির ভূমিকায় জন্ বিংহাম আর পেট্রুকফের ভূমিকায় হিউ মানিং-এর ব্যক্তিগত অভিনয় বিশেষভাবে উপভোগ্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নাটক কোনোরকমে উৎরে গেছে।

কিন্তু শ বা শেক্সপীয়রের উপস্থাপনায় আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় না দেওয়ার অভাব পুরিয়ে দিয়েছেন এঁরা রবার্ট বোল্টের 'এ ম্যান ফর অল সিজন্‌স্'-এর উপস্থাপনার অসামান্য সাফল্যে। বছর দশেক আগে

ইংরেজি নাটকের জরদ্গবদশার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন 'রাগী ছোকরার দল'—অস্‌বোর্ন-এর 'লুক ব্যাক্ ইন্ অ্যাঙ্গার' ও-দেশের নবনাট্য আন্দোলনে 'নবান্ন'-এর কাজ করেছিল। কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ক্রোধের প্রকাশকে মূলধন করে বসে থাকা নবনাট্যকারদের পক্ষে বিশেষ বিধেয় বলে মনে হলো না—তাদের কল্পনা বৃহত্তর ও মৌলতর বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানী হলো। সমসাময়িক তুচ্ছতাকে অতিক্রম করবার পক্ষে ইতিহাস আশ্রয় করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হলো। স্বয়ং নাট্যকার বোল্টের ভাষায়: "An historical play relieves one of the shadows of Ibsen, O' Neill & S. Mangham, and puts one in the shadow of Shakespeare—a dangerous but exciting place for the play-wright to be. The reason why I wanted to unite in that style was that I wanted to unite about themes more fundamental than those afforded by a representation.... Historical characters are less likely to become bogged down in small idioms of behaviour."—এইভাবে নিও-ক্লাসিসিজমের সূত্রপাত করে ইংলণ্ডের নবনাট্যকার ব্রেখট্-এর কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছেন। এমন কি গতদশকের রাগী-ছোকরা অস্‌বোর্ণ নাটক লিখেছেন লুথারকে নায়ক করে, যদিও সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য আদর্শবাদী লুথারের খোলস ছিঁড়ে কামনাবাসনায় আক্রান্ত মানুষ লুথারের যন্ত্রণার উদ্ঘাটন। সে যাই হোক আধুনিক ইংরেজি নাটক শ্রমিকের রন্ধনশালার গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যাপকতর দেশকাল অভিমুখী হয়েছে। বোল্ট তাঁর 'এ ম্যান্ ফর অল্ সিজন্‌স্' নাটকে টমাস মোর-এর চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন রেনেসাঁস ম্যান-এর প্রতীক হিসাবে—তার মধ্যে অনমনীয় ব্যক্তিগত বিবেক আর উজ্জ্বল বুদ্ধির সমাবেশে এক অখণ্ড পুরুষ প্রত্যক্ষ করা গেছে। ব্রেখ্‌টীয় এপিক ড্রামার আদর্শে নির্মিত এই নাটক চিত্রনাট্যের মতো গতিসম্পন্ন এবং নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর উপস্থাপনায় পরিচালক ডেনিস্ কেরী প্রায় যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় দিয়েছেন। চলনের, আলোকসম্পাতের, অভিনয়ের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে এক ত্রুটিবিহীন ড্রামাটিক প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনয়ে সকলেই বিশেষ পারদর্শিতার

প্রমাণ দিয়েছেন। ক্রমওয়েলের ভূমিকায় জন্ রিংহ্যাম, নরফোকের ভূমিকায় হিউ ম্যানিং এবং রিচের ভূমিকায় ব্যারী ওয়ারেনের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য, এবং টমাস্ মোর-এর চরিত্রে অলিভার নেভিলের অসামান্য অভিনয় মহত্ত্বের আস্বাদ এনেছিল। শুধুমাত্র এই নাটকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দেবার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল আর হুমায়ুন থিয়েটার্স আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

পরিশেষে একটি কথা বেদনার সঙ্গে নিবেদন করছি। কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে ওল্ড ভিক দলকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সে সভায় শ্রীতাপস সেন ছাড়া আমাদের নাট্য আন্দোলনের কোনো যোগ্য প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় নি। আর বিদেশী অতিথিদের যে নাটকের ('সেতু') অংশবিশেষ দেখানো হয় গুণগত বিচারে তার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালো কিছু আমরা অতিথিদের কাছে পরিবেশন করতে পারতাম। বিদেশীরা আমাদের নাট্যশিল্প সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে গেলেন তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের ব্যাজস্তুতিতে। অথচ লজ্জার বিষয়, তাকেই স্তুতি ভেবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই নি। 'বহুরূপী' বা 'লিটল থিয়েটার'-এর নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী পরিবেশনের ব্যবস্থা করা কি একেবারেই অসম্ভব ছিল ?

ধ্রুব গুপ্ত

দেশজ চলচ্চিত্রের অতীত নিদর্শনগুলির উদ্ধার এবং সেগুলোর যথোচিত সংরক্ষণ, ভারতীয় চলচ্চিত্রের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা, সাধারণভাবে সেনসরশিপ নীতির পুনর্বিবেচনা এবং ফিল্ম-সোসাইটি-প্রদর্শনীর ছবিকে সেনসরশিপ থেকে মুক্তি দেওয়া (যা কি না প্রায় সব দেশেই হয়ে থাকে)—এইগুলি বিশেষ করে বিবেচ্য। চলচ্চিত্রের অগ্রগামী নেতাদের সঙ্গে চিত্ররসিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, এগুলোও ফিল্ম-সোসাইটিরই কাজ। আশা করি ফেডারেশন সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে না।

দুটি বিশিষ্ট ছবি : চ্যাপলিন

চ্যাপলিনের নামেই চিত্ররসিকমহলে সাড়া পড়ে। আর যে সব ছবির নাম শোনা আছে বা সে সম্পর্কে বহু জায়গায় পড়া গেছে সে সব ছবি দেখবার সুযোগ এলে একটা কেমন প্রত্যাশিত উত্তেজনা বোধ হয়। সম্প্রতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শিত চ্যাপলিনের "দি কিড" ছবিটি দেখেও অনেকেই নিশ্চয় সেরকম মুগ্ধ বিস্ময় বোধ করেছিলেন। "দি কিড" (১৯২১ সালে তোলা চ্যাপলিনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি) এর আগে স্ল্যাপস্টিক কমেডির জনক ম্যাক সেনেটের পরিচালনায় ও তার পরে কিছু দিন নিজে ছোট ছোট ছবি তৈরি করে চ্যাপলিন তখনই যথেষ্ট বিখ্যাত। চ্যাপলিনের সৃষ্টির দার্শনিক ভিত্তি "দি কিড" ছবিতেই প্রথম প্রকাশিত এবং সেই বিখ্যাত ভবঘুরে চরিত্রটিও তার পুরো চেহারা নিয়ে এই ছবিতেই প্রথম উপস্থিত। (এর আগে "দি ট্র্যাম্প" নামে ছোট ছবিটিতেও অবশ্য তার দেখা পাওয়া গেছে)। রাস্তার এক ছন্নছাড়া চরিত্র আর কুড়িয়ে পাওয়া একটি শিশুর (এই চরিত্রে জ্যাকি কুগানের অভিনয় অনবদ্য) মধ্যে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠা এক অদ্ভুত মমত্বময় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে "এক টুকরো হাসি আর একফোঁটা অশ্রুজল" নিয়ে এ ছবি রচিত। এই ভবঘুরের মধ্যে অবশ্য ভের্দুর তিক্ততা কিংবা ক্যাল্ভেরোর প্রৌঢ় বিষাদ প্রাপ্য নয়। সদানন্দ এই লোকটি নিজের খেয়ালে চলে। অনাহার অর্থাভাব কিছুই তাকে দমাতে পারে না। এই চরিত্র আর তার চারপাশের জগৎকে চমৎকার ভাবে এঁকেছেন চ্যাপলিন তাঁর ছবিতে। অভিনয় ভঙ্গীতে মোটামুটি নির্বাক চলচ্চিত্রের কৌতুক-অভিনয়ের ধারাই অবলম্বিত। চার্লি ও জ্যাকির সেই বিখ্যাত দৌড়, চার্লির অপরূপ মূকাভিনয় জানলা-সারানোর দৃশ্যের দমফাটানো মজা, পরকীয়ালোভী চার্লির দুরবস্থা,

চার্লি ও জ্যাকির প্রাতরাশের বখরা, এই দৃশ্যাংশগুলির মজা তো ভুলবার নয়। এর পাশাপাশিই আবার ভবঘুরের স্বপ্নস্বর্গ নির্মাণ, নির্জন পার্কে মা যখন ফেলে-যাওয়া-ছেলের খোঁজ করতে আসেন, খৃষ্টের ক্যালভারী-যাত্রা চিত্রের প্রয়োগ, এরকম নানা জায়গায় কৌতুকের আড়ালে ছবিটির মৌল গভীরতাও নজর এড়ায় না। এরপর প্রতি ছবিতেই অবশ্য চ্যাপলিন-প্রতিভার বিভিন্ন স্তর বিকশিত, তাঁর ক্ষমতার প্রথম স্বাক্ষর হিসেবে "দি কিড" ছবিটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

যুদ্ধোত্তর পূর্ব-জার্মানির চলচ্চিত্র-শিল্পে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। জার্মান চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যগত দৃশ্যধর্মিতা এবং বাস্তবচেতনা পূর্ব-জার্মান চলচ্চিত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে। এর সঙ্গে কাজ করেছে রুশ চলচ্চিত্রের সৃষ্টিশীল প্রভাব। এর ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যেই এ দেশের ছবি সারা পৃথিবীতেই নাম করেছে এবং যে কটি নিদর্শন আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে (এ প্রসঙ্গে উলফ্‌গাঙ স্টাউড্‌টের "মার্ডারারস্‌ আর অ্যামং আস্‌", "দি আণ্ডারডগ", কুর্ট-ইউং-অ্যালগেনের "ডিউপড্‌ টিল ডুম্‌স্‌ডে", "লিজি" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য) তাতে পূর্ব-জার্মান চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত। কনরাড্‌ উলফ্‌ নির্মিত "স্টার্স" ছবিটি এই দেশের চলচ্চিত্র-পঞ্জীতে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ছবিটি সিনে ক্লাব অফ্‌ ক্যালকাটার উদ্যোগে কয়েকদিন আগে দেখানো হয়েছে। কনরাড উলফের (ইনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় আসেন এবং এঁর পরিচালিত "প্রফেসর মামলক"-এর পুনর্নির্মিত সংস্করণ ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল) চিত্রনাট্য স্বচ্ছন্দ ও গতিময়, আবহনির্মানদক্ষতা ও সংযত চরিত্রায়ণ ছবিটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জার্মান যুদ্ধবন্দীশিবিরে একটি নাৎসী সৈনিক ও এক ইহুদী যুবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত এ ছবির প্রতি দৃশ্যে যুদ্ধের বীভৎসতা প্রকাশিত, অথচ কোথাও পরিচালক সোচ্চার নন। এমন কি একটা গুলির শব্দও বোধহয় শোনা যায় নি কোনো দৃশ্যে। অথচ সমস্ত ছবিতেই সব সময় একটা অশরীরী ভয়, একটা রুদ্ধশ্বাস .আতঙ্কের ছায়া উপস্থিত। ইহুদীদের খানাতল্লাসির দৃশ্যের চাপা নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধবন্দীদের গ্লানিময় জীবন, নাৎসী বিকৃতির প্রতিমূর্তি সেই লোকটি অন্ধকারে প্রেমিক-প্রেমিকার পিছু নেওয়া যার কাজ, অস্‌উইৎস্‌ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাবার সময় ট্রেনের দরজায় তালা লাগানো এবং খোলা হাওয়ার জন্য শিশুদের আকুলিবিকুলি, এরকম নানা দৃশ্যে শব্দ ও চিত্রের সমাহারে গঠিত এক সংহত কাব্যসুষমার ছাপ পাওয়া যায়।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

পুস্তক পরিচয়

The Lyric in IndiaPoetry—by Alokeranjan Das-Gupta ; Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta.

ছোট একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—মাত্র ১৩৬ পৃষ্ঠার, কিন্তু আলোচনাটি গভীর, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পরিচায়ক। জিজ্ঞাসা ছিল—ভারতীয় 'লিরিক'-এর, বিশেষ করে বাঙলা লিরিক-এর জন্মকথা। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এসব কবিতার জন্মকালে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি? আর, মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাসই বা ভারতীয় কবিতায় কবে থেকে এল, এল কি করে। এই জিজ্ঞাসার সূত্রে অবশ্য লেখকের প্রধান একটি অনুসন্ধেয় বিষয় হয়ে উঠল এই—বাহ্যত রাধাকৃষ্ণ বা অনুরূপ প্রেমলীলার কাঠামোর মধ্যেও কেমন করে বিশিষ্ট কবির বিশিষ্ট সত্তার আভাস ফুটে উঠেছে এই সব কবিতায়।

প্রবন্ধটি ইংরাজিতে লেখা। লিরিক কথাটি নিয়ে তাই লেখকের বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বাঙালী পাঠকের পক্ষে চলতি অনুবাদে লিরিক অর্থ হচ্ছে গীতিকাব্য বা খণ্ডকাব্য। এই প্রথম শব্দটি যদি বা গ্রাহ্য হয়, দ্বিতীয় শব্দটি কিন্তু এই আলোচনায় একটি বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে: যা খণ্ড বা অংশ, আপনাতে সম্পূর্ণ নয়, এমনি কবিতাই খণ্ড কবিতা। অথবা, আংশিকভাবে তার একটা রূপ আছে, যেমন মালার ফুল, কিন্তু সমগ্রভাবে মালার মধ্যেই সে সম্পূর্ণ। 'লিরিক' বলতে লেখক গ্রহণ করেছেন আমাদের সুপরিচিত 'গোল্‌ডেন ট্রেজরি'র সম্পাদক পল্‌গ্রেভ-এর সুবিখ্যাত সংজ্ঞা, যে কবিতার বিষয় মাত্র একটি ভাবনা, একটি অনুভূতি অথবা বিশেষ একটি পরিস্থিতি (সিচুয়েশন)। 'লিরিক' থেকে তাই পল্‌গ্রেভ বাদ দিয়েছেন যে সব কাহিনীধর্মী, বর্ণনামূলক বা উদ্দেশ্যবাচক কবিতা ও যাতে ক্ষিপ্রগতি, অনতিদীর্ঘতা, মানবহৃদয়ের রাগরঙ্গিমা নেই। 'গীতিকাব্য' কথাটাই লিরিক অর্থে গ্রাহ্য; বিশেষ করে লেখক যখন এই গীতিলক্ষণটিকেই করেছেন তাঁর আলোচনার প্রায় প্রধান লক্ষ্য। তবে 'পদকাব্য' বললেই আরও ভালো হয়। কারণ লেখকেরও আলোচ্য বাঙলা পদ-সাহিত্য।

আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের দুটিই প্রধান ধারা—পদকাব্য ও পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য। পদ হচ্ছে গীতিকাব্যেরই বাঙলা নাম, আর ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য ও দেশী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যকে বলা যায় আখ্যানপ্রধান বা কাহিনীপ্রধান কাব্য। তাও সুর করেই পড়া হতো, পাঁচালী করে গাওয়া হতো। ভাসান গানও গান। তবে পদকাব্যের মতো নির্দিষ্ট রাগে গাওয়ার জন্য রচিত নয়। চর্যাপদ থেকেই বাঙলা সাহিত্যের যাত্রা। পদ বাঙালী মনের প্রথম সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের বিষয়ও নিশ্চয়ই পুরনো। কিন্তু বাঙালী নিম্নবর্ণের জনসাধারণের মধ্যেই মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কথা উদ্ভূত হয়েছে—খাঁটি বাঙলার জিনিস। ব্রতকথার মতো কথায় হয়তো তা লালিত-পালিত হয়েছে মুখে-মুখে। তখনো উচ্চবর্ণ তার খোঁজও নিত না। পরে উচ্চবর্ণের এই অবজ্ঞার স্তর পেরিয়ে এই নিম্নবর্ণের দেবতারা কুলীন দেবতাদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন। তাঁদের মাহাত্ম্যকাহিনীও বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে উচ্চবর্ণের কাব্য-রচয়িতাদের নিকটে। কারণ, পদ যেমন বাঙালী অন্তর্মুখী মনের একদিকের সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যও তেমনি তার বাস্তবমুখী মনের প্রমাণ। ভাবপ্রবণতা আমাদের নিশ্চয়ই মনের প্রধান ধর্ম, কিন্তু জীবনযাত্রার সহজ আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবপ্রবণতাও তার মনেরই ধর্ম। এ প্রশ্ন অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়, তবুও স্মরণীয়। কথা হলো, গীতিকাব্যরূপী পদকাব্যের মূল কোথায়? শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেন তার প্রথম আভাস খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাওয়া যায়—গীত ও মঙ্গলকাব্যে কথার মতো লোকজীবনের ও লোকরীতিরই দান। কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিরা এই লোকচর্যাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন নাটকে। উচ্চগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মৌলিক নয় বলেই নাট্যকাররা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে কৃত্রিম নিয়মে করেছেন গীতির বাহন—সংস্কৃতকে নয়, শৌরসেনী প্রাকৃতকেও নয়। কোনো অপভ্রংশ কবিরা কিন্তু এর পরের স্তরে গীতিকাব্যধর্মিতাকে অপভ্রংশ কাব্যে সহজেই গ্রহণ করতে পারলেন, কারণ বৌদ্ধ ও জৈন কবিদের কাছে উচ্চবর্ণের বেদ-বেদান্ত-শাসিত জীবনযাত্রা ছিল অগ্রাহ্য। লোকচর্যার নৃত্য গীত প্রভৃতি সহজে তাই তাঁদের কাছে সমাদর পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, লোকজীবনে নৃত্যগীতকাব্য প্রায়ই থাকে বিজড়িত, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ হয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বৌদ্ধ ও জৈন অপ্রভ্রংশে তাই কাব্যের সঙ্গে

গীতের ও নাট্যের একেবারে ছাড়াছাড়ি হয় নি। অলোকরঞ্জনবাবু চতুর্মুখ, স্বয়ম্ভূ, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি জৈন কবিদের লেখা থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এঁদের পরেই সেই গীতিধারার প্রকাশ ঘটে আদি-বাঙলা কবিতায় 'চর্যাপদে'—লেখকের মতে বৌদ্ধ সহজিয়ারাও বৌদ্ধ বলেই এই পদ-রূপকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছেন। যাই হোক, 'চর্যাপদে' এসে আমরা প্রথমত পয়ার জাতীয় 'পদ' পেলাম। দ্বিতীয়ত, তা স্তবকীবদ্ধ আর তা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত মিত্রাক্ষর কবিতা। তৃতীয়ত, তা ভারতীয় চিরায়ত সঙ্গীতের 'প্রবন্ধ-সঙ্গীতে'র ধারায় বিকশিত গীতিকবিতা। এর মধ্যে পয়ারের যোগ রয়েছে অপভ্রংশ ১৬ মাত্রার 'পদ্ধতিআ'র সঙ্গে। অন্ত্যানুপ্রাস এল লোকচর্যার থেকে (মুখ্যত স্মৃতির সহায়ক রূপেই হয়েছিল মিত্রাক্ষর 'ধুর' বা ধুয়ার উদ্ভব)। আর কীর্তনের ক্ষুদ্র গীত বা পদ সহায়তা পেয়েছিল লোকগীত থেকে যেমন, তেমনি চিরায়ত সঙ্গীতধারা থেকে। কীর্তনের ছায়ালগ এরূপ মিশ্র রাগ—এই হলো সঙ্গীতজ্ঞদের কথা। এছাড়া, হালের 'গাহাগও সঈ'র কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে সবরিপাদের প্রসিদ্ধ চর্যাটি ('উঁচা ঐঁচা পবত' ইত্যাদি) তুলনা করলে দেখা যাবে কী আশ্চর্য মিল দু-এর রূপকল্পেও। এইরূপ রূপকল্পও সংস্কৃত কাব্যের নয়। যাই হোক, 'চর্যাপদের' পরে আসে প্রথম জয়দেবের গীতগোবিন্দ—যা অনেকের মতে মূলের বাঙলা পদের উপরে সংস্কৃতের প্রলেপ মাখানো। রাধাকৃষ্ণ গাথা একটা রাগরঞ্জিত সঙ্গীতবস্তুরূপে সর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে গীতগোবিন্দের প্রসারে। আর তারপর এল বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রাজশেখর, শশিশেখর প্রভৃতির পদাবলী। একদিকে এ সব পদ (রবীন্দ্রকাব্যের মতো) অপূর্ব কাব্য। অন্যদিকে কীর্তনের যোগে রাগতাল যুক্ত গীত। আর, সবই আবার একদিকে বৃন্দাবনলীলার মিলন-বিরহ-গাথার মধ্যে মাল্যাকারে গ্রথিত ক্ষুদ্র গীত। অন্য দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ও অধ্যাত্মলীলার কীর্তন অবকাশেও কবির বিশিষ্ট সত্তার অল্পাধিক আত্মপ্রকাশে লিরিক-এর এই বিশেষ ধর্মে আলোকিত। অতি-সংক্ষেপে এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য এ সব কথা। কিন্তু শুধু তা বললে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ, বহু অন্য প্রতিপাদ্য ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুল্লেখিত থাকে। আর, তাঁর বিদ্যাবত্তার ও আলোচনা পদ্ধতিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। যেমন, বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা; সঙ্গীত, মিল ও ধুয়া; কিম্বা নৃত্যগীত ও

মিল এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিচার—এ সব প্রতিটি আলোচনা নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু এখানে স্থানাভাব স্বীকার করতেই হবে।

এই বিশ্লেষণ ও বিচারে তিনি ভারতীয় পুঁথিপত্র ব্যতীত ইওরোপীয় পণ্ডিতদের (কার, কুর্টিস হুইদিঙ্গা প্রভৃতি) নানা বিচার উদ্ধৃতি করে ভারত-ক্ষেত্রে তাঁর প্রযোজ্যতা বিচার করেছেন বিচক্ষণ ভাবে।

যে দু-একটি বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায় শুধু তাই এখানে উল্লেখ করা তবু প্রয়োজন। যেমন মুখ্য কথাটা এই—ভারতীয় লোকচর্যার কথা সংস্কৃত ভাষার কথায়, কাব্যে, সাহিত্য-পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত হত না। এ কথা ঠিক। কিন্তু 'সংস্কৃতের বিষয়বস্তু' বলে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বিরাট ভাণ্ডারকে নির্দেশ করেছেন (তা সংস্কৃত ভাষা বা তৎ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাষাতেই নিবদ্ধ) তাতে বহু পরিমাণেই এসে মার্জিত, অর্ধমার্জিত ও অমার্জিতরূপে সঞ্চিত হয়েছিল ভারতীয় লোকচর্যার বস্তু—কথা কাহিনী, ধ্যান-ধারণা, এমন কি প্রকাশরীতিভঙ্গিও কতকাংশে। এগুলো 'সংস্কৃতের বস্তু' হওয়াতে সর্বভারতের উত্তরাধিকারও হয়ে গিয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সকলের। তবু লোকচর্যার আরও অনেক বস্তু যা তখন অবজ্ঞাত ছিল তা স্বীকৃতিলাভ করে জৈনদের হাতে, বৌদ্ধদের হাতে, এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুদেরও হাতে (যেমন, মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু)। এই প্রক্রিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগ ব্যাপী বরাবর চলেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ বিশেষ নেই—পদ সাহিত্যেরও মূল ওই লোকচর্যার মধ্যেই নিহিত। এজন্যই চর্যাপদকে নববৌদ্ধ সহজিয়ার সৃষ্টি অপেক্ষা সিদ্ধাচার্য বা সহজিয়াতান্ত্রিকদের গুরু পরম্পরায় উপদিষ্ট তত্ত্বোপদেশ বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধদের দৌরাত্ম্য, শূন্য, প্রভৃতি ধারণাগুলোকে তা গ্রহণ করলেও যে যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া চর্যাপদের উদ্দিষ্ট তা একান্ত করে বৌদ্ধদের নয়। তাই সহজিয়া তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম লোপ পেলেও বৈষ্ণব সহজিয়া পদ রূপে টিকে আছে।

এ কথা বলা অপ্রশংসাসূচক নয় যে, যে-গভীর ও গুরুতর আলোচনার সূত্রপাত শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এ.প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে করেছেন তার শেষ হয়ে গেল না। বরং তা আরম্ভ হলো বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি স্বল্পায়তনে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এ বিশেষ কৃতিত্বের কথা—তাঁর পদ্ধতি ও মতামত দুইই উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এ বিচার তিনি উপস্থিত করলে তা অনুধাবন করা সহজতর হতো।

প্রিয়দর্শী পাঠক

সংস্কৃতি সংবাদ

উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস

সম্প্রতি মার্কিন কবি উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস লোকান্তরিত হয়েছেন। ইংরাজী ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মসের নাম জড়িত। আধুনিক কবিতাব সূত্রপাতে টি. ই. হিউম ও পরে এজরা পাউণ্ডের নেতৃত্বাধীনে ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের ভূমিকা নিতান্ত কম নয়। চীনা ও জাপানী ক্লাসিক কবিতার চিত্রধর্মিতা ও মিতভাষণ এবং য়ূরোপীয় ক্লাসিক কবিতার স্বচ্ছতা ইমেজিস্টদের অন্যতম অন্বিষ্ট ছিল। তদানীন্তন ফরাসী নব্য শিল্প, বিশেষভাবে গত শতকের আশির কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে সুপরিচিত আটলান্টিকের উভয় পারের তরুণ কবিবৃন্দ এই শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কবিতায় ক্লাসিকধর্মিতা কামনা করেন। ঐ সব তরুণ কবি ভিক্টোরীয় রোমান্টিকতা ও জার্জিয় ভাবপ্রবণতা বর্জন করে আঁটোসাঁটো আঙ্গিকে গদ্যছন্দে ও মুক্ত ছন্দে (vers libre) কবিতা রচনায় আগ্রহী হলেন। হিলডা ডু লিটল, এ্যালডিঙটন, ফ্লেচার প্রভৃতির সঙ্গে উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মসও যুক্ত হন। প্রতিযুগের নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক সে যুগেই তৈরী হয়—এমত বিশ্বাসেই তাঁরা আঁটোসাঁটো আঙ্গিকে নতুন কবিতার সূত্রপাত করেন। এজরা পাউণ্ড কার্লোস উইলিয়মসের সতীর্থও ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে কার্লোস উইলিয়মস খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং হৃদয়বান বন্ধু ছিলেন। নিচে তাঁর একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

ভুলে যাওয়া নগর

আমি যে দিন পাড়া-গাঁ থেকে
মার সঙ্গে আসছিলাম, সে দিন ছিল ঝড়ের দিন,
রাস্তার মাঝ বরাবর গাছগুলি দাঁড়িয়ে আর ছোট ডালগুলি
গাড়ির ছাদে ঠোকাঠুকিতে ঝুমঝুমি বাজাচ্ছিল।
গাড়ী দাঁড়ানোর জায়গাগুলি ছাপিয়ে উঠেছে, হাওয়ায়
ভারী পর্দা ঢাকছিল বৃষ্টিধারা। ঘোলাটে তীব্র স্রোত

নতুন নতুন ফাটলে উপচে উঠছিল উপত্যকায়,
যেন আমি যে কোন পথই ধরতে পারি,
দক্ষিণে পশ্চিমে যে কোন দিকে গিয়েই পথ পাবো
শহরে পৌছাতে। পার হয়ে চলেছি
অনতি সাধারণ স্থান, এমন সব স্পষ্ট যে
ঝড যেখানে সব বাধা ভেঙে ফেলেছে আর পথ দেখিয়ে চলেছে
কেমন অদ্ভুত সাধারণ পথে : দীর্ঘ, পরিত্যক্ত বীথিকা সরণী
পথের কোণে কোণে অচেনা সব নাম আর
মাতালের মত দেখতে লোকজনের একেবারে আগাগোডা
ভিনদেশী আচার আচরণ। মনুমেণ্ট, সংগঠন
আর এক জায়গায় অনেকখানি জমা জল
আমাকে চমকে দিলো এক একর কিংবা তারও বেশি
উষ্ণ জলের তীব্ররেখ ধারার সুনিয়মিত উচ্ছ্বাসে। পার্কগুলি।
আমার কোন ধারণাই ছিল না, আমি তখন কোথায়···মনে মনে
বললাম, কোন একদিন আমি খুঁজে পেতে চিনে নিতে ফিরে আসব
এই সব পরিশ্রমী আর অদ্ভুত লোকজন, যারা বাস করে
এই সব খুপড়িতে···এই সব তীক্ষ্ণ পথের কোণ
আর কৌতুহল জাগানো বীথিকা সরণীর বাঁক
যাদের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এমন
আপাত সামান্য যোগাযোগ। কেমন করে ওরা
এ রাস্তাটি আমাদের খবরের কাগজগুলির খবর হবার
বা অন্য প্রচারযন্ত্রের আওতার বাইরে আলাদা রেখেছে, যখন
কেন্দ্র নগরীর বুকের এত কাছে, এতটা নিকটে যখন
পরিচিত আর বিখ্যাত নামের নামাবলীতে ঘেরা ॥

অরুণ সান্যাল

সম্পাদকীয়

অন্নদাশঙ্কর

সাহিত্য একাদেমির পুরস্কার এবার লাভ করেছেন 'জাপানে' গ্রন্থটির জন্য শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই।

'জাপানে'র পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করেরও না। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে প্রায় প্রথম দিন থেকে যে দু' একজন সাহিত্যিক সকলের অভিনন্দন লাভ করেছেন, অন্নদাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই সৌভাগ্যকে তিনি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে পোষণ করেছেন সযত্নে ও সম্পূর্ণ আত্মসচেতন সাধনায় এবং নিন্দা-প্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাত না করে একমাত্র আপনার শুভবুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদনানুযায়ী। সাহিত্যের যে আদর্শ তিনি গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায়ও অনুসরণ করেছেন ইদানীংকালে, তাতে পুরস্কার পারিতোষিক প্রভৃতি তাঁর দিকে প্রবাহিত না হওয়ারই কথা। তাই তাঁর পুরস্কার লাভ সত্যই উল্লেখযোগ্য—কারণ, সাহিত্যক্ষেত্রেও পুরস্কার-পারিতোষিক প্রভৃতি এ কয় বৎসরে প্রায় অর্থহীন হয়ে গেয়েছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমাদের মতের মিল অনেক সময়েই ঘটে নি,—ভবিষ্যতেও হয়তো ঘটবে না। মনের মিলও আছে কিনা জানি না। কিন্তু যে মানুষ জীবনে ও সাহিত্যে অকৃত্রিমতার সাধনা করেছেন,—নিজ শক্তিতে আস্থা ও মানবতায় আস্থা যাঁর সুসমন্বিত,—সকল সাময়িকতার ওপরেও রেখেছেন নিজের সত্যাসত্যের সাধনাকে অম্লান ও অনির্বাণ—তাঁর সঙ্গে মনের মিল খুঁজে না পেলে অস্বস্তিই বোধ করতে হয়। অন্তত শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিচার্য তাঁর মত, অনুধাবনযোগ্য তাঁর সাহিত্যরীতি।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

'৭৮ বৎসর বয়সে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের দেহাবসানে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) আবেগপ্রবণ ভারতবাসী শোকবিহ্বল হয় নি. শ্রদ্ধানম্র ব্যথায় স্মরণ করেছে ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে ; বহু সংগ্রামে জয়ে-পরাজয়ে সমাকীর্ণ ভারত-জীবনের গত পঞ্চাশ বৎসরের বিরাট পর্বটিকে, আর সেই সঙ্গে সেবায়, অনুদ্ধত সংকল্পে, স্নিগ্ধ সহৃদয়তায় সার্থক সেই নির্বিরোধ মানুষটিকে যিনি

রাজনীতিতেও ছিলেন অজাতশত্রু, ব্যক্তিজীবনে শান্ত শুদ্ধ চরিত, সমাজজীবনে আক্ষুদ্র সকলের সেবাব্রত বন্ধু।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃতী ছাত্র, কৃতী ব্যবহারজীবী। ছাত্র জীবনেই তিনি তখনকার নবজাগ্রত বিহারের কর্মব্যস্ত নায়ক—'বিহার ছাত্র সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় মহাজাতি যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঙ্গজাতিদের সংহতিতেই মহাজাতিক সঙ্ঘে সংহত হয়ে উঠবে, স্বতন্ত্র বিহার প্রদেশ গঠনের উদ্যোগে-আয়োজনেও (১৯০৫-১৯১১) এই সত্যই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তখন অনুভূত হয়েছিল। সেই নব গঠিত বিহার ও ওড়িষ্যায়ও রাজেন্দ্রবাবু নায়করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, সেবকরূপেই আপনার সাধনা স্থির করে নিয়েছিলেন। গোখলের 'সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' সেবাদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য যে উচ্চাশা আবশ্যক, তা সত্যই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য যে ভাবাদর্শ তারই ফলে গান্ধীজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো আজন্ম নির্বিরোধ ও সেবাধর্মী মানুষেরা স্বদেশসেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছেন ; আর সেই সেবাদর্শেই চেয়েছেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ; তারই প্রেরণায় বাধ্য হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে, বারে বারে নির্যাতীত হয়েও নিরুত্তাপ হৃদয়ে জয় করে নিতে স্বদেশসেবার জন্মগত অধিকার। গান্ধীজীর পরেই তাই ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভাবাদর্শের প্রতীকরূপে গণ্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অবশ্য সেই ভাবাদর্শেরই অনুগামী আরেকটি প্রেরণা—স্বাধীনতালাভের পূর্বক্ষণ থেকে—আমাদের সংগ্রামে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে, আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই উদারনৈতিক আধুনিকতার প্রবক্তারূপে তার মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। গান্ধীজীর রাজেন্দ্রবাবুর বিদায়ের সঙ্গে তাই একটা যুগ শুধু নয়, একটা বিশেষ যুগাদর্শও শেষ হয়ে আসছে।

সবই শেষ হয়—কিন্তু সেই ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন কোনো দিনই শেষ হয় না। অথচ জাতীয় জীবনেও ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন কোনো দিনই শেষ হবে না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে একটা যুগ শেষ হচ্ছে। নিরভিমান, শান্ত, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে তাই আরও বেশি করেই এই প্রশ্ন মনে জাগে—এই আত্মশাসনবিমুখ বিক্ষিপ্ত চিত্ত কালের মধ্যে সেদিনের কোনো ত্যাগ, কোনো তপস্যা, কোনো সনম্র সাহসেরই কি প্রয়োজন আর নেই ?

গোপাল হালদার

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস্‌, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলকাতা-৪ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্‌ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের

৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—সত্য গুপ্ত; ভারতীয়; ২৯ নর্থ রেঞ্জ; কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— „ „ „ „ „

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার; ভারতীয়

(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়; ভারতীয়

২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

ভারতীয় শিল্পী ও সমকালীন শিল্প

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতিতে রঙ লেগেছে, আকাশে মেঘের খেলা, বাতাসে আমেজ। বর্ষণে ধোয়া প্রকৃতির বুক জুড়ে ঘন সবুজের মেলা—নীল আকাশের শুভ্র মেঘের পশ্চাদ্‌পটে—সবুজ রয়েছে বুক জুড়ে। মাঠে-ক্ষেতে ঢেউ-এর দোলায় দোলন-লাগা ধানের মাঝে ঐ যে লাল শাড়ীর আঁচল ঢাকা কালো হরিণ-চোখ, খাল-বিলের ঘোলা জলে নৌকা-ডোঙার সারি, পানকৌড়ি, সাদা বকের চাঞ্চল্য—এমন প্রকৃতির একটি টুকরো আজকে ক্রমেই আমাদের চোখে দুষ্প্রাপ্য। ধু-ধু মাঠের দূর কোণে গাঁয়ের বুকে সেদিনের মানুষের মনে যা দোলন জাগাত, আজকে তা কল্পনার আলপনায় আঁকা দূর-দূরান্তের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। সেখানে এখন যন্ত্রদানবের রাজ্য—দ্রুত, আরো দ্রুত চলার গতি বাড়ছে। হাঁটার ছন্দে দৌড়ের যুগ। এতদিনে বুঝি পশ্চিমী সংস্কৃতির ঝড়ের পরশ লেগেছে আমাদের আশেপাশে। মনের কোণের জমে থাকা মধ্যযুগের আবহাওয়া এ দুরন্ত ঝড়ে টলোমলো—সংস্কৃতির রূপ বদলাচ্ছে।

শহর আমাদের গ্রাস করেছে, দিকে দিকে শুরু হয়েছে যন্ত্রপূজা। গ্রামীন বাংলার আনন্দমেলায় যন্ত্রদেবতাও কোল জুড়ে বসেছে আপন দাবিতে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নীল আকাশের ভাসা মেঘে কালিমার ছোঁয়া! আকাশ সীমান্তে চিমনীর সারিতে ঊর্ধ্বরেখায় গগন ছোঁয়ার স্পর্ধা। ধাপে ধাপে, মাথায় মাথায়, উঁচু থেকে আরো উঁচু, বাড়ির পর বাড়ি। পথে-ঘাটে, ছাদে-ছাদে, তারে-তারে, জালে-জালে আবদ্ধ প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বুকে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা। খাওয়া-পরা-থাকা-বাঁচার পরও আরো কিছু—অন্য কিছু চাই তার। বারে বারে, দলে দলে, নবযন্ত্রের নতুন ছন্দে, কণ্ঠে কণ্ঠে একই পূজোর

বাণী—"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।" শহর আজ হাঁপিয়ে উঠেছে—শ্রান্ত তার নাগরিক-নাগরিকা, মনে চিরন্তন প্রশ্ন—'কা পন্থা ?'

এমন যে ক্ষণ, এমন দুঃসহ মুহূর্তেই বুঝি মানুষ সৃষ্টি করে কথা-ছন্দ-গান-ছবি-প্রতিমা-নাটক। বাঁচার চাহিদা মিললেই ঘটে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। এ সংস্কৃতি একদিন রূপে রসে বিকশিত হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল গ্রামীন বাংলায়। তার পরিচয় আজও কিছু মনের গহনে লুকিয়ে আছে, খুঁজলে হয়তো হদিস মেলে তার। তবু এ যন্ত্র যুগের যন্ত্র পূজায় যেমন প্রাণে জেগেছে নতুন ছন্দ, তেমনি মনেও জেগেছে নতুনের আহ্বান। বাউল-কবি, যাত্রা-নাটক বা পটুয়ার দীঘল পটের গণ্ডী পেরিয়ে, পূজো-অর্চনার আসর-আলপনার যুগ কাটিয়ে নতুন প্রকাশের চাহিদা জানিয়েছে নতুন শিল্পীর কাছে। তাই নতুন কবি, নতুন নট, নতুন চিত্রকর সৃষ্টি করছে যন্ত্রযুগের নবীন শিল্প।

এ সৃষ্টির শেকড় রয়েছে মধ্যযুগের গভীরতায়। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে যন্ত্রযুগের ট্রাক্টরে-চষা এমোনিয়া সারে উর্বর জমির বুকে। তাই তার গোড়ায় পরম্পরার পরশ থাকলেও আগায় ফুটেছে অচেনা ফুল। এ ফুলকে চিনতে হলে, এর গন্ধ উপভোগ করতে গেলে, প্রয়োজন হবে নতুন প্রস্তুতি, নতুন শিক্ষা। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, এমন কি বিদ্যাসাগরী বাংলা আজ যেমন কানে জানায় অজানা ধ্বনি, ভুলে যাওয়া সে অতিপরিচিত ভাষার প্রকাশ পড়তে গেলে, জানতে হলে, যেমন প্রয়োজন হয় বিশেষ অনুশীলনের, তেমনি নবীন এ শিল্প-ভাষা, যন্ত্রযুগের অতিব্যস্ত মানুষের ভুলে-যাওয়া শিল্প কথা—চিত্রলেখা পড়তে গেলে প্রয়োজন হবে বিশেষ অনুধাবনের। লেখ্য-ভাষার মতো চিত্র-ভাষারও পঠন-পাঠন, শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ রীতি আছে। গ্রামীন যুগের ফেলে-আসা দিনে যুগ যুগ অনুশীলনের ফলে অজানিতে সেদিনের শিল্প ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমাদের মনে মনে, মজ্জায় মজ্জায়। তাই সেদিন পোটোর পট, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সরা, দশ অবতার তাস আনন্দে দেখেছি। সামর্থ্য অনুসারে দাম দিয়ে কিনেছি, প্রাণ ভরে পূজো করেছি, মন ভরে খেলেছি, অজানিতে উপভোগ করেছি তার রঙ-রূপ-রেখার ছন্দ। আজকে এ নতুনের অনুপ্রবেশে সে-পরম্পরা হয়েছে ব্যাহত। স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগের সীমার হয়েছে সীমান্ত। তাই এ শিল্পের রসবোধের জন্য দুটি পন্থা ছড়িয়ে আছে সামনে। হয় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে বারে বারে দেখে দেখে অজ্ঞানে অজানিতে এ শিল্পবোধের অনুপ্রবেশ ঘটবে আমাদের মনে—তবে তার সময়ের পরিধি

অজ্ঞাত। নাহলে এ নবশিল্প অভ্যুত্থানের সমতালে অনুসন্ধিৎসু মনে, বিষয় গুরুত্বের প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষার পাঠ নিয়ে সে সময়কে সীমায়িত করতে হবে।

যন্ত্রযুগ যেমন বিশেষজ্ঞের যুগ, অংশ-সিদ্ধির যুগ—যন্ত্রে, যন্ত্রে অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে যেমন পরিপূর্ণ হয় সৃষ্টি, সৃজিত হয় নবীন সামর্থ্যে সফল নতুন যন্ত্র, তেমনি আজকের শিল্প, আজকের চিত্র অংশে অংশে ভেঙে গেছে, ছড়িয়ে গেছে শিল্পীতে শিল্পীতে। আজকের ছবি সমকালীন চিত্র। তাই শিল্প ষড়ঙ্গের রূপায়নে শিল্পীতে শিল্পীতে বিভিন্নতর প্রকাশ। কেউ রেখাবিদ, কেউ বর্ণ বিচক্ষণ, কেউ প্রমাণ-অভিজ্ঞ। কারোর ছবি ভাবালম্বী, কারো প্রকাশ রূপে, লাবণ্য কারো প্রকাশ মাধ্যম। তাই আজকের শিল্পে সম্পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে না—শিল্পীতে শিল্পীতে অংশে অংশে পূর্ণাবয়ব দেয় যুগকে। আজকের যুগ গোষ্ঠীর যুগ, সমষ্টির যুগ, একতার যুগ, তাই তার সম্পূর্ণতা ঘটে সমন্বয়ে। শিল্পে প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর আমাদের এই নতুন-জাগা দেশে তার এই রূপ দুর্বল, আজও অচেনা। তাই একে চিনেও চিনতে পারছিনে। আজকের এই যে চেনা-অচেনার দোটানা, এমন শিল্পজিজ্ঞাসা, সে কথার শুরুতেই বলে রাখি এতে ইতিহাস আছে, ঘটনা আছে, যুক্তি ও বিচার চেষ্টা রয়েছে, তবু এ আলোচনা সমাধানের নির্দেশ না দিয়ে প্রশ্নেই শেষ।

এ যন্ত্রযুগের কর্মযোগী ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপ; সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছিল আজকের এ সমকালীন চিত্র আন্দোলন। তাই তাকে বুঝতে গেলে, চেষ্টা করতে হবে সে দিনের সে স্থান-কাল-পাত্রে হদিস খোঁজার। তারপর সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে কেমন করে এদেশে এসে এমনতর রূপ নিল; তারও গোড়ার ঠিকানা জানতে হবে। সেই সঙ্গে চিত্রকলার সামাজিক ভূমিকা এবং কার্য-কারণের সন্ধান জানা থাকলে আরও ভালো। আদিম যুগের আদি মানুষ অনুভব করেছিল সমষ্টিবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবীয় পশুশক্তি এ বিষয়ে তাকে সজাগ করেছিল। জীবনরক্ষার তাগিদেই মানুষ সম্ভবত চেষ্টা করেছিল ভাবের আদান-প্রদানে। অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছিল উপায় নির্ণয়ে।

মানুষ যেদিন অকৃত ধ্বনির কারণ অনুসরণে প্রকৃতি দেবীর আশীর্বাদ বা বিপর্যয়ের হদিস খুঁজে পেল, তখনই বুঝতে শিখলো ধ্বনি ভেদে ঘটনাপ্রভেদ। সেদিন হয়তো এমনতর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ সৃষ্টি করল, স্বকৃত ধ্বনি বা

উদ্দেশ্যজ্ঞাপক শব্দ। তারপর এক কৌম বা গোষ্ঠীতে একই উদ্দেশ্যে সৃজিত ধ্বনি বার বার উচ্চারিত হয়ে ক্রমে ক্রমে তার বিশেষ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করল, সৃষ্টি হলো কথ্য ভাষা। ক্রমে মানুষ গোষ্ঠী সচেতন হলো, জীবনরক্ষার প্রয়োজন তাকে আরো সঙ্ঘবদ্ধ করল, তখন সে বুঝতে পারল সীমাবদ্ধ ধ্বনিশক্তি আপন গোষ্ঠী বা প্রতিবেশী ছাড়া অন্যের কাছে ভাব প্রকাশে অক্ষম। প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষের বুদ্ধি এবার তাকে সাহায্য করল শ্রবণজাত ধ্বনি শক্তির সীমান্বিত ক্ষমতাকে নির্ভর না করে, দর্শনজাত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে। কথ্য ভাষার অসম্পূর্ণতাকে চিত্রায়িত প্রতীকের সাহায্যে পূরণ করতে। প্রয়োজনে মানুষ শিখলো চিত্রভাষা। সৃষ্টি হলো লেখ্যভাষা ও চিত্র।

দর্শনজাত অভিজ্ঞতা, শ্রবণগ্রাহ্য জ্ঞান থেকে ভিন্ন—একটি প্রত্যক্ষ আর একটি অপ্রত্যক্ষ। এর কারণ দুটি ইন্দ্রিয়ের গঠন পার্থক্য। আমাদের চোখের ভেতরের দিকে মাঝের অংশ রেটিনা (Retina) তার কেন্দ্রে ফভেয়া সেণ্ট্রালিস (Fovea Centralis) তারই কেন্দ্র স্থলে যে ছবিটুকু পড়ে সেইটুকুই স্পষ্টতম। মধ্যে রেটিনার অংশে যে ছবিটুকু থাকে সেটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। এই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দর্শন প্রথমে মস্তিষ্কের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। ক্রমে শরীরের বহুস্থানের বহু স্নায়ুকে উত্তেজিত করে সৃষ্টি করে বহু রকমের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা। এবং শ্রবণজাত স্নায়বিক উত্তেজনার থেকে দর্শনজাত উত্তেজনা দ্রুততর, কারণ শব্দযন্ত্রের স্নায়ুগুলির চেয়ে, দর্শনযন্ত্রের স্নায়ু একশত গুণ পুষ্টতর, স্বভাবতই তার গ্রহণশক্তি অধিক। তাই শ্রবণজাত উত্তেজনা অনুভব করার জন্যে অনুমান ও অনুপাত সংগ্রহের সময় বেশি লাগে। আবার এই দর্শনজাত জ্ঞান সংগ্রহ পন্থাগুলির মধ্যে চিত্রকলাই শ্রেয়তম, কারণ রেটিনা ও ফভেয়া সেণ্ট্রালিসে ঐ অস্পষ্ট ও স্পষ্ট দর্শনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে থাকে অপ্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয় অংশ। শিল্পী তার প্রজ্ঞার সাহায্যে অপ্রয়োজনীয়তা বর্জন করে প্রয়োজনকেই চিত্রায়িত করেন। যাত্রা, কথকতা এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি মিশ্রদর্শন বা শ্রবণজাত বৃত্তিগুলির অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ রেটিনা-বাহিত হয়ে স্নায়ুমণ্ডলে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিল্পীসৃজিত চিত্রে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিকতার অনুভূতিও সীমাবদ্ধ।

এই সব কারণে সুকুমারকলার বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এই চিত্র বিভাগটির

প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এ শক্তিমান বৃত্তি, মহাশিল্পীর হাতে যেমন মহৎকর্মে নিয়োজিত হয়, তেমনি অযোগ্যের হাতে পরিণত হয় পৈশাচিক ক্রিয়ায়। সমাজ-সচেতন প্রতিটি মানুষের যেমন দায়িত্ব আছে, সমাজের সুপরিবেশিত রূপ-রস-গন্ধ যথাযোগ্য উপভোগের, তেমনি, কুরূপ, বিরস এবং অপগন্ধের প্রচার প্রসার নিয়ন্ত্রিত করারও দায়িত্বও রয়েছে তাঁদের। রস-সচেতনতাই সম্ভব করতে পারে সে দায়িত্ব পালনে। রসিকদের ব্যক্তিগত মতামত, জ্ঞান দ্বারা শোধিত হয়ে, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে প্রয়োজনানুগ প্রকাশিত হয়ে শিল্প ও শিল্পীকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

সমকালীন ভারতীয় শিল্পে যে শিল্প ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তার যথার্থতার নির্ণয় প্রয়োজন। পাশ্চাত্যে প্রচলিত সমসাময়িক চিত্র ভাষার সঙ্গে এ ভাষার ঘনিষ্ঠতা দেখে রসিক মনে করেন, আজকের ভারতীয় চিত্র পাশ্চাত্যের অনুকৃতি। সমকালীন চিত্রকরদের এক অংশের মতে এ ভাষা আন্তর্জাতিক, আর এক অংশ মনে করেন ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা ব্যবহৃত বলে এ চিত্রভাষা অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতীয়। স্বল্পজ্ঞানী সৌখিন সংগ্রাহক চিত্রের সাথে পরিবেশ ও আসবাবের বর্ণ সমতা মিলিয়েই ক্ষান্ত। বৃত্তিজীবী সমালোচক বৃত্তি উপার্জনের প্রয়োজনে চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। এমন মুহূর্তে স্বভাবতই, সাধারণ বুদ্ধি কুয়াশাচ্ছন্ন ও প্রচারবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ যুক্তি-নির্ভর তত্ত্ব আলোচনা। সে চেষ্টায় আলোচনার দরকার, সমকালীন চিত্র আন্দোলনের উৎস সন্ধান।

ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ইওরোপে সাধারণ শিল্প সংজ্ঞা ছিল, "Art is that which produces beauty". অর্থাৎ যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই শিল্প। তারপর ১৮৯৮ সালে টলস্টয়, 'What is Art?' বইটিতে এই প্রচলিত সংজ্ঞার পরিবর্তে নব মত প্রতিষ্ঠা করেন। "Art is a human activity consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them." অর্থাৎ শিল্প একটি মানবীয় কর্ম যার দ্বারা শিল্পী তার ব্যক্তিগত রসোপলব্ধিকে জ্ঞানযুক্ত কর্ম দ্বারা প্রকাশিত করেন। সে সৃষ্টি দেখে দর্শক শিল্পীর রসচেতনাকে নিজের মধ্যে খুঁজে পান ও উপলব্ধি

করেন। গ্রীকশিল্প-পরম্পরা থেকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টির যে দায়িত্ব শিল্পকর্মকে এতদিন বহন করতে হয়েছিল, শিল্পগতভাবে তার মুক্তি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে হয়ে থাকলেও রসিকসমাজে এবং নন্দনতত্ত্বে তার সম্ভবত এই প্রথম স্বীকৃতি। গত যুগের শিল্পীর কাছে জনমনগোচর হওয়ার একমাত্র পন্থা সৌন্দর্য—নবীন শিল্পপ্রচেষ্টায় বাতিল হলো। তাঁরা অনুভব করলেন জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি সত্য, তা সে যত সুন্দর বা অসুন্দর হোক, শিল্প-মাধ্যমে তা পরিবেশনীয়। গ্রীসের ভেনাস, ইটালির ম্যাডোনা (র‍্যাফায়েল), মোনলিসার (দা-ভিঞ্চি) বদলে ফ্রান্সে চাষী দম্পতী (কুরবে), ধোপানী (দ্যুমোয়র), শ্রমিক পরিবার (ভ্যানগগ্‌) ইত্যাদি উনবিংশ শতকের শেষের দিকে হলো শিল্পের বিষয়বস্তু। ইডেন উদ্যানের পরিবর্তে প্যারীর নিষিদ্ধ পল্লী এলো ছবির ক্যানভাসে। সুন্দর পেল নতুন সংজ্ঞা। তন্বী শ্যামা ম্যাডোনাকে যে সুন্দর বলতাম আর কর্মক্লান্ত প্রৌঢ়া ধোপানী বা নিষিদ্ধ পল্লীর সম্ভোগশ্রান্তা নারীদের যে সুন্দর বলি তার অর্থ ভিন্ন। সুসংবদ্ধ যৌবনের পরিপূর্ণতা এবং নারীর কমনীয় দৈহিক সৌন্দর্য যা ভেনাস অথবা যে কোনো যুগের নারীতে সম্ভব, তার শিল্পায়ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করলেই তা এই নতুন মূল্যায়নে শিল্প বা সুন্দর হয় না। শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত আবেগমণ্ডিত শিল্প-সৃষ্টি, বিষয়বস্তু তার যাই হোক না কেন, সেটি সুন্দর। কারণ দর্শক মনে শিল্পী সমআবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম, এ শিল্প-সৃষ্টি। সেদিনের শিল্পীগোষ্ঠীর মুখপাত্র টলস্টয়ের এ-মতবাদের সমর্থক ছিলেন সমসাময়িক জ্ঞানী গুণীজন। বার্নাড শ 'Pen Portraits and Reviews' পত্রিকায় টলস্টয়ের এই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন. "This is the simple truth : the moment it is uttered, whoever is conversant with art recognises in it the voice of the master." ১৯২০ সালে লেখা রজার ফ্রাই তাঁর রেট্রোস্পেক্ট প্রবন্ধে টলস্টয়ের ঐ কথা সম্বন্ধে লিখেছেন : "it, was Tolstoy's genius that delivered us from this impasse, and I think that one may date from the appearence of "what is art ?" The begining of fruitful speculation in aesthetics," মহৎ শিল্পী দেলাক্রয়া তাঁর শেষ জীবনের চিত্রকর্মে এক নতুন পরীক্ষা সূচনা করে সৃষ্টি করেন সমকালীন চিত্র আন্দোলন। শুদ্ধ মূল বর্ণগুলিকে পৃথক ভাবে চিত্রে উপস্থিত করে দর্শন ইন্দ্রিয়ে মিশ্রণ সাধনে সচেষ্ট হলেন তিনি। শিল্পীর রঙ মিশ্রণ পাত্রে (প্যালেট)

মিশ্রিত রঙ প্রয়োগে চিত্রের মাধুর্যের চেয়ে দৃষ্টির মাধ্যমে বর্ণ মিশ্রণ অনেক বেশি উজ্জ্বলতর, এ পরীক্ষা সে সাফল্যের ইঙ্গিত দিল।

ইতিমধ্যে টলস্টয়ের যুগে ফ্রান্সের শিল্পীবৃন্দ সৃষ্টি করলেন নবীন চিত্রশৈলী ইমপ্রেসনিজিম বা মনোচ্ছায়াবাদ। ১৮৭৪ সালে ম্যানে, মনে, রেনোয়া, পিসারো প্রভৃতি এই রীতির অনুশীলনে সৃষ্টি করে চললেন নব নব চিত্র। সেজাঁর হাতে আরো সহজ হলো মনোচ্ছায়াবাদ। ১৮৮৫তে সুরা, সিগনা রাস্তা বদলে মনোচ্ছায়াবাদকে রীতিবদ্ধ ও বিজ্ঞানানুগ করার চেষ্টায় সৃষ্টি করলেন বিন্দুবাদ (পয়েণ্টালিজিম)। সেজাঁ, সুরা, গঁগা, ভ্যান-গগ প্রভৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে মনোচ্ছায়াবাদ অনুসারী চিত্র সৃষ্টি করে, আর এক নবীন পন্থার হদিস দিলেন; পোষ্ট-ইমপ্রেসানিজম বা মনোচ্ছায়া-উত্তরবাদ। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে গঁগা ও তাঁর অনুগামীরা যে রীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার নাম, সিম্বলিজিম ও সিনথেসিজম বা প্রতীকবাদ ও সমন্বয়বাদ। এমনি করে একের পর এক এলো নবী বা ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়। সেজাঁর তৈরি সহজ রাস্তা ধরে আঁরি মাতিশ সৃষ্টি করলেন ১৯০৫ সালে তাঁর মাত্র তিন বছর স্থায়ী শিল্পশৈলী বন্যতাবাদ (ফবিজিম)। ১৯০৮ সালে প্যাবলো পিকাশো সেজাঁর সরলীকৃত পন্থা অনুসরণে এবং তৎকালীন বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের অনুপ্রেরণায় এক নব্য চিত্ররীতি কিউবিজিম বা ত্রিকোণবাদ সৃষ্টি করে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক দ্বিমাত্রিক চিত্রের ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনার। এ চেষ্টায় শিল্পী ব্রাক ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং এ শৈলীর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। ১৯১০ সাল থেকে এ পন্থায় ক্রমে ক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে, কিউবিষ্ট হলো, ইটালি, রাশিয়া, হলাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি।

ক্রমে ক্রমে এলো, ইটালিতে ফিউচারইজিম বা ভবিষ্যবাদ, ফ্রান্সে এক্‌সপ্রেশানিজিম বা অভিব্যক্তিবাদ, একের পর এক আরো কত, তবে এরা হলো আরো ক্ষীণজীবী। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে প্যারিসে ১৯১৬ সালে চালু হলো ইম্‌প্রভাইজেশান, আমেরিকায় তার কিছু আগে শুরু হয়েছে সিনক্রোনিজম। এই সব মতবাদগুলির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য প্রথম মহাযুদ্ধের নিহত শহীদদ্বে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২৪ সালে আবার নতুন করে শুরু হলো এক শক্তিশালী শিল্প আন্দোলন। কবি ও শিল্পী আঁন্দ্রে ব্রেথ সৃষ্টি করলেন সুররিয়ালিজিম বা বাস্তবোত্তরবাদ।

সমসাময়িক ইওরোপে মনোবিজ্ঞান গবেষণা দিকে দিকে চরম সার্থকতা

লাভ করছে। ফ্রয়েড, এডলার, ইয়ুং, প্যাবলভ প্রমুখ সার্থক মনোবিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ধাক্কায় চিরাচরিত নীতিবোধ ও মূল্যায়ন ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রযুগও দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বিকশিত হয়েছে নানা দিকে। এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ধনতন্ত্র-সৃজিত দানব ফ্যাসিজিমকে ধ্বংস করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো নানা দেশে। জীবনের মূল্যায়নপন্থা বিভক্ত হলো দুই ভাগে। এই উত্থানপতনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমতালে এগুতে না পেরে মানব মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো নানা সমস্যার ভারে। বিংশ শতকের শেষার্ধে আকাশ জয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে মানুষ এগিয়ে চলেছে মহাশূন্যে, যন্ত্রদানব যার হাতের ক্রীড়নক, সে আজ এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের মানুষের কাছে কৃপার পাত্র। কারণ তার মানসিক ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত। নিজের সৃষ্ট যন্ত্রদানবের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ক্ষুদ্র পৃথিবীকে সে তছনচ্ করে ফেলছে। তাই আজকের শিল্পে দুষ্প্রাপ্য সেদিনের সেই শিল্প সংজ্ঞাগুলি। এখানে নেই সে বাস্তবানুগতা, না আছে সে আঙ্গিক। সে জায়গায় খুঁজে পাই সমস্যাপীড়িত বিপর্যস্ত মানব মনের মনঃসমীক্ষণজাত প্রতিচ্ছবি।

এই যে নতুন শিল্পধারা, একে সাধারণভাবে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী। বহির্মুখী ধারা যুক্তি নির্ভরশীল। অন্তর্মুখী ধারা সম্পূর্ণ মনোজাগতিক। বহির্মুখী ধারার প্রকাশ দেখা যায় 'কিউবিজম' 'ফবিজম', 'সুর-রিয়ালিজম' প্রভৃতিতে। অন্তর্মুখী ধারা অবচেতন মনের সম্পদ, এই চিত্রশৈলী সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য শিল্পীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এ নতুন শিল্পধারা দুটির যথাযথ সংজ্ঞা এখনও নিরূপিত হয়নি। মাইকেল তাপেঁ এর নাম দিয়েছেন—"Un-art autre" অর্থাৎ 'শিল্পভিন্নতা'। স্যার হার্বার্ট রীড অবশ্য এ নাম স্বীকার করেন নি। তাঁর মনে ১৯১০ সালে জার্মান প্রবাসী রুশশিল্পী কাণ্ডেনস্কির দেওয়া নাম composition বা অনুস্থাপন আরও যোগ্যতর।

আজকের বিমূর্ত চিত্রশৈলী এই অন্তর্মুখী ধারা অনুসরণে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। পর পর দুটো যুদ্ধ পেরিয়ে ইওরোপে আজও যে দু-চারটে অপেক্ষাকৃত পুরনো মতবাদ এখনও টিকে আছে, তা হলো ইমপ্রেসানিজিম, কিউবিজিম, দাদাইজিম, সুররিয়ালিজম এবং বিমূর্ত চিত্রশৈলী, অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প প্রভৃতি।

ইজিমের কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই অস্পষ্ট রয়ে গেল। মোট কথা এর দ্বারা এই কথাটাই আলোচনা করতে চেয়েছি যে, মাত্র পাঁচ-দশ বছর চলবার মতো যে সব মতবাদের প্রাণশক্তি নেই, তা অনুসরণ বা অনুকরণে ভারতীয় শিল্পী অজ্ঞতার ক্ষেত্রে কিছুটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হলেও অনুকৃতির কলঙ্ক এড়াবেন কেমন করে? প্রচার অভিভূত সমকালীন ইওরোপের মতো এমন রঙ ও ঢঙ মিলিয়ে মিশিয়ে, একটা নতুন নামকরণ করে হঠাৎ নামের ঝলকানী সৃষ্টি করা যায় হয়তো কিন্তু তাতে রসিকজন-মন জয় করা যায় না। তাছাড়া ইওরোপে যখন আধুনিকতম যন্ত্রযুগ চলছে, যেখানের মানুষ ঈশ্বরের আসনে বিজ্ঞানকে স্থান দিয়েছে এবং সমাজবাদও আজ যেখানে পরিণতির পথে অগ্রসর, সেখানের ব্যক্তিগত সমাজ, সমস্যা, নীতি ও মূল্যায়ন পারিপার্শ্বিক প্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আজকের ভারতে নিরক্ষরতা অপরিসীম, এখানে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যাবস্থা, বুভুক্ষু সংখ্যাতীত, দরিদ্র কৃষিজীবী প্রধান; শ্রমজীবী মুষ্টিমেয়। এখন ভারতবর্ষে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ভাগ্যই সুখ দুঃখের কারণ, ধর্মই ধারক। এই আকাশ-পাতাল প্রভেদকে উপেক্ষা করে, অগণিত দেশবাসীর জ্ঞানবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে, যাঁরা এদেশে এমন পাশ্চাত্যের অনুকৃতিক শিল্পরূপ আকাশকুসুম রচনা করছেন এবং তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে যাঁরা বাহবা দিচ্ছেন তাঁদের এমন মানবেতর মনোবৃত্তি অনুকম্পার যোগ্য।

তবু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমকালীন চিত্র আন্দোলনের জগতে ভারতের দান স্বল্প নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ, মনোচ্ছায়া এবং ত্রিকোণবাদী মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় এবং বাঙালী। ইওরোপের ত্রিকোণবাদী শিল্পপ্রচেষ্টা যখন জ্যামিতিক নক্সা রচনার গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল, নিরস প্রতীক অনুস্থাপনই যখন তাদের প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছিল—ঠিক তখন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞার সাহায্যে সৃষ্টি করলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লেষণজাত নতুন ত্রিকোণবাদী শৈলী যা ভাব গাম্ভীর্যে এবং অলংকরণে অপরূপ।

"আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন শিল্পকলা সৃষ্টি করা, যা হবে ভাবালুতাহীন। পৌরুষদীপ্ত, সামর্থ্য-উজ্জল এবং শক্তিমান। এ শিল্প ধারার দুঃসাহসী পদক্ষেপ নব অভিযান শুরু করে হবে শক্তিধর পুরোধা। তবে তার দ্বারাই জনসাধারনের স্বভাব বিমুখতাকে জয় করে পুরুষানুক্রমিক গোঁড়ামি বিপর্যস্ত আজকের

ভারতের শিল্পকলার উদ্ধার সম্ভব হবে। সৃজনশীল প্রতিভার কাছে আমাদের এ শিল্পধারা হবে উত্তেজনাকর উত্তেজক ও সক্রিয় উৎসাহবর্ধক। এমন প্রতিভাই ভারতশিল্পের বন্ধন মুক্তি সম্ভব করবে।" এ কথাগুলি ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত আর্ট রেবেল সেণ্টারের শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণী পুস্তিকায় সংগঠকদের কর্মসূচীতে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতে ইওরোপীয় নব্য চিত্র আন্দোলনের প্রাথমিক অনুপ্রবেশের সময় তাকে যথাযথ ভারতীয়করণের জন্য এবং ভারতশিল্পের বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে যে কজন বিরল প্রতিভা সক্রিয় হয়েছিলেন তার মধ্যে শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায়-এর স্থান, গগনেন্দ্রনাথের পরেই প্রধান। তিনি আপন প্রতিভায় সক্রিয় শিল্পভাষা সৃষ্টিতে পথিকৃতের গরিমায় গৌরবান্বিত। তাঁরই অনুপ্রাণিত সে দিনের এ শিল্পপ্রচেষ্টা ও প্রদর্শনীতে সম্ভব হয়েছিল নব শিল্প আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল নবীন প্রেরনা। গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী গুলির পর গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্প প্রদর্শনীর এই প্রথম প্রচেষ্টা।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য সে দিনের এ প্রচেষ্টাগুলি সার্থক হয়নি। জনমনজয়ী সময়সাময়িক পরম্পরা অনুকৃতিক শিল্পধারার প্রতিবাদে তাই নবীনের এ বিদ্রোহ প্রতিকূল পরিবেশে বিপর্যস্ত হলো। তাই সে দিন নবীন প্রতিভার অভ্যুত্থানে বিচলিত বিভ্রান্ত রসিক সমালোচক বিপরীত পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল। আর্ট রেবেল সেণ্টারের কর্ম-তৎপরতায় সীমায়িত সাফল্যলাভ ঘটলো। প্রতিষ্ঠার কাছে বিদ্রোহী পথিকৃতের স্বাভাবিক বাধা লাভে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো, অজ্ঞের অসাড়তায় সংশ্লেষণবাদী নবীন এ শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে তার কর্মতৎপরতা সীমায়িত করে অভিমানে অপ্রত্যক্ষ নেপথ্যচারী হতে বাধ্য হলো। যুগান্তরের মুহূর্তে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা অস্বাভাবিক পরিবেশে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে বিপথগামী হলো। রক্ষনশীল ভারতীয়তা ঐতিহাসিক আগ্রহকে অগ্রাহ্য করে অজ্ঞাতে রোপন করলেন আপন সর্বনাশের বীজ।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পরাধীন ভারতের বিক্ষুব্ধ আত্মা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আপন ভবিষ্যৎ রচনা করছিলেন; সেদিনের সে বিদ্রোহ অনুসারী স্বতঃপ্রনোদিত যে শিল্প আন্দোলনের মুক্তি আকাঙ্খা বিপরীত পরিবেশে রুদ্ধ করা হলো, তার স্বাভাবিক প্রকাশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর স্বাধীন

ভারতে সম্ভব হলো না। কারণ স্বাধীন ভারতের আত্মসচেতন ভারতীয়তা দ্রুত সক্রিয় হলো নব-যুগলব্ধ প্রতিটি সুযোগ গ্রহণে। সামন্ততান্ত্রিক ও পরাধীন ভারত স্বাধীন হয়েই ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়কে অস্বীকার করে মুহূর্তে পেরিয়ে যেতে চাইলো সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে। দ্বিধাবিভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ সুবিধা লাভের সুযোগে যুগ যুগ সঞ্চিত তুঙ্গাশ্রয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবেশ নিমেষে পরিত্যাগ করে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলো নবীন ভারত। দিকে দিকে যোজনা-পরিকল্পনার পর্যায়ে পর্যায়ে দ্রুত শিল্প-করণের প্রয়োজনে বিভিন্ন মৌল যন্ত্র ও পরিকল্পনা-পরিচালনায় নির্বিচারে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ আমদানীর পথ ধরে সাংস্কৃতির লেনদেনও শুরু হলো প্রয়োজন অনুসরণ না করে প্রসাধনের তাগিদে।

সুকুমারকলা ক্ষেত্রেও এ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছে একইরূপে। কালজয়ী বিজ্ঞানের অবদানে ক্রমক্ষীয়মান পৃথিবীর পরিধি সে সুযোগ আরো সহজলভ্য করেছে। দেশী-বিদেশী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, নবীন শিক্ষার্থী প্রবীন শিল্পী আসছে যাচ্ছে, নির্বিচারে উপহার উপঢৌকন, শিল্পবৃত্তি বিতরিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে বত্তিজীবী সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনার সমকালীন প্রচারে আবেশমুগ্ধ আজকের জনমানস, তাই গুণাগুণ বিচারহীন। অজ্ঞানে সে গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছে এই সব প্রয়োজনহীন শিল্পশৈলী। স্থান, কাল, পাত্রের সঙ্গে সংযোগহীন অ-দেশজ, অ-কালজ এ সব চমকদারী শিল্প-বৈচিত্র্যে বিভ্রান্ত আজকের জনগণ যুক্তিনীতি বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে বিরত। সেদিনের সে প্রাজ্ঞ সংশ্লেষণপ্রচেষ্টা, সে ভারত শিল্পের সন্ধানমুক্তির আন্দোলন, আজ নতুন পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী নতুন বন্ধনে অবাঞ্ছিত রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কাল তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

অনিবার্য এ যুগধর্মকে যথাযথ রূপে প্রয়োগ করতে হলে অমোঘ শক্তি শিল্প ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির ব্যবহার প্রয়োজন। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মতো শিল্প ভাষা সম্বন্ধে—বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও দেশজ শিল্প ভাষা প্রয়োগ, প্রকরণ, ব্যাকরণ, ব্যবহার ও জনগনের গ্রহণ ক্ষমতার যথার্থতা অনুধাবন প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে নব প্রগতি অনুসরণে স্বভাবতই বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে ভাষা সমস্যা অন্যতম। এ বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে পরস্পর বিরোধী যথেষ্ট মত-অভিমতের আলোচনা ও আন্দোলন হচ্ছে। সরকার নির্দেশিত রাষ্ট্রভাষা দেশের সর্বত্র প্রচলিত

হলেও জনমানসে তার পূর্ণ স্বীকৃতি এখনও অনুপস্থিত। কিন্তু মাতৃভাষা সংরক্ষণে দেশের প্রতিটি রাজ্যই সক্রিয় ও যথেষ্ট পরিমাণে সফলকাম। আপন আপন মাতৃভাষার গৌরব রক্ষায় ভারতীয় প্রতি অঞ্চল ও প্রতিটি ভারতবাসী সর্বদাই সজাগ ও সক্রিয়। শুধু এ দেশে কেন পৃথিবীতে আজও এমন কোনো সভ্যতা বা দেশের প্রকাশ ঘটেনি যারা স্বদেশে ব্যবহৃত আপন ভাষার গৌরবে গৌরবান্বিত নয়। তবু সাংস্কৃতিক জগতে কথ্য ও লেখ্য ভাষা আজও দেশজ গণ্ডিতে আবদ্ধ, তবে সংস্কৃতির উচ্চমার্গবাসী জাতির ব্যবহৃত ভাষার প্রচার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রভাবশালী। কিন্তু কথ্য ভাষার মানুষিক প্রতিক্রিয়া শ্রবণ ইন্দ্রিয়জাত। দর্শনগ্রাহ্য চিত্রভাষা থেকে স্বভাবতই দুর্বল। লেখ্য ভাষা দর্শনগ্রাহ্য বস্তু হলেও তার সংকেত যেমন শুধু মাত্র ব্যবহারকারী দেশের গণ্ডি পেরুতে পারে না তেমনি দেশজ চিত্রভাষা যুগে যুগে বারে বারে ব্যবহৃত হয়ে দেশপ্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে গণ্ডি আবদ্ধ হয়। বিদেশী শিল্প ভাষার সংকেত অপরিচিত দেশে দেশজ জনমন গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। সংস্কৃতির উচ্চমার্গ-অধিবাসী জাতির কথ্য বা লেখ্য ভাষার প্রতি বিদেশী নিম্নমার্গীদের শ্রদ্ধা থাকে তেমনি উচ্চমার্গীর চিত্রভাষায় নিম্নমার্গীর শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। এমন শ্রদ্ধাবাহিত হয়েই বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় শিল্প দিগ্বিজয় করেছিল। এমন শ্রদ্ধাতেই আমরা গ্রহণ করেছিলাম, গান্ধার, পারস্য, পাশ্চাত্যের একাডেমিক প্রভৃতি শৈলীকে। কিন্তু এসব রসিক শাসকদের দরবারেই সীমায়িত ছিল! এ সব শৈলীকে জনপ্রিয় হতে হলো সংশ্লেষণজাত ভারতীয়-করণের মাধ্যমে। মথুরার শৈলীতে ও মুঘলকলায়, কালীঘাটের পটে।

আপন মাতৃভাষার প্রতি এই যে টান, এই যে প্রেম আজও আমাদের দেশে দিকে দিকে প্রকাশ পাচ্ছে, জনমনে প্রচার হচ্ছে, ঠিক তখনি, হঠাৎ চিত্র ভাষায় আমরা বিপরীতরূপে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছি কি করে? আপন আপন কথ্য ও লেখ্য ভাষার প্রচারে দেশ বিদেশের জনমনীষা যখন পঞ্চমুখ, ঠিক তখন সুকুমার কলার ব্যবহৃত ভাষা কেমন করে ও কি যুক্তিতে এমন আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠলো? আপন মাতৃভূমি ও তার ভাষার গরিমা রক্ষায় দেশে দেশে এখন যখন রক্তদান সম্ভব হচ্ছে, ঠিক তখনি শিল্প ভাষায় এমন আন্তর্জাতিক অসম প্রেমের প্রকাশ কি করে ঘটছে! একই দেশে একই সময়ে একই রসিক, একই লোক, সংস্কৃতির দুটি প্রকাশ মাধ্যমের প্রয়োগ ও ব্যবহারে এমন বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করছেন কি করে ও কোন যুক্তিতে? এই প্রশ্ন উপস্থিত করে আমি নতুন আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম।

অন্ধকারে হাত রাখো ॥ কৃষ্ণ ধর

অন্ধকারে হাত রাখো অন্ধকারে
উষ্ণতা ছড়াও করতলে
শীতল রাত্রিতে স্মৃতির খেলনাগুলি
টুকরো হয়ে ভেঙে যায় ঢেউয়ের মতন
প্রবাহিত ইতিহাসে অন্ধকার তাকে ঘেরে
করুণতা দিয়ে
অন্ধকারে হাত রাখো, অন্ধকারে
উষ্ণতা ছড়াও করতলে।

তাহার প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষমান
এই জল
নির্ঝর
পাহাড় প্রান্তর
প্রকৃতির উজ্জ্বলতা মেখে
সে এখন বিস্মিত প্রতিমা।
তাকে আমি ব্যস্ততায় খুঁজি
ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যার
পৃথিবীর ফুলে, রক্তে ও অশ্রুতে মিশে
অসামান্য রূপবতী
অসামান্য।

হাত রাখো উত্তপ্ত ললাটে
পৃথিবীর সহিষ্ণুতা নিয়ে
অস্তিত্বের অপমানে
হতাশায়
যন্ত্রণায় কম্পমান
সান্ত্বনায় স্থান দাও
অন্ধকারে বাজে তার কান্নার চরণগুলি
অন্ধকারে।

সে এই পৃথিবীকে বিস্ময়ের চোখে দেখেছিল
যদিও আমাকে সে ফিরায়েছে
চৈত্রের আগুনে
তথাপি তাকেই আমি বনস্পতি মানি
মত্ত কলরবে অস্তিত্ব হারাই যদি
ঝড়ের হাওয়ায়
সে আমাকে ডাক দেবে
আমি হারাবোনা
যেহেতু একদিন সে আমাকেই ভালোবেসেছিল।

বন্ধু, শোক ॥ সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর ছায়ায় হাওয়া খেলা করে, শান্ত, উদাসীন ;
ধূসরতা-শ্রান্ত দিনে নির্মমতা ফেবে একাকীই,
বন্ধু, শোক, প্রবঞ্চনা, শিয়রে করাল সমাসীন,
ওত পেতে আছে হত্যা, বন্ধুবেশী, নিষ্ঠুরতা এই।

তবু সূর্য ওঠে, ফুল ফোটে, বন্ধু ডাকে, হাসে, আসে
অজস্রতা, প্রেম, স্বপ্ন ; স্মৃতি খোঁজে ব্যর্থতার স্বাদ,
মৃত্যুর ছায়ায় হাওয়া হাসে একাকীই, কেন হাসে !
নির্বিচার নির্মমতা, বন্ধু, শোক, ঘোর অবসাদ।

সেই সেতু ॥ অরুণাচল বসু

অদৃশ্য সেতুটি ছিলো অন্ধকারে,
আছে কিম্বা নেই
দ্বিধাহত প্রশ্ন ছিলো এ-ই।

তারপর ঝড় উঠলো
হেঁটে গেলো প্লাবনের জল,
ভঙ্গুর আগাছা ডুবলো
বালিয়াড়ি নিলো রসাতল।

প্রচ্ছন্ন প্রকট ক্ষয়
মেনে নিলো শূন্য পরিণাম,
ভণিতার মেঘ মুছে
দেখা দিলো রৌদ্রারূঢ় নাম

এবং কয়েকটি খাল, কিছু নদী
জলা আর বিল,
এবং ভুবনজোড়া সেই সেতু
সেই মগ্ন মিল।

অদৃশ্য যোজক জাগলো :
অন্য মূল্য, ভিন্ন প্রতিশ্রুতি,
লগ্ন এক মৌনপণ
উপেক্ষিত স্মৃতির প্রস্তুতি,

স্বকৃত উদ্যোগে, সখ্যে
স্বতঃস্ফূর্ত শুভ্র সংবেদনা—
এ-উষ্ণ তৃষ্ণার উৎসে
সে-অপার বৃত্ত কি পাবো না ?

ছিলাম বিশ্লিষ্ট, নিঃস্ব
লোকায়তে, লুপ্ত, অন্তরীণ,
অদৃশ্য সেতুটি জাগলো :

ঝাঁপ দিলো সূর্যের হরিণ।

জোনাকির দীপ ॥ শেখর নাহা

বিদ্যাধরীর মজা মোহনায়
আলতাপলাশে রাত্রি নামল
শঙ্খচূড়ের মাথার মণি
জ্বেলে দিল ডাটালো রজনীগন্ধারা।

বকুলের ঘুম ভাঙল।

পশ্চিমের জানালায় কলাবতী রোদ
এক আকাশ চোদ্দ ক্যারেট সোনা
টেমসের সেতু নন্দিত হলো
যীশুর করোনেশন, মুক্তো ছেটাল দূরের চার্চ

খালাসীর গান জাগল।

নাগিনী অন্ধকারে এ শহর বন্দর
চটকল পাটকল নিশুতি গঙ্গা
বিনিদ্র বনকাপাসি ঘাসের বাসর
কারবালা ট্যাংক লেনে বাঘিনীর থাবা

জোনাকির দীপ জ্বলল।

আনাগোনা ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কড়ারোদের দুপুরে
ভেষজ গন্ধে বাতাস ভরে আছে,
মাঠের পথ
খাপছাড়া, নিস্তব্ধ,
রাঙচিতা, মেহেদী আর ভেরেণ্ডার বেড়ার মাঝখানে
পিঠ-পেতে শুয়ে
ঘুমে গা আলগা করে দেয়।

দূরে বিমান বন্দরে
বিদেশী উড়োজাহাজ তারস্বরে
স্তব্ধতা খান-খান করে।

শব্দতরঙ্গগুলোর ধাক্কায়
ক্রমে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয়-ধোয়া পল্লীর
দামী দুর্বোধ্য তেলরঙা ছবি
একটু দুলিয়ে দেয়, আমি দেখি
রঙ আর তুলির রেখায়,
মানুষেরা আসে আর যায়।

কল্যাণী ॥ সাবিত্রী রায়

নীলকণ্ঠ বিষে নীল তোমার চোখের পদ্মায়
মন্থনে ফেনিল শুধু বিষ-ঢেউ। আমার আত্মায়
রক্তাক্ত মৈত্রেয়ী আর্তি, প্রার্থনা, নোয়ার আর্তনাদ
আমার চুম্বনে তাই পাওনি তো শোনিতের স্বাদ।
প্রাগৈতিহাসিক বন ছায়ার ধর্ষণে পৌর্ণমাসী
কফিনে শ্বাপদী স্বাদ অন্বেষায় ঘৃণার প্রয়াসী।
তবুও, তবুও, ক্রুশ নিথর এ সমর প্রাঙ্গনে
সমাপ্তি তুষার গলে, একটি পাখীর গান শোনে ॥

হুজুরের খেদমতে ॥ আব্দুর রহমান

বন্দেগী উজির সাহাব
গোস্তাখী মাফ কিজিয়ে
পেট কী আন্দার তন্দুর গনগন
যদি বলেন খুলি থাল
ডুগডুগি ঢোল বানিয়ে তোফা
তসলিম দিই জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ
জমি জিরাত সার্টিফিকেট
ট্যাক্সোবাজির ধুন্ধুমার
বৌ আনতে বৌ ছাড়তে
বাপ হতে কবরে শুতে
রসিদ কাটো ট্যাক্সো দাও কানুন বাঁচাও
লোনা পানির ময়লাবে ফের
জরু গরু মিশমার।
খেদমত হয় নি হুজুরে কেবলার
গত সফরে
হাওয়াই কলের পাই নি লাগ।
গলা ইস্তক পানি বিলকুল
আঁখ ফুটো সানকি ফুটো
লোনা আঁসু ধরবো কিসে
কী দিয়ে বা ধুয়ে দেবো
হুজুরে আলার কদম মুবারক
এতনা তক্‌লীফ নিলেন জনাব
খেদমত করবো মেজাজ গোসা
আর্জি শুনুন উজীর সাহাব
জান পেরেশান হয়রান হয়ে
ফায়দা নেই ফিরে যান।
থোড়া সবুর একটু রসুন
পাক কদম মুবারক জী
চোট মুসিবত সইবে না।
শুখা পাঁজরার হাজার হাড়ে
পাল্কি বানাই চড়ে যান।

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

যে চায়ের দোকানে সুব্রতর অপেক্ষা করার কথা তার নাম স্বদেশী কেবিন। জাতীয় আন্দোলনের স্বদেশী যুগে রেস্তোরাঁটার জন্ম। এর মালিক বদল হয়েছে বার দুয়েক। এখন যিনি মালিক তাঁর নাম বিশুবাবু, বিশুদা বলে ডাকে এ অঞ্চলে ওদের পার্টির সবাই। আগে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। এখন একটা বোন বিধবা হয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ায় আর সর্বক্ষণ নিয়োগ করতে পারেন না। তবু রেস্তোরাঁটা চালাতে চালাতে যতটা সম্ভব সাহায্য করেন। বিশুদার মুখময় বসন্তর দাগ। দোহারা চেহারা। খাকি হাফসার্টের ভেতর দিয়ে একটা মাদুলি নজরে পড়ে। অম্লশূলের অসুখ আছে। তারই মাদুলি। সুব্রতকে দেখে বিশুদার মুখে বিশেষ বিকার দেখা গেল না। কাউণ্টারের ক্যাশবাক্সের ডালা খুলে খদ্দেরকে খুচরো পয়সা ফেরত দিতে লাগল। খদ্দের দুজন নেমে গেলে বিশুদা একবার দোকানের পেছনে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে কারিগরদের কি যেন বকাবকি করল। সুব্রত একা একা ফাঁকা রেস্তোরাঁটায় চুপ করে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে লাগল। স্টেশনের দেওয়ালে কবেকার পুরনো কালি মুছে যাওয়া অস্পষ্ট পোস্টার— ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়। আদ্ধেকটা পোষ্টার আটা ধুয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে। হাতের লেখাটা সুব্রত চিনতে পারল। বিশুদাকে জিজ্ঞাসা করল—

—হাতের লেখাটা হেমন্তর না ?

—না, ওর ছোট ভাই তুষারের। প্রায় একই রকম হাতের লেখা।

—তুষারকে তো চিনি আমি। ও কাজকর্ম করছে বুঝি ?

—হেমন্ত ইউ জি-তে যাবার পরেই ওকে এ্যাকটিভাইজড করা হয়েছে, না হলে ওদের সেলের পক্ষে আর ফাংশন করা সম্ভব হতো না।

—স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল না ?

—দেবার কথা ছিল, দেয়নি।

চুপ করে রইল সুব্রত। তুষারের খবর তাকে খুব স্পর্শ করেছে বলে বিশুদার মনে হলো না। ইংরাজি খবরের কাগজটার তৃতীয় পাতায় চোখ বুলোতে লাগল। দি নেশন। শরৎবাবুর কাগজ। বিশুদা আস্তে আস্তে কথা বলে চললেন।—ছেলেটা খুব মিলিট্যাণ্ট। তবে যা হয় লড়াকু হলেই একটু মাথা গরম তো হবেই, তার ওপর বয়সটা একেবারেই কাঁচা। পরশুদিন মিল গেটে গেট মিটিং করতে গিয়েছিল, চন্দ্রিকা সিংয়ের লোকেরা হাঙ্গামা করেছে। বলেছে দিল্লিতে কংগ্রেসের রাজ হয়েছে বলে বাঙালীবাবু লোকের মেজাজ খারাপ হো গয়া, তাই শালা বাবুলোক পুকার তুলছে ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়। সুব্রত চুপ করেই শুনে যেতে লাগল। জানে, সে সবই জানে। ক্যাডারদের ধারণা হচ্ছে ক্রমশ, যে অবাঙালী শ্রমিকমাত্রেই মালিকের দালাল। উল্টোদিকে রিফ্যুজিমাত্রেই মিলিটাণ্ট। অথচ রিফ্যুজিদের মনোভাবকেও রাজনীতিক মনোভাব বলে সে ভাবতে পারে না। তাদের মনোভাব কতকটা এই যে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে এখন বলছ মাছে কম, মিষ্টিতে কম। চন্দ্রিকাসিংয়ের কথা আর এই কথার মধ্যে সুব্রত কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পায় না।

বিশুদা বলে যেতে লাগলো—তুষারের ওপরই হামলাটা বেশি হয়েছে। নাকে আর মাথায় চোট লেগেছিল। আমি গিয়েছিলাম দেখা করতে। খুব ভেঙে পড়েছে। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বিশুদা বলল—না মার খেয়ে ভেঙে পড়েনি। পার্টি অর্গানে ব্যাপারটার রিপোর্ট বেরিয়েছে। খুব রঙ-চড়ানো একটা জঙ্গী রিপোর্ট। তুষার বলছে যে এর একাংশও সত্য নয়। মোটেই পিপ্‌ল তাকে মদত দেয়নি। যে কাবলীওয়ালাটা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে তাদের কাছে টাকা পায়, এইমাত্র। তুষার কেঁদে ফেলল, বলল, জানেন বিশুদা পার্টি-অর্গানের প্রতিটি অক্ষর আমি বেদবাক্য মনে করতাম। সে বিশ্বাস আমার ভেঙে গেল। ও বসে পড়লে নয়নপুর সেলে দুটো মেয়ে ছাড়া আর কেউ রইল না।

সুব্রত বিমর্ষ খবরের কাগজের পাতায় মন দিল। চারের পাতায় যাবার আগেই আবার চোখ তুলে তাকাল। স্টেশন ধোয়া মোছা হচ্ছে। দেওয়ালে জল দিয়ে অনেকদিনের বাসি পোস্টারগুলো ওরা তুলে ফেলেছে। বিশুদা বলল—আজ বুঝি জি. এম-এর ইন্সপেকশন হবে। সেই বিবর্ণ

পোস্টারটা জলে চুপসে মাটিতে পড়ল। তারপরে আবর্জনার বড় ঝুড়িটায় ঠাঁই পেল।

বেলা গড়িয়ে চলেছে।

স্টেশনের সামনে রিকসা স্ট্যাণ্ড এখন একটু ফাঁকা। আপ ডাউন দুটো ট্রেন এসেছিল এইমাত্র। অনেক সোয়ারি নেমেছিল। অনেক রিকসাই সোয়ারি নিয়ে চলে গেছে। রাস্তাটা হালকা। অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, কল কারখানা আজ ছুটি। শীতের হাওয়া বইছে। নুয়ে পড়া নিমডাল থেকে নিমপাতা ঝরছে। স্টেশন বিল্ডিঙের লাল ইটের দেওয়ালটা সুব্রতর কাছে বড় স্যাঁতসেঁতে বলে মনে হলো। অন্যদিন হলে কলেজের ছেলে মেয়েদের ভীড়ে বোঝাই হয়ে যেত এখানটা ; আজ কেমন ভাল লাগছে।

বিশুদা বলল—সুব্রত। তোমার সঙ্গে কার দেখা করার কথা ?

—তাতো জানি না। এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

—রান্নাঘরের পেছনে চলে যাও, মানব এসেছে, ওরই বোধহয় আসার কথা।

মানবকে সুব্রত চেনে। ওই তাহলে শেখর। মানব ওর জন্যে অপেক্ষা করছে শুনে সুব্রত বিশেষ খুশি হতে পারল না। মানবকে ইউনিভার্সিটি থেকেই ওরা সবাই কমরেড অবজেকটিভ বলে ডাকে। অতি সামান্য কথাও তত্ত্বের ফোড়ন না দিয়ে সে বলতে পারে না। রান্নাঘরের পেছনটা তাদের হোটেলের পায়খানারও পিছন দিক বটে। একটা তেলচিটে বেঞ্চি বার করে ওরা বসল। মানব গোঁফ রেখেছে। মাথায় টুপি। টুপি দেখে সুব্রত পাছে হাসে তাই মানব তাড়াতাড়ি বলল, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ কিছু হয় নি। খুব গম্ভীরভাবে মানব ওকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল। পার্টি সাকুর্লার। পার্টি জানাচ্ছে বিভিন্ন ব্রাঞ্চকে যে কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সদস্যপদ বাতিল করা হলো। এক, দুই, তিন করে তার ডিভিয়েশন, তাত্ত্বিক বিচ্যুতি, তা থেকে যে সব কর্তব্যে গাফিলতি হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুব্রত চৌধুরী পার্টির পুরনো বন্ধু বলে তাকে পুনরায় নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করে সদস্যপদ পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেওয়া হবে।

—পার্টি মনে করে যে আপনি আত্মকেন্দ্রিক ভাবে চিন্তা না করলে কাগজপত্রগুলো পুলিশের হাতে যেত না, এবং কমরেড সুরজিৎকেও হয়তো এক্সপোজড হতে হতো না। মানব খুব গম্ভীরভাবে কথাটা বলল।

—আমি কোনো রকম ভাবেই চিন্তা করতে পারছি না।

—অবজেকটিভ সিচুয়েশন থেকে লেস্‌ন্ নিতে না পারলে আমরা মার্কসিস্ট কিসের ?

—তুষারের খবর জানো ?

—দালালদের কাছে মার খেয়েছে।

—এক রাস্তা বোঝাই লোক, এক মিল বোঝাই ওয়ার্কার্স সব দালাল ?

—আপনি সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়েন নি।

—কী সে ইতিহাস ?

—অবজেকটিভ কণ্ডিশন সব সময় সমান যায় না।

—মানব, তুমি কী বোঝো জানি না ; তবে তোমার একটু আগের কথাটা আমি মানি, বাস্তব অবস্থা থেকেই মার্কসবাদীদের শিক্ষা নিতে হবে।

একস্যাক্‌ট্‌লি। আপনি যদি নয়নপুব ক্যাম্পে যান দেখবেন যে সারা তল্লাট টগবগ করে ফুটছে, এ্যাকশন চায় তারা।

—কিন্তু ক্যাম্পডোল বেশি পেলে তারাই আবার রি-এ্যাকশনারি হয়ে যাবে না তো ?

—কমরেড আপনি তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপের কমরেডদেব পার্টির সদস্যের মতো কথা বলছেন না।

—তুমি তুষারের সঙ্গে একবার দেখা কর।

—আপনারা রেভোলিউশনের আর কোনো কাজে লাগবেন না, এখন দেখুন যদি সিঙ্গুর কি বাগনানের কৃষক কমরেডদের জন্য ভাতর াঁধার গৌরব অর্জন করতে পারেন। মিডল্ ক্লাশে পার্টির বেস্ হলে এই হয়। যখন ফর দি কজ্ সেলফ্ স্যাক্রিফাইসের প্রশ্ন তখন·····

—আজকের নেশন দেখেছ ?

—আমার কিচ্ছু দেখার দরকার নেই, আমি যে কোনো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে রাজি আছি। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু ওয়েট ফর ডে ব্রেক টু বিলিভ ইন লাইট।

কথাটা গ্যাব্রিয়েল পেরির। মানবের প্রিয় বয়েতগুলির একটা। মানব বিরক্ত মুখে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর একখানা চিঠি দিল সুব্রতকে। ওকে জানানো হচ্ছে যে ওদের সেল লিকুইডেট করে দেওয়া হলো। এবং ওকে আগামী চোদ্দই ডিসেম্বর ডি, সির সামনে হাজির হতে বলা হচ্ছে।

ও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ পাবে। মানব জুতোর বেল্ট লাগাতে লাগল, বিড়িটা দাঁতে চেপে।

স্নান না করলে সুব্রতর শরীর খারাপ লাগে। অস্নাত ও অভুক্ত সুব্রত নৈহাটী স্টেশনেই ফিরে গেল। বিশুদা কখন বাড়ি চলে গেছে। কোথায় যাবে সে স্থির করতে পারছিল না। এখন বোধ হয় কোনো ট্রেন নেই। স্টেশনটা ঝিমন্ত। লাল পাঞ্জাবি পরা কুলিগুলো খইনি ডলছে অথবা অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ওভার ব্রিজের ওপর উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াল খানিকক্ষণ। বাড়ি ফিরে গেলে হয়। অথবা নতুন কোথাও একটা সেল্টার নেওয়া যায়। বাড়ি গেলে প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী হয়তো নানান অসুবিধার মধ্যে পড়বে। মুখে কিছু অবশ্যই বলবে না। কিন্তু কোন্ সরকারী চাকুরে পুলিশে খোঁজা আত্মীয়কে হাসিমুখে ঘরে তোলে! সুব্রত যদি বেশি বেশি ওবাড়িতে যাতায়াত করে বা থাকে তাহলে বিচিত্র নয় প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী কলকাতায় বাসা করে চলে যাবার কথা ভাববে। মা না থাকলে প্রিয়ব্রতর এ সিদ্ধান্তে কিছু আসতো যেত না। কিন্তু মা বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যাবেন না। এবং প্রিয়ব্রতরাও মাকে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হবে কিনা সুব্রতর এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ সুব্রত নিজেও তো মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবে না। অতএব ওপথে না যাওয়াই ভাল। ওভার ব্রিজ পেরিয়ে কখন যে পূবদিকে নেমে পড়েছে সুব্রত, হাঁটতে শুরু করেছে তা বোধহয় সে নিজেই জানে না। হাঁটতে হাঁটতে সে বঙ্কিম চাটুয্যের বাড়ির কাছে এসে পড়ল। পুরনো আমলের বাড়ি। বঙ্কিমবাবুর বাইরের ঘরখানার সামনে সে একবার দাঁড়াল। ভাঙ্গা, আগাছা-জন্মানো পোড়ো ভিটে। পাশের মন্দিরটা তবু আস্ত আছে। ঘরের গায়ে ছোটবেলা থেকে দেখে আসা মার্বেল ফলক। চিরকালই সমান ময়লা। ফলকটা ছোটবেলায় যখন প্রথম দেখেছিল শিউরে উঠেছিল সুব্রত—"এই ঘরে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।"

উদ্দেশ্যহীন। মন্থর। অসংলগ্ন পদচিহ্ন। জিভ যেন কাগজের টুকরো। সুব্রত হাঁটতে হাঁটতে আবার স্টেশনের দিকেই পা বাড়াল। আর একটা রাস্তা আছে। কোর্টে গিয়ে সারেণ্ডার করা। স্টেশনে আবার একটু একটু করে ভীড় জমছে। দুপুর বিকেলের দিকে চলছে। হয়তো গাড়ি আসবে এখুনি। চঞ্চল হয়ে উঠেছে স্টেশনের বাতাস। হাতের মুঠিটা যেন জোর:

করে বন্ধ করতে হচ্ছে। ওর ধারণা ছিল কোথাও একটা ওর সেন্টারের ব্যবস্থা হবে। হলো না। পকেটে একটা পয়সা নেই। আবার বিশুদার কাছে যাবে—তার চেয়ে থানায় যাওয়াই ভালো।

কিসের একটা গোলমাল উঠল এক নম্বর প্লাটফর্মে। চেঁচামেচি। পুলিশের লালপাগড়ি। সুব্রত থমকে দাঁড়াল। ভীড়টা গোল হয়ে রয়েছে। আপনাদের মা বুন নাই। ছুটো আধশুকনো যুবক বলল, শাঁখ বাজা, জোকার দে, ওরে বিন্ব সেই মাগিটা ইষ্টিশনেই বিইয়েছে। পুলিশ ভীড় সরাবার চেষ্টা করছে। কেউ হাসছে। কেউ গালাগাল করছে। কেউ খবরের কাগজে দেবে বলে খোঁজ খবর করছে। 'মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে'। আর সব গোলমাল ভেদ করে খনখনে গলায় এক বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—মাহিন্দির অ মাহিন্দির তর একটা পোলা হইছে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বি. টি. রোডের ওপর দিয়ে প্রিজন ভ্যান ছুটে চলেছে। বাঁ পাশে সোদপুরকে ফেলে, পানিহাটির কাপড় কল এলাকার মাঝখান দিয়ে গাড়িটা ছুটছে। গাড়িতে ওপাশের বেঞ্চে আরো দুজন কয়েদি। ওদের একজন ধর্ষণকারী। আর একজন চোর। গাড়ির পিছনের দরজায় গাড়োয়ালি পাহারা। সঙিনের খাপ খোলা। ছোট খুপরির ফাঁক দিয়ে সুব্রত দেখল লিন-বেরি মিলগেটের লক আউট। খাটিয়া পেতে পুলিশ বসে আছে। দুপুরের বি. টি রোড। জনস্রোতে ভাঁটা। শুধু মাল-বোঝাই লরিগুলো ধুলো ওড়াচ্ছে। ভেঁপু বাজাচ্ছে সাইকেল রিকসা। সুব্রত ঠাণ্ডা গরাদটায় কপাল চেপে ধরল। ওর প্রতিরোধ সত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাসকে মুক্তি দিতে হলো। আপাতত নিশ্চিন্ত। ও সারেণ্ডার করছে শুনে কোর্ট ইন্সপেকটার চমকে উঠেছিলেন। তাড়াতাড়ি করে চেয়ার আনিয়ে, চায়ের হুকুম করে নার্ভাস ভদ্রলোক এক কাণ্ডই বাধিয়েছিলেন। তখন বেলা দশটা। এখন দুটো। দমদম সেন্ট্রাল জেলে যাচ্ছে ওরা। সাব ডিভিশনাল অফিসারের মিহি আভিজাত্যিক গলা এখনো

কানে বাজছে—কোনো স্টেটমেণ্ট দেবেন ?—না।—আপনার তাতে সুবিধে হতে পারত।—থ্যাঙ্কস্!

ধর্ষণকারীর বোধহয় অনুশোচনা হয়েছে। চোর যে সে সিপাইজির কাছ থেকে একটা দেশলাই কাঠি চেয়ে নিয়ে দাঁত খুঁটতে শুরু করল। সুব্রতর দিকে একবার এবং ধর্ষণকারীর দিকে আর একবার তাকিয়ে পরম আয়েসে বেঞ্চির ওপরে পা দুটো তুলে দিল সে। তারপর সুব্রতকেই জিজ্ঞাসা করা সমীচীন ভেবে সে জিজ্ঞাসা করল—কটা বাজে বলতে পারেন স্যার ?

—গোটা তিনেক হবে।

—স্যার কি হাজতী, না মেয়াদী ?

—চুপরও বুড়বক। পাহারা ধমক দিল। তারপর বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর চোর বলল—ছোড়ো বাত রাজা, গরীব আদমির কাছে সব সমান। লাল, তেরঙা কই হরজা নেই।

—ইস্‌পেশাল খাওয়া পাবেন আপনি। সুব্রতকে একটু যেন আশ্বস্ত করতে চাইল সে। সুব্রত তবু উৎসাহিত হলো না দেখে চোর পা নামিয়ে বসল। সম্ভবত ধর্ষণকারীর সঙ্গে একটু দূরত্ব রচনা করলে সুব্রত আকৃষ্ট হতে পারে এই ভেবে একটু কাছ ঘেঁষে এল সে। অগত্যা সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—তোমার কী কেস ?

—পেটি কেস। যেন ওটা কোনো কেসই নয় সুব্রত ভাবল।

—ওর কী ?

—বলবেন না। যত নোংরা ব্যাপার শালা। আবার বলে কিনা লভ হয়েছিল। মেয়েটা ফাঁসিয়ে দিলে। ইষ্টিশনে থাকে—রিফ্যুজি।

সুব্রত চুপ করে রইল। চোর খানিক বাদে আবার শুরু করল—দু তরপা বিচুলি সরাতে গিয়ে গেঁথে গেলাম। স্যার। প্রমদাবাবুর গোলায়। মিনসিপ্যালিটির ভোটে দাঁড়াতে পারেনি প্রমদাবাবু। দিল্ বিগড়ে ছিল। চালান করে দিল! হাকিম একমাস ঠুকে দিয়েছে।

ধর্ষণকারী এতক্ষণে কথা বলল—লাল দালান তো তোর ঘর বসত রে।

—আবে তুই চুপ যা।

—কিসের চুপ যা, তুই স্মাগলার না, এর আগে লাল দালানে যাস নি ?

—সে তো ডবলিউ টির জন্তেরে শালা, তোর মতন—

—আমি তোর মতন চোট্টা নই। মরদ, হিম্মৎ আছে—

—চোট্টা নস্? তোর নিজের জিনিস ছিল ওটা শালা? মারে—

এ্যাই বুদ্ধু—পাহারা আবার ধমকাল। চোর এবং ধর্ষণকারী দুজনে চুপ করে যাবার পর সুব্রতর মনে হতে লাগল দুজনেই একরকম দেখতে। লম্বা থুতনি আর মোটা ঠোঁট কেবল বাইরের ব্যাপার। দমদমের রেলওয়ে কালভার্টের তলা দিয়ে প্রিজন ভ্যান যশোর রোডের দিকে এগুলো। চোর কোথা থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা বাড়িয়ে ধরল সিপাইজীর দিকে। পাহারা একবার সুব্রতর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর গম্ভীর ভাবে বিড়িটা মুখে গুঁজল। একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে চোর তাকাল ধর্ষণকারীর দিকে। সিপাইজীর পায়ের কাছে পড়েছিল হাতকড়া আর দড়িগাছা।

এখুনি চোর ধর্ষণকারীর দিকে আধখাওয়া বিড়িটা এগিয়ে দেবে। সুব্রত ভাবল। ওদের মতান্তর বোধহয় গভীর নয়। মনান্তরের প্রশ্ন নেই। ধর্ষণকারীও চোর। চোরও ধর্ষণকারী। হু হু করে ছুটে চলেছে গাড়িটা। ওরা গল্প করছে। সিপাইটাও। সিপাইটার কাছে সুব্রতই অনাত্মীয়। সে রকম সাংবাদিক থাকলে ছবি তুলে নিতে পারত। এদেশের ধর্ষণকারী, চোর এবং পুলিশ কেমন দেশদ্রোহীকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এই ক্যাপসন চমৎকার মানাত। চোর তার মায়ের গল্প করছে। হাড় গুড়গুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে, ওটাকে নিয়েই ঝামেলা। ধর্ষণকারী তার মত প্রকাশ করল—মেয়েমানুষ সব সময়ে ঝামেলা। তারপর সিপাইজী কী একটা মস্করা করতে ওরা দুজনে হেসে উঠল। বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল সুব্রত। গরাদের লোহা মায়ের হাতের মতো ঠাণ্ডা। সেই হাড় গুড়গুড়ি বুড়িটার হাঁপানি, ঘোলাটে কাসি সুব্রতর বুকটাকে টনটনিয়ে দিল। রাতভোর সে ঘুমোবে না। সাতান্ন আটান্ন উনষাট—প্রিয়ব্রত শুণবে না, ঘুমিয়ে থাকবে।—যাক বুড়িটা মেয়ের বাড়ি চলে যাবে। সোদপুরে। সুখ নেই সেখানেও। বোনকে সোয়ামি নেয় না। তবু মরে গড়িয়ে যাবে না। চোর বলছিল।

বিকেল হয়ে আসছে। কত মানুষ রাস্তায়। বাড়ি ফিরছে। বাড়ি থেকে আসছে। আর গারদ গাড়ির ভেতরে চোর ধর্ষণকারী সিপাইয়ের হাসি। সুব্রতর গা ঘিনঘিনিয়ে উঠল। ঘর ফিরতি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সুব্রতর মনটাও বাড়ির জন্য আকুল হলো। সে যে ঘরে ফেরার জন্য, মায়ের জন্য এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে একথা গত একবছরে তার একবারও ভাবায়

অবকাশ হয় নি। গত একবছর এমনধারা ভবিষ্যৎশূন্য হয়ে বসার অবকাশও তার হয় নি। এবং এই মুহূর্তটাকেই, সে দেখল, এখনো সে আগের মতোই ভয় করে। এই হিম-হিম শীত ছুঁই-ছুঁই বিকেলে যে কথাকে সে সবথেকে বেশি এড়াতে চায় সে কথাটাই তাকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল। সে কি নিরর্থকের পিছু পিছু ছুটছে! মনে পড়ল রমেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় বসে বসে ওরা দুজনেও কখন অজানতে এই কথারই সুঁড়ি পথ ধরে অতল খাদের কিনারার কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল। শ্যামল পার্টি ছেড়ে দিয়ে একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছে। সে কথার সূত্রেই রমেন বলছিল—মনে আছে শ্যামলদাই আমাদের ডায়ালেটিকস পড়িয়েছিল? সুব্রত ঘাড় নেড়েছিল। নাইনথ মার্চের রাত্রেও চিৎপুর ইয়ার্ডে গ্রুপ মিটিং করেছে শ্যামলদা।

—কী হলো শ্যামলদার? সুবিধাবাদী হয়ে গেল? রমেন জিজ্ঞাসা করেছিল।

—আমি এই বস্তাপচা সরলীকরণে বিশ্বাস করি না রমেন।

—পার্টি লেটার তো তাই বলে।

এর জবাবে যে কথাটা বলতে চেয়েছিল, সে কথাটা সুব্রতর বলা হয় নি। একথা আর রমেনকে কোনোদিন বলাও যাবে না যে মার্কসবাদ সালসা নয়। ক্যাডার ডিসাইডস্ এভরিথিং। শ্যামলদার সবটাই নয়। পার্টিকে নতুন করে ভেঙে গড়তে হবে। থিওরেটিসিয়ান শ্যামল দস্তিদার সে কথা থিওরিতে বুঝেছিল সবার আগে। কিন্তু ওয়ার্কিং ক্লাস লিডারশিপ বানাতে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খেল শ্যামলদা নিজেই। মঙ্গল আর সুখলাল টার্ণার আর কেবিন খালাসি হতে পারে, সাহসীও বটে, কিন্তু আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। শ্যামলদার কাছ থেকে সেক্রেটারি পদ কেড়ে নিয়ে দেওয়া হলো ওদের। শ্যামলদা হলো আটপৌরে ক্যাডার। রিভিশনিস্ট শ্যামলদা শেষটা পালিয়ে বাঁচল। রিভিশনিস্ট—ইনফ্যান্টাইল্ ডিস্অর্ডার—

—কড়াৎ করে একটা শব্দ। চোর আর ধর্ষণকারীকে এক হাতকড়ায় বাঁধা হলো। রেপ। রেপ অফ দি লক। রেপ অফ অস্ট্রিয়া। হিটলারের বোঁচা গোঁফ। চোরদের থেকে ধর্ষণকারীরা খারাপ। টাক মাথা মোটা চুরুটের চেয়ে, খর্বকায় বোঁচা গোঁফ। কিন্তু কতদূর খারাপ? মাত্রাগত না গুণগত তফাৎ? চোর আর ধর্ষণকারী কতক্ষণ আলাদা থাকে?—ঢং-ঢং,

ঢং-ঢং দমদম সেণ্ট্রাল জেলের গোল গম্বুজে চারটে বাজল। ধর্ষণকারীকে চোর তখন সোদপুরে গান্ধি মহারাজ আসার গল্প বলছিল।

'দূরশব্দ শ্রবণকক্ষ'—এই ঘরখানার নাম। দেশের স্বাধীনতার অব্যর্থ প্রমাণ হয়ে টেলিফোন রুমের নামান্তর। এক মোটামতো বিধবা মহিলা জেলের কর্মচারীকে কাকুতি মিনতি করছিলেন। 'জেলে ওসব নিয়ম নেই'। 'তুমি আমায় জেল চিনিও না বাবা, বাইশ সাল থেকে কত্তা জেলে আসা শুরু করেন, এই পেটের শত্তুরটা বিয়াল্লিশ সাল থেকে। 'তখনও মিষ্টির হাঁড়ি দেওয়া চলতো না। এখন কংগ্রেস গর্মেণ্ট'—ভদ্রমহিলা নাছোড়।—'তুমি থামো তো বাবা, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট সবাইকে জন্ম দিলাম, আর তুমি আমায় দল চেনাচ্ছ।' এক প্রান্তে একটা ঘরে, লম্বা টেবিলটার সামনে সুব্রত দাঁড়াল। দূরে চোর আর ধর্ষণকারী মাটিতে উবু হয়ে বসে ফাইল দিয়েছে।

—কোথায় যেতে চান?

— '.........'

—সি. পি. আই ব্লক না আর. সি. পি. আই ব্লক?

—সি. পি. আই ব্লক। যন্ত্রের মতো সুব্রত জবাব দিল। ফ্যাকাসে রঙের জুট ফ্লানেলের সার্ট পরা সেই প্রৌঢ় একটিপ নস্য নিয়ে বললেন—চলে যান, ডেটিন্যু করেছে আপনাকে। তিন ছটাক করে মাছ, দু দিন মাংস, একদিন ডিম। এ্যালাওয়েন্স। তার ওপর যদি মেডিক্যাল ডায়েট···জিভ চানকে থামলেন।

অনেকগুলো বড় গেট পেরিয়ে, অনেকগুলো গোলোকধাঁধার শেষে ডেটিন্যু ওয়ার্ডের বি ব্লকে যখন সুব্রত পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা ঘোর ঘোর। পুজোর ঘণ্টার মতো একটা হাতঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে একজন ওয়ার্ডার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আধঘণ্টা সময় আছে বাইরে থাকার। আর আধঘণ্টা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের বছর-শেষের দমদম সেণ্ট্রাল জেল। ডেটিন্যু ব্লক, আণ্ডার ট্রায়াল ব্লক তখন বোঝাই। সুব্রত অবাক হয়ে সেই আবদ্ধ জনমণ্ডলীর মধ্যে মিশে গেল। বাংলাদেশের এতগুলো পরিবারে এতগুলো শয্যা শূন্য!—সুব্রতর হাত ধরে টানল একজন পাৎলুন-পরা যুবক।

—সুব্রত।

—নৃপেন।

—এখন এলি। আয়। কেদার। চোদ্দ নম্বর ঘরে। আজ দিনটা ভাল রে। মা এসেছিল। জেল গেটে ঝগড়া করে জন্মদিন বলে মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে গেল। এই ফিরে আসছি গেট থেকে তারপরেই তুই।

—উনি তোর মা? গেটে খুব ঝগড়া করছিলেন। আমি অবশ্য ফরটি সিক্সে সেই একবারই দেখেছি। কিন্তু চিনতেই পারিনি আজ। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা—

—বাবা মারা গেলেন। পাল্টে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। কেদার—জোরে হাক দিল নৃপেন।

লম্বা, রোগা, কোমরে বেল্ট বাঁধা মেট এগিয়ে এল। পিছু পিছু গোটা দুয়েক বিড়াল ছানা। কোলকুঁজো লোকটা নেশাগ্রস্তের মতো লালচে চোখ দুটো জোর করে মেলে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—আমার বেডের পাশে বাবুর ব্যবস্থা করে দাও।

খানিকক্ষণের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেকেই যারা ওকে ভালবাসত খুসি হলো। নেতারা একটু চাপা চাপা রইলেন। ওযে দলের সদস্যপদ হারিয়েছে এটা এখানে অজানা নয়। জেল কমিটি ওকে পরে দেখা করতে বলল। এবং নিষেধ করে দিল ওকে যেন এর মধ্যে বাইরের কোনো খবর সাধারণ সদস্যদের কাছে না বলে।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে, বড়ো হল ঘরটায় সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ল, নৃপেন আর ও গল্প করতে লাগল মৃদু স্বরে। নিত্যগোপালদার সঙ্গে আলাপ হলো? সুব্রত বলল—'না'। নৃপেন বলল—ভারি ইন্টেরেষ্টিং লোক। কাল হবে। আণ্ডার ট্রায়াল ব্লকে আছেন। রুখু চুলগুলোর ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতে সুব্রত বলল—

—তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস নৃপেন।

—হাঙ্গার ষ্ট্রাইক গেল। আগের বার করিনি, হাসপাতালেই ছিলাম। এবারে করলাম। একান্ন দিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক। প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—আগের বার দিন দশেকেই চুকে গিয়েছিল।

—আগের বার রক্ত ঢালা হয়েছিল কতো। যেখানটায় তোর সঙ্গে দেখা হলো, ঐ সিঁড়ির মুখেই তো সমীরের লাস পড়েছিল। কী রক্ত রে! এখনো যেন মনে হয় খুঁজলে সমীরের রক্তের দাগ ওখানে পাওয়া যাবে। উঠোনে তুঁত গাছটার তলায় ছিল বিনয়। বাগনানের কেষ্টদা মাটি দিয়ে

প্রদীপ গড়ে কতদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির মুখে আর তুঁত গাছতলায় জ্বেলে দিয়েছে। তারপর সবই যেমন সয়ে যায় তেমন এও সয়ে গেল। আর সয়ে গেলেই বুঝতে হবে ভুলে যাবার কাজটাও শুরু হয়েছে।

—তুই হাঁসপাতালে ছিলি কেন ?

—ছিলাম কোথায়, গেলাম তো, ঐ রাতেই। এই ছাখ। মশারির ভেতর থেকে হাতটা বার করে দিল নৃপেন। পাঞ্জাবী পরা ছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি সুব্রত। বাঁ হাতের প্রকাণ্ড দাগটা সুব্রত দেখল।—তোর খবর বল্

—কী বলব বল।

—হ্যাঁরে রমেনের খবর কী রে।

—তুই জানিস না ?

—না।

—রমেন নেই। পুলিশ হাসপাতালে মরেছে।

তারপরেই ওরা দুজনেই চুপ করে গেল। বাইরে পাহারার ভারি বুটের শব্দ বাজতে লাগল খট্ খট্ খট্।

এমনিই সময় কোথায় পায়ে পায়ে চলেছে টিক টিক টিক। ঘরের মধ্যে তেইশ-জনা ঘুমন্তের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসেও সময় ঢেউ তুলছে। স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল চেতনা। বাইরে হাওয়ার শির শির। এগারহ নম্ব-অ-র, তেরহ নম-ব-র—হাড়-গুড়গুড়ি বুড়ি মা আমার। খট্ খট্ খট্ কখন যেন খক্ খক্ খক্। রুচিদের বাড়ি শেষ রাত্রে, বাড়ির বাইরে কে কাসছে ? জড়িয়ে যেতে লাগল সব। রুচির দেওয়া পুলোভারটার রঙ নেভি ব্লু। ফিরে গিয়ে রুচির সঙ্গে দেখা করব। রুচির ভৎর্সনা রূঢ় চোখ—কেন মিথ্যে বললেন। রুচির বুক ফুলে উঠছিল। হৃদয়-সমুদ্র, কী রঙ তার। হঠাৎ সবকিছু মুছে গেল। বিমর্ষ পদক্ষেপ, খুট খুট খুট—উচু গোড়ালি নার্স। লাল কম্বলে ঢাকা রমেনের মুখ। কী ফ্যাকাসে। কী বিবর্ণ। কী শুকনো অথচ এত লাল ব্যাণ্ডেজ। 'কী রক্ত রে'। ঘুমের কালো নদীটা আস্তে আস্তে সুব্রতকে গ্রাস করে ফেলল। তবু তার মধ্যেও সে দেখতে পেল, সেই নদীর ওপার থেকে বুকের ব্যাণ্ডেজটা চেপে ধরে, রমেন যেন কী বলছে। রমেন আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু না। পাশ ফিরে শুল সুব্রত—কী হবে শুনে। সয়ে যাবে। গলার কাছটা টন টন করে উঠল। সয়ে যাওয়া মানেই ভুলে যাওয়া।

সেদিন দুপুরে নৃপেন, নিত্যগোপালবাবু আর সুব্রত গল্প করছিল। শীতটা কদিন হলো গায়ে লাগছে বেশ। দমদম জেলের বিচারাধীন বন্দীদের ওয়ার্ডের একটা ঘরে বসে বসে ওরা কথা বলছিল। নিত্যগোপালবাবু খুনের মামলার আসামী। মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামের ছেলে তিনি। চাষী এবং জোতদারের জমির লড়াইয়ের ভেতর থেকে জেলে এসেছেন। এক ভয়াবহ কৃষক-জোতদার সংঘর্ষে নিহত হন জোতদার নন্দগোপালবাবু, নিত্যগোপাল-বাবুর দাদা। পুলিশ গ্রেফতার করেছে নিত্যগোপালবাবুকে, এবং আরো একান্নজনকে। একটু একা একা থাকতেই ভালোবাসেন নিত্যগোপালবাবু। হয়তো ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগের জন্যই, কিম্বা অন্য কোনো কারণে কে জানে উনি যেন হৈ হুল্লোড় এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। আজ দীর্ঘ আটমাস হলো নিত্যগোপালবাবু জেলখানায়। এই দীর্ঘ আটমাস বাড়ি থেকে কেউ ইণ্টারভিউতে আসেনি। কেউ একখানি চিঠি লেখেনি। নিত্যগোপালবাবুও কাউকে লেখেন নি।

—জানো সুব্রত, সমস্ত ব্যাপারটাই কী রকম গোলমেলে। আমি নিশ্চিত যে আমায় সাজা হবে না, কেননা আমি খুন করি নি।

—সেক্ষেত্রে আপনার দুঃখটা হয়তো একান্তই পারিবারিক।

—দুঃখই আমি বোধ করছি না, সেইটাই আমার বিবেককে অপরাধী করে তুলছে, এবং যখন অপরাধবোধ জাগছে তখন আমার চেতনা আমাকে কটূক্তি করছে।

চুপ করে রইল সুব্রত। মেট কেদার কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেছে। কালো-সাদা রোগা বিড়ালগুলো ল্যাজ তুলে গরগর করছে, মাথা ঘসছে ওর পায়ে। ছুটো ফালতু, বিড়াল-ছুটোকে নিয়ে খুনসুটি করছে।

—বস্তুতপক্ষে আমার দাদার সমস্ত সামাজিক পারিবারিক ভূমিকার মধ্যে এমন একটাও জায়গা ছিল না যেখানে একটুও আহা বলা চলে।

—তাহলে আপনি মোটামুটি ঘটনাটাকে সমর্থন করছেন।

—করা উচিত, এবং তা করলে তিনশো-দুই ধারার আসামী হতে আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। আসামী হবার ভয়ে নয়, সমর্থন করতে পারছি না বলেই [illegible] না। অথচ দায়িত্বও এড়াতে পারি কি? গোটা

মুকুন্দপুর এলাকায় পার্টির নীতিকে আকার দিতে চেয়েছি দিনে রাতে, নিজের কাছে দায়িত্ব এড়াব কেন?

—নীতিটাকে দায়ী করছেন নিত্যদা?

—মোটেই না, নীতি নির্ভুল, এ চেতনা যদি আজ আমার না থাকে, পাগল হয়ে যাব।

—কিন্তু…

—কিন্তু কী?

—ঘটনাটাকে অন্যদিক থেকে দেখ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে।

নৃপেন আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। শুনছিল চুপ করে। এবারে কথা বলল—এটা আপনার ঠিক কথা হলো না নিত্যদা।

—কেন হলো না বুঝিয়ে বল।

—আমরা ব্যক্তিগত স্থবিধা যেমন গ্রহণ করি না, ব্যক্তিগত অস্থবিধার আঘাতেও আহত হব না। আমার বাবা কংগ্রেসের হোমরাচোমরা ছিলেন। কাকা মন্ত্রী না হলেও মন্ত্রীদলের চাঁই বটে, কিন্তু আমার মা, বাবা-কাকার দোহাই দিয়ে জেল গেটে স্থবিধা নিচ্ছেন ভাবতেও পারি না।

—তোমার ব্যাপার আর আমার ব্যাপার এক হলো না নৃপেন। তুমি আমার ব্যাপারটা বোঝো। দাদা মারা যাবার পর জেলে এসেছি। আজ ন-মাস হলো বাড়ি থেকে কেউ দেখা করতে আসেনি। তার মানে কী?

—বলুন।

—বিচারে যাই হোক না কেন, বাড়ির সবায়ের ধারণা দাদার খুনের ব্যাপারে আমার হাত আছে। আমার বৌদি নিঃসন্তান। দাদার সঙ্গে তাঁর কোনোকালে বনিবনতা নেই। এই বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। সাহায্য করার হেতু হিসাবে বলতেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। সেই বৌদিও আসেন নি। আমরা দু-ভাই। স্বভাবতই আমাদের জ্ঞাতিরা স্থযোগ ছাড়ছেন না। তাঁরা বলছেন, আমি সম্পত্তির লোভে দাদাকে খুন করিয়েছি। আরো কল্পনাবিশারদ যাঁরা তাঁরা বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন। বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সাহায্য করত।

ক্লান্ত কণ্ঠে নিত্যগোপালবাবু বললেন—ব্যাপারটা কি এক হলো স্থব্রত? স্থব্রত হাসল শুধু।

—অথচ খুন করিনি বটে, কিন্তু কৃষক অভ্যুত্থান ঘটুক এ কি আমি

চাই নি? তার জন্যে কি আমার ব্যস্ততা ছিল না, দ্রুততা ছিল না? সুতরাং শুন—

—শুনুন নিত্যদা, অসহিষ্ণু গলায় নৃপেন বলল।—এটা যদি নন্দগোপাল সাঁপুই না হয়ে, শশী মণ্ডল, কি তারক জানা হতো আপনি ভাবতেন এত কথা?

—না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না-ভাবাটা অন্যায় হতো। আবার ভাবলে পার্টির ষ্ট্রাটেজি ট্যাকটিকস সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে। এই ভেতরকার ঝগড়াটায় ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছি।

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। রোদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে। দক্ষিণের গরাদগুলো দিয়ে তেরছা রোদ এসে পড়ল ঘরের মেঝেয়। নিয়ম-মাফিক একজন মেট পাহারা একটা লোহার হাতুড়ি নিয়ে প্রতি ঘরের গরাদগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে দেখে যায়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে আওয়াজটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। দমদম জেলের লাল দালানে সূর্যের শেষ রঙ যেন আগুন ধরিয়ে দিল। আবার সন্ধ্যা। দোতলায় সিঁড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ এ সময়টা একবার বাইরের জগৎটা দেখে নেয়। দক্ষিণে জেলারের কোয়াটার্সের পাশ দিয়ে দেখা যায় এক চিলতে যশোর রোড। ওখানটায় বাস থামে। আলো-জ্বালানো বাসের মধ্যে যাত্রীদের মাথার ছায়া। এখান থেকে যেন মনে হয় সকলেই ঘরে ফিরছে। গৃহহারা কথাটা যেন বাজে কথা।

আলি সাহেব 'ই' ব্লকে তিনতলায় থাকেন। প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের আরো কয়েকজনও ঐখানেই থাকেন। একদিন এর মধ্যে সুব্রতকে ওঁরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সুব্রতর মনে হলো আলিসাহেব সুব্রতকে খানিকটা যেন যাচাই করতে চান। পার্টিলাইনের ওপর কতকগুলো ক্লাশ সুব্রত নিতে পারে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। খুব সর্ট কোর্সে নিতে হবে। আণ্ডারট্রায়াল ব্লকে অনেকে এসেছে যারা একেবারে আন্দোলনের খোলা মাঠ থেকে এসেছে, এদের ভেতরে কিছু রাজনীতি দেওয়া দরকার। সুব্রত একটু হেসে বলেছিল—আলিসাহেব তার চেয়ে আপনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন আমাকে। আলিসাহেব ছ-ফুটের ওপর লম্বা। পুরু লেন্সের চশমা। কথা বলার সময় তর্জনীটা উঁচু করে নিজের প্রত্যয়টা সঞ্চারিত করতে চান। তিনিও মৃদু হেসে বললেন—বলো। আলিসাহেব সুব্রতকে অনেক দিন থেকে জানেন, 'তুমি' বলেন।

সুব্রত বলল—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। পার্টি লাইন সম্বন্ধে আমার সংশয় দেখা দিয়েছে।

ঘরের কোণ থেকে কে একজন বলল, সুতরাং ডেন থেকে পালানোর সময় দরকারী কাগজগুলোও আর সামলানো দরকার নেই, কেননা আপনার সংশয় হয়েছে। মানব! সুব্রত অবাক হয়ে গেল।—তুমি কবে এলে।

—আসতেই হলো। আপনাদের আই-পি-এস-এর ধাক্কায় কাজ তো কিস্যু হলো না মাঝখান থেকে ফ্রণ্ট ছেড়ে, এ্যাকশন ছেড়ে—

—আপনি মানবের সঙ্গে কথা বলেছেন আলিসাহেব?

—মানব কাল লকআপের পর এসেছে। বেশি কথা হয়নি।

—আপনি মানবের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ডাকবেন। আমি কথা বলব। এর মধ্যে কিছু স্থির করার দরকার নেই।

মানব ধমকে উঠল—শেষ প্রশ্নটা কিসের জানেন?

—কিসের?

—প্রশ্নটা আনুগত্যের।

—কার প্রতি আনুগত্য। এ্যালিজিয়েন্স্ টু হুম্?

মানব একখানি সাদা কাগজে আঁকা ম্যাপ বার করল। কাল সারারাত ধরে এঁকেছে মানব। বলল:

—এই দেখুন ব্যারাকপুর বেল্টের চেহারা। এই তারা-চিহ্নগুলো দেখুন, কতো নতুন বেস্, এ্যাকশনের সম্ভাবনা। প্রাদেশিক নেতাদের কাছে এটা প্লেস করব। আমি রক্ত দিতে পারি কিনা, আপনি রক্ত দিতে পারেন কিনা—

হামবাগ—মনে মনে স্পষ্ট করে সুব্রত উচ্চারণ করল কথাটা। মানব বলতেই থাকল—মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের তত্ত্ব পুঁথিতে জানলেই হয় না। আপনারা না স্ট্যালিনের পার্টির সদস্য। স্ট্যালিন কী করেছিলেন, যখন যৌথখামারের—

মানবকে থামিয়ে দিয়ে সুব্রত বলল—ম্যাপ একখানা আমিও আঁকতে পারি, আলিসাহেব। তবে তার দরকার হবে না। আমি নামগুলো মুখস্থই বলছি, বিভারলি, ব্ল্যাকবেরি, ম্যাকিনন, ভিক্টোরিয়া দয়ারাম, ব্যারাকপুর বেল্টে ওয়ার্কিং ক্লাস এলাকায় আমাদের কটা বেস নষ্ট হয়েছে। মানববাবু জানেন না?

—তাতে এ প্রমাণ হয় না যে, পার্টিলাইন ভুল। আমরা পার্টিলাইনকে সঠিক রূপ দিতে পারি নি।

তর্কের কোনো মানে হয় না।

স্থব্রত আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখল আলিসাহেব বসে আছেন, নিথর স্ট্যাচুর মতো। মানব ম্যাপে আঁকিবুঁকি কাটছে।

এমনি করেই কি দিন যাবে! মন্থর দিন, আর ভারি পাথর রাত এমনি অজন্মায় কেটে যাবে! নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, মাঠে ব্যর্থ চাষী। এই ব্যর্থ ফসলের দেশে তারও কি এমনি কাটবে রাশি রাশি তর্কের আগাছা সৃষ্টি করে। দুপুর হলেই লম্বা লম্বা মিটিং। শেষ হতে চায় না যেন চুলচেরা তর্কের বুকনি। 'প্রস্তাব আছে', আর 'আমার একটা বক্তব্য আছে'। বক্তব্য, মাধ্যম, শ্রেণীশত্রু, কোণঠাসা, বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, প্রতিক্রিয়া প্রগতি—এ যেন পুরনো তেলচিটে একহাত তাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানো। মানব জেলখানায় এসেই সিগারেটের টিন দিয়ে একটা ওজন-দাঁড়ি বানিয়েছে। জেল-কিচেনের বরাদ্দ মাছের ওজন নিয়ে সে আন্দোলন শুরু করবে। জনা-চারেক দেশলাইয়ের বাক্সে ভাতের থালা থেকে যে কাঁকর বেরোয় সেই কাঁকর সংগ্রহ করে রাখছে; জেল-সুপার এলে এ নিয়ে মোকাবেলা করবে। মাঝে মাঝে পাগলা ঘণ্টি বাজে। জেল সুপার আসেন যেন মধ্যযুগীয় এক রাজকীয় মহিমা। বিরাট ঝালর লাগানো সাদা ছাতাখানা কয়েদিদের মধ্যে যারা অনুগত তারা বহন করে। আর সেই ছাতার তলায় তলায় বীরপদক্ষেপে হাঁটেন জেলসুপার। আগে পিছে খাতাপত্র নিয়ে কর্মচারী বাহিনী। এরই মধ্যে একদিন সেই ধর্ষণকারীকে দেখল স্থব্রত।

শীতের কুয়াসামাখানো পূর্ণিমার গোল চাঁদ গরাদের ওপারে। আজ কতদিন বাদে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে—তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুম আসছিল না। নৃপেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্যদিন হলে এ-সময় ঘুম না এলে স্থব্রত পড়ে। আজ সে চুপ করেই তাকিয়ে রইল। এখানে পার্টির সদস্যদের নিজস্ব মিটিঙে বা কোনো সিদ্ধান্তমূলক সভায় তাকে ডাকা হয় না। ফলে সে অনেক সময়ই একা একা থাকে। কখনো নিত্যবাবু, কখনো নৃপেন কখনো কেষ্টদার সঙ্গে, বসে বসে গল্প করে। 'জীবন মানে দ্বন্দ্ব'। দ্বন্দ্বই যদি হয় তবে আজকের পূর্নিমার চাঁদের দ্বন্দ্ব কী? চৌদ্দ দিনের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে আজ কি পূর্নিমার প্রশান্তি নয়? জীবনও কি সব দ্বন্দ্ব পেরিয়ে একদিন দ্বন্দ্ব বিরহিত প্রান্তে

উপনীত হবে? এই পূর্ণিমার চাঁদের মতো? সেই কি তার উপসংহার—না নতুন কিছুর উপক্রমণিকা? সেদিন কোনো দ্বন্দ্ব যদি না থাকে তাহলে দ্বন্দ্বের তত্ত্ব কি খণ্ডিত হবে না? কী বোকার মতো ভাবছে সে! দ্বন্দ্ব তত্ত্বে এ পর্যন্তের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যা হয়নি, হবে, তার ভাষ্য আগেই রচনা হবে কী করে। চাঁদের দিকেই তাকিয়ে রইল সুব্রত। গত চৌদ্দ রাত্রির ব্যর্থতাকে এই চাঁদ আজ হারিয়ে দিয়েছে। যদি এই পূর্ণতায় কোনো গ্লানি থাকে তাহলে আবার কাল থেকেই সে শুদ্ধির পথে ক্ষয়ে যেতে থাকবে—যতদিন না অমাবস্যার সর্বনাশের বুকে সকল পুরনো জের ঘুচিয়ে মুছে দিচ্ছে ততদিন এ নতুন শুক্লা প্রতিপদ রচনার ভিত্তি পাবে না। এই চাঁদকেই সে ভালবাসে—এ আপন পূর্ণতার টানে চিরপঙ্গু নদীতেও জোয়ার আনে—চাঁদ—ও চাঁদ চোখের জলে···

—সুব্রতবাবু

—কেষ্টদা, চটকা না ভেঙে গেল যেন সুব্রতর। কেষ্টদার বিছানা ওর ডানদিকে। বিড়ি ধরালেন কেষ্টদা। গ্রামের মানুষ। কড়া বিড়িই পছন্দ করেন। আজ তিন বছর এখানে আছেন।

—ঘুম আসছে না।

—আসুন মশারি তুলে ফেলি। গল্প করা যাক।

—আপনি কিছুর গন্ধ পাচ্ছেন না?

—না তো।

—আমি পাচ্ছিলাম। নতুন গুড়ের পায়েসের গন্ধ। আজ পৌষ সংক্রান্তি সুব্রতবাবু। বোধ হয় জেলারের বাড়ি পিঠে পার্বন।

আস্তে আস্তে কেষ্টদা গ্রামের গল্প শুরু করলেন। বাঙালী মেয়েদের পৌষ জাগার গল্প, পৌষ আগলানোর গল্প। গল্পে গল্পে গ্রামচারী হয়ে ওঠেন কেষ্টদা। জেলখানা যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। হাওড়ার কোন্ গ্রামের পথে পথে, আম-কাঁঠালের জটিল ছায়া যেখানে পূর্ণচাঁদের মায়া বুনছে লোকটা যেন সেখানে হারিয়ে গেল। কথার আওয়াজে আস্তে আস্তে কখন নৃপেন উঠে এল। উঠে এল ওধারের কমল বলে স্কুলের ছেলেটি। কেষ্টদা তখন ভারি গলায় তাঁর মায়ের গল্প শুরু করেছেন। কেষ্টদা ঘুমোলে মা কেষ্টদার মাথায় হাত রেখে ভাঙা গলায় গান করতেন—বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও, আমি নগর মাজিয়া দেব ঘরে বসে থাইও। গানের কথাগুলো গুণ গুণ করতে লাগল

সকলের কাণের কাছে কতক্ষণ! তখনো কেউ লক্ষ্য করেনি। এটা পৌষ পার্বনের রাত এ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সকলেরই মনটা এমন টলটল করে উঠেছিল যে কেউ লক্ষ্য করেনি। দরাজ গলায় কেষ্টদা যখন গান ধরলেন তখনো সবাই গানের কথায় ভেসেছিল। গান শেষ হলে, গানের রেশ মিলিয়ে গেলে কে একজন বলল—একটা গোলমালের আওয়াজ কানে আসছে না? সে কথাতেও প্রথমে কেউ কান করেনি। একটু পরে আবার একজন বলল, তখন—সবাই সেই গোলমালটা শুনল। জেলের বাইরে, খুব কাছে নয়—কোথা থেকে একটা কলরবের ঢেউ ভেসে আসছে। যেন হাজার মানুষ এক সঙ্গে শ্লোগান দিচ্ছে। বোমার আওয়াজ। খুব দূরে নয়। খুব কাছে নয়। দক্ষিণের জানালায় গিয়ে ডেটিন্যু ওয়ার্ডের বি ব্লককে ডাকল এরা। 'বি' ডাকল 'সি' কে। 'সি' ডাকল 'ডি' ব্লককে। দেখা গেল অনেকেই জেগেছিল। অনেকেই রাতে ঘুমোয় না। দেখতে দেখতে সারা দমদম জেলের রাজবন্দীরা জেগে উঠল। গরাদে তারা চেপে ধরেছিল তাদের মুখ। সুব্রত দেখল কমলের মুখ উত্তেজনায় লাল। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, ও বাড়ি থেকে সামনের বাড়ি—কমরেড, কী খবর। খবর কী? সবাই যেন এক প্রাণ হয়ে তাই চাইছিল, কিছু একটা চাইছিল। চনমন করছিল কমল। একবার এ জানলায় একবার ও জানলায় ছুটোছুটি করছিল। তারপর সকলের উদ্বিগ্নতা জমাট পাথরের মতো নীরব হয়ে গেল। কেউ আর কথা বলছিল না বটে কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছিল যে কেউ জানলা ছেড়ে নড়েনি। ডেটিন্যু ব্লক, আণ্ডারট্রায়াল ব্লক যে যার ঘরে লকআপের মধ্যে অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছিল। রাত তিনটের সময় সকলে সচকিত হলো। সেই অপেক্ষমান নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে ভেঙে দিল 'ডি' ব্লকের তিনতলার এক কোণ থেকে সূয্যি মিস্তিরের মোটা ভারি কণ্ঠস্বর—কমরেডস ও কিছু নয়। সবাই যাতে শুনতে পায় দুবার করে বলছিল সূয্যি মিস্তির। ও কিছু নয়। শ্লোগানগুলো হচ্ছে আল্লাহু আকবর আর বন্দেমাতরম। কম্যুনাল টেনসন। দাঙ্গা বেধেছে। মজুর এলাকায় একটা বস্তিতে আগুন ধরেছে। পুলিস ফায়ারিং করেছে। মব-এ্যাটাক হয়েছে কতকগুলো এলাকায়। ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্‌বের মতো সাদা মুখে কমল দাঁড়িয়ে থাকল।—কী বলছে, সুব্রত-দা, কী বলছে, বলতে বলতে চুপ করে গেল সে। গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে লাল আলো জ্বালিয়ে দমদম এরোড্রোমের দিকে উড়ে এল একটা বড়ো উড়ো জাহাজ। একচক্ষু দানবের মতো তার লাল চোখটা একবার জ্বলছিল একবার নিবছিল।

ক্রমশঃ

হানের অপরাধ

শিগা নাওয়া

খেলা দেখাবার সময় সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তরুণ বাজীকর হান একটি ভারী ছুরি দিয়ে তার স্ত্রীর করোটিড ধমনী কেটে ফেলে। অকুস্থলেই তরুণীর মৃত্যু ঘটে। হানকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল রঙ্গমঞ্চের পরিচালক, হানের চীনা সহকারী, ঘোষক এবং প্রায় তিন শতাধিক দর্শক। একজন পুলিসও উপস্থিত ছিল। দর্শকদের একেবারে পেছনে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এতগুলি সাক্ষী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এটা হত্যাকাণ্ড না দুর্ঘটনা তা রহস্যাবৃতই থেকে গেল।

হানের খেলাটা ছিল এইরকম: দরজার আকারের একটি কাঠের বোর্ডের সামনে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় চার গজ দূরে থেকে হান কতকগুলি বড় বড় ছুরি তার দিকে ছুঁড়ে মারবে। ছুরিগুলি মেয়েটির দেহের দুই ইঞ্চি দূরে বোর্ডের উপর আটকে যাবে এবং এইভাবে বোর্ডের উপর তার দেহের রেখাটি আঁকা হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার ছুরি নিক্ষেপ করবার পরই হান একবার করে চিৎকার করে উঠবে, তার নিজের বাহাদুরির তারিফ করেই যেন।

বিচারপতি প্রথমে জেরা করলেন রঙ্গমঞ্চের পরিচালককে।

"আপনার কি মত, খেলাটা কি খুব কঠিন?"

"না, ধর্মাবতার, কোনো অভিজ্ঞ বাজীকরের পক্ষে খেলাটা মোটেই কঠিন নয়। তবে হ্যাঁ, খেলাটা ঠিক ঠিক দেখাতে হলে স্নায়ুর জোর চাই, আর চাই একাগ্রতা।"

"বুঝলাম। আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক এটা দুর্ঘটনাই, তবু এই ধরনের দুর্ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক, তাই না?"

"খুবই সত্যিকথা, ধর্মাবতার। দুর্ঘটনা ঘটা খুবই যদি অস্বাভাবিক না হত তা হলে আমার রঙ্গমঞ্চে কিছুতেই এ-খেলা দেখাতে দিতাম না।"

"আচ্ছা, তা হলে কি মনে করেন ইচ্ছে করেই একাজ করা হয়েছে?"

"না, ধর্মাবতার, তা আমি মনে করি না। মনে করি না এই কারণে:

বারো ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে এ-খেলা দেখাতে শুধু যে দক্ষতাই লাগে তা নয়, কি বলব, এক ধরনের স্বাভাবিক অনুভূতিরও দরকার হয়। ঠিক বটে, ভুল হতে পারে এ-সম্ভাবনাটা প্রথমে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি, কিন্তু যা ঘটে গেছে তারপর আমার মনে হয় স্বীকার করা উচিত ভুলের সম্ভাবনা সব সময়ই একটা থেকে যায়।"

"বেশ তো, তা হলে আপনি কি মনে করেন—এটা ভুল না ইচ্ছে করেই একাজ করা হয়েছে?"

"তা আমি ঠিক করে বলতে পারি না হুজুর।"

জজের সব কিছু গুলিয়ে গেল। নরহত্যা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা দুর্ঘটনা না পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। যদি হত্যাকাণ্ড হয় তা হলে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে এটা করা হয়েছে, জজ ভাবলেন।

জজ এরপর সহকারীকে জেরা করবেন ঠিক করলেন, লোকটা পাঁচ বছর হানের সঙ্গে কাজ করেছে।

"হানের স্বভাব-চরিত্র কি রকম?" জজ জিজ্ঞাসা করলেন।

"কোনো খুঁত দেখিনি ধর্মাবতার। ও জুয়া খেলে না, মদ খায় না, মেয়েদের পেছনেও ছুটতে দেখি নি। গত বছর ও খ্রীস্টান হয়েছে। ইংরেজি শিখেছে। অবসর সময়ে ও বই নিয়েই থাকত—বাইবেল বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো বই।"

"ওর স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?"

"তারও কোনো খুঁত দেখিনি, ধর্মাবতার। যারা ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায় সচরাচর তাদের নীতিজ্ঞান থাকে না, তাতো জানেনই স্যার। হানের বৌ খুব সুন্দরী ছিল। অনেকেই তার কাছে কুপ্রস্তাব করত। কিন্তু সে তাতে কোনোদিনও কান দেয় নি।"

"আর ওদের মেজাজ কেমন ছিল?"

"খুবই ভদ্র আর দয়ালু, হুজুর। ওরা ওদের বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করত, কারোর সঙ্গে ওরা কখনও ঝগড়া করে নি। কিন্তু" কথার মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে এক মুহূর্ত কি জানি ভাবল। "ধর্মাবতার, একথাটা যদি আপনাকে বলি তাতে হানের মামলাটা খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। তবু সত্যি বলতে কি যারা অন্যের প্রতি এত সদয় ব্যবহার করত তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি নির্মম।"

"কেন ?"

"তা আমি জানি না, ধর্মাবতার।"

"তোমার সঙ্গে প্রথম যখন ওদের পরিচয় হয় তখনও কি অবস্থাটা এই রকম ছিল ?"

"না, ধর্মাবতার। বছর দুই আগে শ্রীমতী হান একবার পোয়াতি হয়েছিল। সময় পুরো হবার আগেই তার একটি বাচ্চা হয় এবং দিন তিনেকের মধ্যেই সেটি মারা যায়। সেই থেকে ওদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক বদলে যেতে থাকে। প্রায়ই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হত ওদের মধ্যে। হানের মুখ চাদরের মতো শাদা হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ এক সময় সে চুপ করে যেত। কোনোদিন সে তার স্ত্রীর ওপর হাত তোলে নি বা ঐ ধরনের কিছু করে নি—তা হয়ত ওর নীতিধর্মের বিরুদ্ধে যেত। কিন্তু ধর্মাবতার ওর দিকে তাকালেই দেখা যেত কী তীব্র ক্রোধ ঝরে পড়ছে ওর চোখ থেকে। এক এক সময় রীতিমত ভয় করত।

"ওদের সম্পর্কটা এত খারাপ হয়ে পড়েছে দেখে একদিন আমি হানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরা আলাদা হয়ে যায় না কেন। তাতে ও বলেছিল যদিও স্ত্রীর প্রতি ওর ভালোবাসা মরে গেছে তবু বিবাহ বিচ্ছেদের সত্যি কোনো কারণ নেই। শ্রীমতী হান অবশ্যই এটা বুঝতে পারত এবং ক্রমে ওর প্রতি তার ভালোবাসাও মরে গিয়েছিল। আমার মনে হয় নিজের মনকে শান্ত করবার জন্যই হান বাইবেল ও নীতিশাস্ত্র পড়ত, যাতে স্ত্রীর প্রতি ওর ঘৃণা দূর হয়। স্ত্রীকে ঘৃণা করার সত্যিই ওর কোনো কারণ ছিল না। শ্রীমতী হানের অবস্থাটা সত্যি করুণ ছিল। হানের সঙ্গে প্রায় বছর তিনেক কাটিয়েছে সে আর এই সময়টা সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে খেলা দেখিয়ে। হানকে ছেড়ে দেশে ফিরে গেলে, সেখানে গিয়ে বিয়ে-থা করে থিতু হয়ে বসা সহজ হত না তার পক্ষে। যে মেয়েমানুষ হিল্লি-দিল্লি চষে বেড়িয়েছে কজন তাকে বিশ্বাস করবে ? আমার মনে হয় এই কারণেই সে হানকে ছেড়ে যায় নি, ওদের মধ্যে সম্পর্কটা এত খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও।"

"এই হত্যাকাণ্ডটা সম্পর্কে সত্যি তোমার কী মনে হয় ?"

"ধর্মাবতার আপনার প্রশ্নটা এইতো, এটা দুর্ঘটনা না ইচ্ছে করে খুন করা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ তাই।"

"যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিন থেকেই বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবছি, নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে দেখছি। কিন্তু যতই ভাবছি ততই খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘোষকের সঙ্গেও এ-বিষয়ে কথা বলেছি, সেও বলছে ব্যাপারটা কি ঘটল তা সেও বুঝতে পারছে না।

"আচ্ছা বেশ, এখন বলতো ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন কি মনে হয়েছিল তোমার? তোমার মনে কি সন্দেহ হয়েছিল এটা দুর্ঘটনা না ইচ্ছাকৃত খুন?"

"হ্যাঁ, স্যার, তা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম…আমি ভেবেছিলাম, হান শেষে ওকে হত্যা করল।"

"ইচ্ছে করে খুন করল, তাই বলতে চাও তো?"

"হ্যাঁ স্যার। তবে ঘোষক বলছে ওর মনে হয়েছিল 'ওর হাত ফস্‌কে গেছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক তুমি জানতে, ওতো জানতো না।"

"তা হয়তো ঠিক ধর্মাবতার। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখেছি, আমি জানতাম বলেই হয়তো আমার মনে হয়েছে হান ওকে খুন করেছে।"

"আচ্ছা সেই মুহূর্তে হানের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?"

"সে চেচিয়ে উঠল 'হা', শুনেই আমি তাকিয়ে দেখি ওর স্ত্রীর গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। কয়েক মুহূর্ত সে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর তার হাঁটু যেন ভেঙে এল, দেহটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ছুরিটা পড়ে যেতে সেও মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল তালগোল পাকিয়ে। আমাদের করবার কিছু ছিল না, আমরা ওর দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো বসে রইলাম। আর হান, হানের প্রতিক্রিয়া আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি ওর দিকে তাকাই নি। 'শেষ পর্যন্ত হান ওকে খুন করল'—এই কথাটা মনে হতে তবে আমি হানের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর মুখ মরা মানুষের মতো শাদা হয়ে গেছে। চোখ বোজা। ম্যানেজার পর্দা ফেলে দিল। ওরা যখন শ্রীমতী হানের দেহ তুলে ধরল, তার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। হান হাঁটু গেড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করল।"

"ওকে দেখে কি মনে হয়েছিল খুব বিচলিত হয়েছে?"

"হ্যাঁ হুজুর খুবই বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল।"

"বেশ। আর যদি আমার কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার হয় পরে তোমাকে ডাকব।"

জজ সহকারীকে বিদায় দিয়ে এবারে হানকেই কাঠগড়ায় তুললেন। বাজীকরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তাকালেই মনে হয় স্নায়বিক অবসাদে ভুগছে।

হান কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে জজ বললেন, "রঙ্গমঞ্চের পরিচালক এবং তোমার সাকরেদকে আমি আগেই জেরা করেছি। এখন তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব।"

হান মাথা নিচু করল।

"আচ্ছা, বল তো, তুমি তোমার স্ত্রীকে কখনও কী ভালোবাসতে ?"

"বিয়ের পর থেকে প্রথম সন্তানের জন্ম পর্যন্ত তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম।"

"সন্তানের জন্মের পর এর ব্যতিক্রম হলো কেন ?"

"কারণ, আমি জেনেছিলাম, সন্তানটি আমার নয়।"

"অন্য লোকটি কে তুমি তা জানতে ?"

"অনুমান করেছিলাম। আমার ধারণা আমার স্ত্রীর মামাতো ভাই।"

"তোমার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ?"

"আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করেছিল সে-ই। সে-ই আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিল।"

"আমি ধরে নিচ্ছি ওদের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল তোমার বিয়ের আগেই।"

"হ্যাঁ হুজুর, আমাদের বিয়ের আটমাসের মধ্যে সন্তানটির জন্ম হয়।

"তোমার সহকারী বলেছে সময় পুরবার আগেই সন্তানটির জন্ম হয়েছিল।"

"আমি সকলকে তাই বলেছিলাম।"

"জন্মের অল্প পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়, তাই না ? কি হয়েছিল ?"

"মায়ের বুকের চাপে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

"তোমার স্ত্রী কি ইচ্ছে করে এ-কাজ করেছিল ?"

"সে বলেছিল, দুর্ঘটনা।"

জজ চুপ করলেন। তাঁর চোখদুটো নিবদ্ধ রইল হানের মুখের ওপর। হান মাথা তুলল কিন্তু চোখ মাটির দিকে রেখেই সে পরের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

"তোমার স্ত্রী কি এ-সব কথা তোমার কাছে স্বীকার করেছে ?"

"না, আমি তাকে কোনোদিন এ-সব কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। শিশুটির

মৃত্যুই ছিল সব পাপের প্রতিশোধ। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যতদূর সম্ভব ওর প্রতি উদার হবো।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদার হতে পারলে না।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার কেবলি মনে হত শিশুটির মৃত্যু পাপের উপযুক্ত প্রতিশোধ নয়। বৌ যখন দূরে থাকত আমি সব বিষয়টা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে পারতাম। কিন্তু ও কাছে এলেই আমার ভেতরে কি যেন হয়ে যেত। ওর শরীর দেখলেই আমার ভেতরে রাগ যেন উথলে উঠতে থাকত।"

"বৌকে তালাক দেবার কথা মনে হয় নি তোমার ?"

"তালাক দেবার কথা প্রায়ই মনে হত, কিন্তু বৌকে সেকথা কখনও বলি নি। বৌ প্রায়ই বলত আমি যদি ওকে ছেড়ে যাই তা হলে ওর বাঁচবার পথ থাকবে না।

"বৌ তোমাকে ভালোবাসত ?"

"না, ভালোবাসত না।"

"তাহলে ওকথা বলত কেন ?"

"আমার মনে হয় ও প্রাণে বেঁচে থাকার কথাই বলত। ওর দাদার দৌলতে ওদের পরিবার উচ্ছন্নে গেছে আর ও ভালো করেই জানত ভবঘুরে বাজীকরের বৌকে কোনো ভালো লোক বিয়ে করতে রাজী হবে না। তার ওপর ওর পা দুটো এত ছোট ছিল যে খেটে খাওয়াও ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"তোমাদের দৈহিক সম্পর্ক কী রকম ছিল ?"

"সাধারণ দম্পতিদের যে রকম হয়।"

"তোমাকে কি সে একটুও পছন্দ করত না ?"

"আমারতো মনে হয় আমার প্রতি তার এতটুকুও অনুরাগ ছিল না। বলতে কি আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী হিসেবে বাস করাটা ওর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ছিল। তবু ও মুখ বুজে সব সহ্য করত। কী ধৈর্যের সঙ্গে যে ও সহ্য করত, পুরুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমার জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর নির্লিপ্তভাবে ও তা দেখত। আমি সত্য, উন্নত জীবনে পৌঁছাবার জন্য প্রাণপণে যুঝতাম নিজের সঙ্গে। ও সব দেখত তবু ওর চোখে সহানুভূতির একটু ক্ষীণ ছায়াও কখনও দেখি নি।"

"চরম সিদ্ধান্ত নাও নি কেন? কেন বোঝাপড়া করনি স্ত্রীর সঙ্গে? প্রয়োজন হলে কেন ছেড়ে যাও নি তাকে?"

"তার কারণ, আমার মন নানা আদর্শ দিয়ে ঠাসা ছিল।"

"কী আদর্শ?"

"আমি-চাইতাম বৌয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে যে আমার দিক থেকে যেন কোনো অন্যায় না হয়।...কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।"

"বৌকে মেরে ফেলার কথা কখনও তোমার মনে উদয় হয় নি?"

হান কোনো জবাব দিল না। জজ তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। দীর্ঘ বিরতির পর হান বলল, "ওকে মেরে ফেলার কথা মনে হবার আগে, প্রায়ই ভাবতাম ও মরে গেলে বেশ হয়।"

"আচ্ছা তাহলে, আইন বিরুদ্ধ কাজ যদি না হত তাহলে ওকে তুমি খুন করতে পারতে, তাই না?"

"আইনের কথা ভাবি নি হুজুর। তা ভেবে আমি নিরস্ত হই নি। আসলে আমার প্রকৃতিটাই দুর্বল। তাছাড়া খাটি জীবন যাত্রায় প্রবেশের আগ্রহটাও ছিল দুর্বার।"

"তা সত্ত্বেও বৌকে খুন করার কথা তুমি ভেবেছিলে—মানে, পরে ভেবেছিলে আর কি, তাই না?"

"মনস্থির করি নি কখনও। তবে হ্যাঁ, একবার কথাটা আমার মনে হয়েছিল বললেই সত্য কথা বলা হবে।"

"ঘটনার কত আগে কথাটা তোমার মনে হয়েছিল?"

"আগের দিন রাত্রে...কিংবা হয়তো সেদিন সকালেই।"

"ঝগড়া করেছিলে?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

"কি নিয়ে?"

"ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে তা বলবার কোনো মানে হয় না।"

"তবু বলতে চেষ্টা কর।"

"খাবার নিয়ে। খিধে পেলে আমার মেজাজ চড়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় আলসেমি করে বৌ সময় মতো রান্না করেনি। আমার বেজায় রাগ হয়ে গিয়েছিল।"

"ঝগড়াটা কি বড় বেশি জোর হয়েছিল?"

"না, কিন্তু পরে মনে মনে আক্রোশ ফেনিয়ে উঠেছিল। সেইটেই ছিল অস্বাভাবিক। জীবনকে কী করে উন্নত করা যায় তাই নিয়ে বড়ো বেশি ভাবছিলাম কয়েক সপ্তাহ ধরে। আর যত ভাবছিলাম ততই বুঝতে পারছিলাম ও বিষয়ে আমার কিছুই করণীয় নেই। মনটা তাই হয়তো খিঁচড়ে ছিল। শুয়েও ঘুম আসছিল না। যত বাজে চিন্তা ভিড় করে আসছিল। আমি অনুভব করছিলাম যা আমার লক্ষ্য তাতে কখনও পৌছাতে পারব না। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার জীবনের এই ঘৃণ্য দিকটা থেকে আমার মুক্তি নেই। মনে হয়েছিল এই নৈরাশ্যকর অবস্থার জন্য দায়ী আমার বিয়ে। আমি এই অন্ধকার থেকে বেরোবার জন্য মরীয়া হয়ে আলোর একটু রশ্মী খুঁজছিলাম, কিন্তু এমন কি এই আকাঙ্ক্ষাও যেন নিভে আসছিল। রেহাই পাবার একটু ক্ষীণ আশা তবু মনের মধ্যে দপ দপ করছিল। আর আমি মনে মনে জানতাম রেহাই যদি পাই সে হবে আমার মৃত্যু।

"আর তখনই আমার মনে কুৎসিৎ চিন্তাটা ছায়া ফেলতে লাগল, 'ও যদি মরে যায়! যদি মরে যায়! কেন তাহলে ওকে আমি মেরে ফেলব না?' এই পাপের বাস্তব পরিণাম কী হবে সে ভাবনার তখন আমার কাছে দাম ছিল না। সন্দেহ নেই আমাকে জেলে যেতে হবে। কিন্তু জেলের জীবন এর থেকে খারাপ হবে না, ভালোই হবে বরং। কিন্তু তবু আমার কেমন মনে হয়েছিল বৌকে হত্যা করেও কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। সে হবে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া, আত্মহত্যার মতো। নিজেকে তাই মনে মনে বললাম, দিন দিন যত দুঃখ আসুক মুখ বুজে আমাকে তা সয়ে যেতে হবে। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। দুঃখ ভোগ—এই হয়ে উঠেছে আমার সত্যিকারের জীবন।

"আমার মন যখন এই দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন ভুলেই গিয়েছিলাম আমার সকল দুঃখের কারণ আমার পাশেই শুয়ে। একান্ত অবসন্নভাবে আমি শুয়েছিলাম, ঘুমুতে পারছিলাম না। ভোঁতা একটা শূন্যতা নেমে এল মনে, আমার পীড়িত মন নিঃসাড় হয়ে এল, বৌকে খুন করার কথা একটু একটু করে মিলিয়ে গেল মন থেকে। দুঃস্বপ্নের পর যেমনটা হয়ে থাকে আমার মন ভরে গেল একটা বিষন্ন শূন্যতায়। মনে হলো সৎ জীবনযাপনের শুভ সংকল্পগুলির কোনোটাকেই বাস্তবে রূপায়িত করা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়—এতই দুর্বলচিত্ত আমি। রাত যখন ভোর হলো তখন দেখলাম আমার স্ত্রীও ঘুমোয় নি…”

“যখন ঘুম ভাঙল তখন কি পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করেছিলে তোমরা ?”

“আমরা একটি কথাও বলি নি।”

“ব্যাপারটা যখন এতদূর গড়াল তখন ওকে ত্যাগ করো নি কেন ?”

“ধর্মাবতার, আপনি কি মনে করেন এতে আমার সমস্যার সমাধান হতো ?” না, না, সে হতো সমস্যাকে পাশ কাটানো। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমার সংকল্প ছিল স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করব যাতে কেউ আমার কোনো দোষ না ধরতে পারে।”

হান আকুলভাবে জজের দিকে তাকাল। তিনি মাথা নেড়ে ওকে বলে যেতে নির্দেশ দিলেন।

“পরদিন নিজেকে খুবই অবসাদগ্রস্ত মনে হলো। স্নায়ুগুলো সব যেন রুক্ষ হয়ে থাকল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। জামা-কাপড় পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম. শহরের নির্জন রাস্তাগুলিতে এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়ালাম। জীবনের জট খুলবার জন্য কিছু একটা করা দরকার, বারে বারে এই কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল কিন্তু খুন করার কথাটা আর মনে আসে নি। আসলে আগের রাত্রির হত্যার সংকল্প আর অপরাধের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা ফারাক ছিল। সত্যি বলতে কি, বিকেলের খেলাটার কথা আমার একবারও মনে হয় নি। মনে হলে, ছুরির খেলাটা আমি দেখাতে যেতাম না। তার বদলে ডজনখানেক অন্য খেলা দেখান যেত।

“যাই হোক, বিকেল হলো। আমাদের খেলা দেখাবার পালা এল। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তা আমার একবারও মনে হয় নি। রোজকার মতোই কাগজ ফালাফালা করে কেটে ছুরির ধার দেখালাম। বোর্ডের উপর ছুঁড়ে মারলাম কয়েকটা ছুরি। অল্পক্ষণের মধ্যে আমার স্ত্রী এলো ঝলমলে পোশাকে সেজেগুজে। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসিতে দর্শকদের আপ্যায়িত করে সে বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি একটা ছুরি তুলে নিয়ে তার থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

“গত সন্ধ্যার পর সেই প্রথম আমাদের চোখাচোখি হলো। সেই প্রথম

আমি সচেতন হলাম সেই সন্ধ্যায় ঐ খেলাটা দেখাতে গিয়ে কতবড় ঝুঁকি নিয়েছি। স্নায়ুগুলোকে আমার বশে রাখতে হবে, অথচ অবসাদ আমার একেবারে মজ্জায় প্রবেশ করেছে। আমি বুঝতে পারলাম নিজের বাহুর উপরও আর বিশ্বাস রাখা যায় না। নিজেকে সংযত করার জন্য এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম। আর তখন অনুভব করলাম আমার সারা শরীর কাঁপছে।

"এইবার সময় হয়েছে। এইবার ওর মাথার উপর তাগ করে ছুরি ছুঁড়লাম, স্বাভাবিক থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে সেটা বিঁধে গেল। আমার স্ত্রী হাত উঁচু করল। তার বাহুর ঠিক নিচে ছুরি তাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথম ছুরিটা যখন আমার আঙুলের ডগা থেকে মুক্ত হলো কে যেন আমার হাত টেনে ধরেছে, ছুরিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগবে তার ওপর যেন আমার কোনো হাত নেই। যেখানে তাগ করেছি ছুরিটা সেখানে গিয়ে লাগাটা যেন ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার প্রত্যেকটি নড়াচড়া যেন জোর করে সচেতনভাবে করতে হচ্ছিল।

"স্ত্রীর কাঁধের বা দিকে তাগ করে একটা ছুরি ছুঁড়লাম। তারপর ডান দিকে আর একটা যখন ছুঁড়তে যাচ্ছি তখন হঠাৎ নজরে পড়ল ওর চোখে-মুখে কেমন অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মনে হলো আতঙ্কে ওর মুখটা শাদা হয়ে গেছে। ও কি তবে বুঝতে পেরেছিল নিমেষের মধ্যেই ছুরিটা এসে ওর গলায় বিঁধে যাবে? আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল; প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। প্রায় মরীয়া হয়ে শূন্যের দিকে তাগ করে ছুঁড়ে দিলাম ছুরিটা…।"

জজ স্তব্ধ হয়ে হানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

"হঠাৎ আমার মধ্যে ঠেলে উঠল এই চিন্তা, ওকে আমি খুন করেছি," দড়াম করে বলল হান।

"ইচ্ছে করে, কেমন?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল ইচ্ছে করেই করেছি।"

"শুনলাম ঘটনার পর তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেছিলে।"

"হ্যাঁ, স্যার। ফন্দীটা আমার মাথায় নিমেষের মধ্যে খেলে গিয়েছিল। জানতাম সকলেই আমাকে খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী বলে জানে। কিন্তু প্রার্থনার

ভান করতে করতে আসলে আমি কি করতে হবে না করতে হবে মনে মনে তারই হিসাব করছিলাম।

"তা হলে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তুমি যা করেছিলে ইচ্ছে করেই করেছিলে ?"

"আমি বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"তোমার কি ধারণা-এটা যে একটা দুর্ঘটনা লোককে তা বিশ্বাস করতে পেরেছিলে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা এখন ভাবলে আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি শোকাভিভূতের ভান করেছিলাম কিন্তু কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোক থাকলে সে তক্ষুনি বুঝতে পারত আমি আমি অভিনয় করছিলাম। সে দিন সন্ধ্যায় আমি মনে মনে ভেবে দেখেছিলাম আদালত থেকে আমার মুক্তি না পাবার কোনো কারণ নেই, কেননা সত্যি সত্যি আমার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। সবাই যদিও জানে স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না কিন্তু আমি যদি বরাবর বলে যাই এটা দুর্ঘটনা তাহলে তা যে মিথ্যে তা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলাম যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলে বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই চালিয়ে দেওয়া যায়।

"আর তখনই হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন জাগল, আমি নিজেই বা কেন বিশ্বাস করছি না এটা দুর্ঘটনা ? আগের রাত্রে আমি ওকে খুন করার কথা ভেবেছিলাম। এমনটাও তো হতে পারে সেইজন্যই এখন মনে হচ্ছে ঘটনাটা স্বেচ্ছাকৃত ? এইভাবে এমন একটা অবস্থায় পৌছালাম যখন মনে হলো ব্যাপারটা সত্যিই কি ঘটেছে তা আমি নিজেই জানি না। তখন আমার মনে সুখ হলো, অসহ্য সুখ। ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি।"

"ব্যাপারটা দুর্ঘটনা বলে স্থির করতে পেরেছিলে বলে ?"

"না তা বলতে পারি না: স্বেচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তখন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তাই স্থির করলাম মুক্তির সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মনে যা আছে সব খোলসা করে বলে দেওয়া। দুর্ঘটনা বলে নিজেকে বা অন্যকে প্রতারণা করে লাভ নেই। তার চেয়ে সোজাসুজি বলি না কেন কি ঘটেছিল আমি তা জানি না। ভুলে হয়েছে বললে সত্য

বলা হবে না, আবার ইচ্ছাকৃত বললেও মিথ্যে বলা হবে। বলতে কি আমি নিজেকে দোষীও বলতে পারি না, নির্দোষও না।”

হান চুপ করল। জজও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর চিন্তিত ভাবে মৃদু কণ্ঠে বললেন :

“তুমি যা বললে, মনে হচ্ছে সত্যিই বলেছ। তবু আর একটা প্রশ্ন, তোমার স্ত্রীর মৃত্যুতে একটুও কি দুঃখ অনুভব করছ ?

“একটুও না। যখন স্ত্রীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতাম তখন ভাবতেও পারি নি ওর মৃত্যুর কথা বলতে এত আনন্দ অনুভব করব।”

“ঠিক আছে”, জজ বললেন, “এবারে তুমি নেমে দাঁড়াতে পার।”

নিস্তব্ধভাবে মাথা নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হান। অদ্ভুত একটা আবেগে অভিভূত হয়ে জজ কলম তুলে নিলেন। টেবিলের ওপরে ছড়ানো দলিলগুলির ওপর লিখলেন “নির্দোষ।”*

অনুবাদ : বৈদ্যনাথ সেন

* শিগা নাওয়া (জন্ম ১৮৮৩) আধুনিক জাপানের একজন অগ্রগণ্য লেখক।

পরিকল্পনার সংকট

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

[বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো ও গতি-প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তাতে এখনকার আর্থিক পটভূমি বুঝি যাবে। ইতিমধ্যে দেশের জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এবারের বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে। আলোচনা যা হয়েছে তাতে দেখা যায় তৃতীয় পরিকল্পনার নির্দিষ্ট বরাদ্দ ও লক্ষ্যের দিক থেকে কোনো কাটছাঁট করা হবে না। দেশরক্ষাগত শিল্পের প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হবে বলা হয়েছে ; এ প্রসঙ্গে এবারের বাজেট উল্লেখ-যোগ্য এবং আলোচনার যোগ্য। মূল প্রবন্ধের বিষয়টি বুঝে নিলে বর্তমান আয়োজনের মূল পটভূমি জানা হয়ে থাকবে। এখন পর্যন্ত পরিকল্পনার মৌলিক কাঠামো ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে সরকারী নীতির কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত আমরা পাই নি। বর্তমান বাজেটের কর-স্থাপন দেখে ও তৎসম্পর্কে দেশের (ও বিদেশের ?) ধনিকশ্রেণী যেরূপ নিজেদের স্বপক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছে তাতেও বুঝা যায় পরিকল্পনার পদ্ধতি ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য থেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার কি পরিমাণে ঘটেছে।—লেখক]

আমাদের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির একটা যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যেই পরিকল্পনার সংকট বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের পরিকল্পনা মিশ্র-অর্থনীতি-ভিত্তিক বলা হয়। বেসরকারী বিনিয়োগের সহযোগে পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সাহায্যে আমাদের দেশে আর্থ-নীতিক উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও আর্থ-নীতিক ক্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রনের পরিমাণ, বেসরকারী বিনিয়োগ ও কর্তৃত্বের তুলনায় এত সীমিত যে আমাদের মতো নিম্নজীবনমান-সংবলিত ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার দেশে আর্থিক উন্নয়ন বাঞ্ছিত পথে ঘটে না। সীমিত অথচ পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ জনবহুল অনুন্নত অর্থনীতির অচলতা দূর করবার কাজেই শুধু ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এসব দেশে কেইনসের ভাষায় “To set the ball rolling”-এর কাজ করে। পরবর্তী কাজ করে এইসব ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানা। তাই এসব দেশের শিল্পায়নের

অগ্রগতিতে সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণসাধন হয় না। বিশিষ্ট ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ চার্লস বেথেলহেমের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—আমাদের অর্থনীতিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন: "With a private sector much larger than the public sector, it is practically impossible to allocate investments and to select techniques which would be in conformity with the needs of a rapid and planned economic growth." (Studies in the Theory of Planning) বাস্তবিক কমিউনিস্ট দেশগুলির কথা বাদ দিলেও পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে যে পরিমাণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনুসৃত হয়ে থাকে তার তুলনায় ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির দেশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেক কম। অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল লিখেছিলেন, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপে যেটুকু আয়-বণ্টনের চেষ্টা হয়ে থাকে ভারতের ক্ষেত্রে তাও ঘটে না।

একটা হিসেব থেকে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ উন্নয়ন বাবদ সরকারী ক্ষেত্রে মোট লগ্নীর পরিমাণ হলো ৬৯০ কোটি টাকা আর বেসরকারী ক্ষেত্রে খনি, বাগিচা, গৃহাদি প্রভৃতি বাবত লগ্নীর পরিমাণ ১৭০০ কোটি টাকা। তাছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল, বেসরকারী মালিকানায় লগ্নীর পরিমাণ লক্ষ্যকে পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্রেই ৯০০০ কোটি টাকা বাড়তি লগ্নী ঘটেছে; আর সেক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ লক্ষ্য থেকে শতকরা ২০ ভাগ পেছিয়ে রইল।

অর্থাৎ তুলনায় বেসরকারী ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারণশীল। অবশ্য বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নতমান অপ্রধান ভোগ্য পণ্যের (non-priority consumption goods) ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-পরিমাণ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। রেয়নশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে ২২০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ৫৭০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত করার ব্যাপার থেকে বিষয়টি প্রকট হয়। তাছাড়া, অটোমোবাইল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রকযন্ত্র, রেফ্রিজারেটর, আধুনিক কায়দায় সৌখীন গৃহ নির্মাণে বিপুল ব্যয়ের পরিমাণ থেকেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। অথচ ভারী ও মূল শিল্প ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর দিক থেকে পরিকল্পনার লক্ষ্য থেকে আমরা পেছিয়ে রইলাম অনেকটা। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও দেখা যাচ্ছে যেখানে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হবে পূর্বাপেক্ষা ১½ গুণ, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানায় বিনিয়োগ হবে পূর্বের

তুলনায় ১½ গুণ। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা সাহায্য দেবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর। অথচ যেক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী শিল্পে মুনাফার হার শতকরা ৭% এবং বিভিন্ন অপ্রধান ক্ষেত্রে বিপুলভাবে বেসরকারী বিনিয়োগ ঘটছে, সেক্ষেত্রে এইটেই আশা করা উচিত যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে সংগৃহীত মুনাফার মোটা অংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সত্যিকারের উন্নয়নমূলক বিনিয়োগে লগ্নী হিসেবে ফিরে আসবে। অর্থাৎ সত্যিকারের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার একটা আদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়ে উঠছে।

একথা বলা চলে আমাদের পরিকল্পনায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বেসরকারী মালিকানার স্বার্থে শিল্পে ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় production accumulation-এ ও ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দুটি উদ্দেশ্য চোখে পড়ছে ; প্রথমত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ব্যবহারের সাহায্যে জনসাধারণের উপর কর বসিয়ে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগমূলক মূলধন সংগ্রহ ও ভারী ও মূল শিল্পে লগ্নী করা—যার ঝুঁকি বহন ও যার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল মূলধন সংগ্রহ ভারতের বর্তমান ধনিক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। একাজ যেদিন ক্রমশ সম্ভব হবে সেদিন এ-সব ক্ষেত্র থেকেও রাষ্ট্রকে সরে দাঁড়াতে হতে পারে। সে লক্ষণও পরিস্ফুট। এ প্রসঙ্গে ভারতের ধনিকপ্রবর শিল্পপতি শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার একটি উক্তি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি লিখেছেন : "It appears now that the policy of Government is changing. It has been publicly said by the responsible ministers only recently that they desire to shift gradually more towards the private sector ; the future pattern of investment seems to be a ratio of 1 to 2. That is, one for the public and two for private. (Journal of Commerce, P-1 ; Oct. 7, 1957)

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ও স্বল্প দায়িত্বে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ করা, যাতে বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্র উপকৃত হবে অথচ বৈদেশিক শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শঙ্কাও রইল না। আর এই কারণে আরও কিছু দিন বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানার কর্তৃত্ব—তা সে যতটুকুই হোক—মাথা পেতে নেবে।

বেসরকারী মালিকানার দিক থেকে উপরের দুটি উদ্দেশ্যই সত্যি সার্থক হয়েছে। শিল্পোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারী শিল্পের প্রসারও পূর্বের তুলনায় মোটামুটি ভালোই হয়েছে বলা চলে। বৈদেশিক সাহায্যও বেশ মোটা রকমই পাওয়া গেছে। আবার বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ হয়েছে যা প্রাক-পরিকল্পনা-কালের প্রায় দ্বিগুণ। আগে বলেছি, ব্যক্তিক্ষেত্র ও ব্যক্তি মুনাফার পরিমাণ তুলনায় অনেক দ্রুত তালে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে টাকার বাজার, অন্যভাবে বলি ফিন্যান্স ক্যাপিটাল, আমাদের অর্থনীতিতে প্রসারিত ও সুসংগঠিত হয়েছে এবং বেসরকারী মালিকানাও এই সূত্রের উপর ক্রমশ মূলধন সংগ্রহের জন্য অধিকতর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ পরিণামে এ দিক থেকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং স্বভাবতই রাষ্ট্রের অর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের পরিধি ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

কিন্তু পদকের অন্য পৃষ্ঠায় ভিন্ন ছবি, যে ছবিতে এই ধরণের উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ জাতীয় আয় সাবিকভাবে বৎসরে অত্যন্ত অল্প হারে অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং মাথাপিছু বৃদ্ধির হার মাত্র ১·৫%। আর ধনবৈষম্যমূলক অর্থনীতিতে মাথাপিছু বৃদ্ধির রহস্য যে কি তাও সবার জানা। তাছাড়া, আরও একটা কথা স্মরণীয়। মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিতে এই সামান্য ১·৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছে। আর মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতিতে কোন শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পায় তা সবার জানা। কাজেই ১·৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে কারা উপকৃত হচ্ছে তা আর বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন, এই সামান্য বৃদ্ধির গতি কিন্তু নিম্নমুখী। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যেখানে আয় বৃদ্ধির হার ১৫% সেখানে প্রথম পরিকল্পনায় সেই হার ছিল ২০%। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের হার যে স্বল্প সেই স্বল্পই থেকে গেল। প্রথম পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তা বেড়ে হলো মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। তৃতীয়ত, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিনিয়োগ লক্ষ্যানুযায়ী ঘটল না—তা লক্ষ্য থেকে ২০% ভাগ পেছিয়ে পড়ে রইল। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যালান্স সমস্যা হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারণ সম্ভব হলো না।

প্রথম তিনটি সমস্যার জন্য রাষ্ট্রীয় কর-নীতি অনেকখানি দায়ী। আবার

তা ব্যাপকতর ব্যক্তিক্ষেত্র-প্রধান অর্থনীতিতে সীমিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ফল। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত মোট সরকারী আদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ ৬০% ভাগ থেকে ২৭·৪% ভাগে নেমেছে। অথচ প্রত্যক্ষ করপ্রদানকারী শ্রেণী জাতীয় আয়ের যে অংশ পেয়েছে তা ঐ সময়ে ৭·৯% ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯·৩% ভাগে উঠেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর থেকে আদায়ের পরিমাণ হলো ১০৫২ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে ৮০% ভাগ আদায় করা হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় করনীতির সীমাবদ্ধতার আরেকটি নিদর্শন ১৯৬১ সনের ২৩ মে'র স্টেটসমান কাগজ উল্লেখ করেছেন। কলকাতার বেসরকারী শেয়ার বাজার কাটনি মার্কেট প্রখ্যাত। এই কাটনি শেয়ার বাজার গত কয়েক বছরে সরকারী শেয়ার মার্কেট অপেক্ষা ক্রমশ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই বাজারে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ হলো ১০ কোটি টাকা। অথচ এই বিপুল টাকার লেনদেনের উপর কর বসিয়ে সরকার বেশ লক্ষণীয় পরিমাণ আর্থনীতিক সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারতেন; ফলে, পরিকল্পনার রসদাভাব কিছুটা দূর হতে পারত। ১৯৬১ সনের ২৩ মে'র স্টেটসম্যান কাগজ যথার্থই লিখেছিলেন: "According to an export estimate the Govt. of India would not have had to impose quite such heavy excise duties and cause quite such hardships to the ordinary citizens, if steps were taken to recover the Govt's share from the vast untaxed money that floats in the katni market daily".

বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্স সমস্যার একটি অন্যতম কারণ; বেসরকারী-ক্ষেত্রপ্রধান সীমিত পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগমূলক অর্থনীতিপুষ্ট উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উন্নতমান ভোগ্য পণ্যের চাহিদা এবং সেই চাহিদা তৃপ্তি করবার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ ভোগ্য পণ্যের আমদানী অথবা ঐ সব ভোগ্য পণ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কারিগর বিশেষজ্ঞ এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানী। যদিও ঐসব পণ্য বা শিল্প ভারতের বর্তমান আর্থনীতিক অবস্থায় মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। অথচ ঐসব শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা ঐসব ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে রসদাভাব ঘটছে বা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তাদের প্রসারণ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রেয়ন

শিল্পের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী মালিকানায় রেয়ন উৎপাদন ক্ষমতাকে ১৯৫৬-৫৭ সনের ২২০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে ৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড করা হয়েছে এবং উৎপাদনের ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছে। অথচ ঐ সময়ে ভারী ও মূল শিল্পের প্রসার রসদাভাবে লক্ষ্য থেকে ২০% ভাগ পেছিয়ে রইল। আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় খসড়া রিপোর্টে প্রথমে বলা হলো, কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে এবং উৎপাদন চালু রাখতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় বলে পরিকল্পনায় রেয়নের উৎপাদন-প্রসারণের গুরুত্ব দেওয়া হবে না (পৃঃ ২০৬-২০৭—খসড়া রিপোর্ট)। অথচ চূড়ান্ত রিপোর্টে দেখা গেল—বলা হয়েছে অন্যান্য শিল্পের সাথে সাথে রেয়নের উৎপাদনও বাড়ানো হবে। আবার ১৯৬২ সালের জুন মাসের খবরে প্রকাশ, ১৩টি রেয়ন শিল্পের কাঁচামাল 'পাল্প' তৈরির কারখানা এবং রেয়নের স্থতো তৈরির জন্য ৯টা নতুন কারখানা বসাবার আবেদন সরকার মঞ্জুর করেছেন। নীতির এই পরিবর্তনের কারণ কি? রেয়ন শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় পড়ে এবং এই শিল্পে মুনাফা অনেক। তাছাড়া এই শিল্পের পত্তন ও প্রসারের ব্যাপারে যে সব শিল্পপতির স্বার্থ জড়িত তাঁরা হলেন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানার অন্যতম প্রতিনিধি। এঁরা হলেন, বিড়লা, সিংহানিয়া, সাহু জৈন ও দক্ষিণ ভারতের শেমারী ব্রাদার্স। এঁদের স্বার্থের নির্দ্দেশেই সরকারী নীতি নিধারিত হয় ও আবার প্রয়োজন হলে পাল্টায়ও। পরিকল্পনা অর্থনীতিবিদ প্যানেল-সদস্য অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল লিখেছেন: "Both import and export license have been controlled *adhoc* throughout the Plan decade and never been connected with a path of industrialisation and in relation to long-term planning." আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো, দেশের আভ্যন্তরীন মূল্যবৃদ্ধি যার আবার একটি অন্যতম কার ণ কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতা, এবং অপরটি হলো, রাষ্ট্রের পণ্যমূল্য ও ভোগ-নিয়ন্ত্রন নীতির অভাব।

কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতার ফল, অতীব শ্লথ কৃষি উৎপাদন অগ্রগতির দরুণ কতকগুলি বিরোধের সূত্রপাত। প্রথমত, কৃষিগত কাঁচামালের প্রয়োজন ও তার যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্যের আকারে শিল্পায়ন ও কৃষি-উন্নয়ন গতির

মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়ত প্রধান মজুরী পণ্য (Wage-goods) খাদ্যশস্যের, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবপ্রসূত দ্বন্দ্ব এবং এর ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের প্রকৃত আয়কে অতি নিম্ন স্তরে বেঁধে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে তৃতীয় বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা হলো, একদিকে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা ও স্বল্প-আয়-সম্বলিত জনসাধারণের এই সব পণ্যের সীমিত চাহিদার বিরোধ। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (idle capacites) এবং অবিক্রীত বিপুল পণ্য-মজুতের পরিমাণ এই বিরোধের সূচক।

কৃষি-অর্থনীতির দুর্বলতা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে একথা বলা চলে আজও শিল্পায়নোপযোগী কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত সংস্কার সাধন সম্ভব হলো না। ফলে ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকার জনসংখ্যাবৃদ্ধির তালে বেড়ে চলে এবং তার ফলে ও প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের উপস্থিতি ও সক্রিয়তার দরুণ কৃষি-অর্থনীতির বাড়তি ফসল শিল্পমুখী হয় না বা হলেও ঐ সব স্বার্থের চক্রান্তে কৃত্রিমভাবে বর্ধিত মূল্যে বাজারে আসে। "Most of the food surplus is produced by the peasants and generally reaches the market through a series of *dalal* middle men who buy in advance—on speculation. These *dalals* are often money-lenders as well. Competition between them is restricted. Most peasants are under debt-vassalage either to rich peasant propriotors or to these middle men. Capitalist agriculture for the more important cash crops (cotton groundnuts, tobacco, fruit) exist as also for general farming, but the total percentage in negligible." ভূমি সংস্কার নীতি যা আমাদের দেশে আংশিকভাবে অনুসৃত হয়েছে তার ফলে নতুন কৃষক শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছে, আমাদের অর্থনীতির কাঠামোতে। বড়ো বড়ো আড়তদার দোকানদার শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা আবার মহাজনও বটে, কখনই রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর মূল্য নিয়ন্ত্রনের সম্মুখীন হতে হয় না। কাজেই সেই সুযোগে নিজেদের ইচ্ছামত কৃত্রিমভাবে যোগান সীমিত করে কালোবাজারী অর্থনীতিকে আরও উৎসাহিত করতে থাকে। বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের মধ্যেও এই প্রবণতা প্রবল। এই ধরনের বহু বড়ো কৃষক মহাজন

দালালী ফড়িয়া চক্রের অস্তিত্ব যতদিন স্বীকৃতি পাবে এবং গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করবার স্বাধীনতা ভোগ করবে ততদিন শিল্পায়ন ও বর্তমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন যোগান বাড়ানো সম্ভব হবে না কিছুতেই। গত এক যুগের অভিজ্ঞতাই তাই বলে। কৃষি-অর্থনীতির ব্যর্থতা শুধুমাত্র যে মোট উন্নয়নের দিক থেকে শিল্পক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাদন যোগানের অক্ষমতারূপে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে তা নয়। এর আরেকটা ইতিবাচক দিকও আছে; তা হলো রাষ্ট্র কর্তৃক সেচ ব্যবস্থা, সমষ্টি উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতি বাবদ যে বিপুল অর্থব্যয় এই গত কয় বৎসরে করা হয়েছে একদিকে তার কোনোরূপ প্রতিদানে কৃষি-অর্থনীতির ব্যর্থতা এবং অপরদিকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত কাঁচামাল আমদানী বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থের অপব্যয়। একথাটা এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকেও উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে কৃষি-অর্থনীতির সংগঠনগত উন্নয়ন এবং উৎপাদন সম্পর্কগত কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র অর্থ লগ্নীর ফল কৃষি-অর্থনীতির আরও অবনতি এবং মুষ্টিমেয় বড়ো কৃষক-মহাজন-ব্যবসায়ী চক্রের আরও পুষ্টিসাধন। কৃষি উৎপাদনের যে কর্মসূচী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে তাতে মূল সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। বেশি পরিমাণে সার, জল, গুদাম, ঋণ প্রভৃতি বর্তমান কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কগত ব্যবস্থায় তারাই পায় এবং পেয়েছে যারা জমির মালিক, প্রকৃত চাষী নয়। ভূ-সম্পত্তির মালিকানা কাঠামোতে মূলত কোনো বদল হলো না। বরং জমিদারী আইন এড়িয়ে জমি কেন্দ্রিকতা বেড়েছে। নগদ টাকায় মজুরী দিয়ে চাষ করবার ধনতান্ত্রিক প্রথা আমাদের অর্থনীতিতে চালু হয়েছে এবং এই লক্ষণীয় প্রথার প্রসারের জন্যই বিকৃত উদ্দেশ্যে সমবায়ী ঋণও ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ যে সীমিত ও অপূর্ণ সমবায়-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত হচ্ছে তা প্রকাশ্যে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনেই সাহায্য করছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার দরুণ বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন ও যন্ত্রীকরণ এবং কৃষি-শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি-অর্থনীতির এইটাই প্যারাডক্স। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, তৃতীয় পরিকল্পনাতে কৃষি-সংগঠন ও উৎপাদন সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিতে বিপুল টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ প্রথম থেকে উৎপাদন সংগঠন ও সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র খাদ্যের বাজারে ফাটকাদারি বন্ধ করতে পারলে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কণ্ট্রোল ও

রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেও যে সুফল ঘটত তাতে কৃষিতে এত বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো না। বিশেষ করে যেখানে ভারী ও মূল শিল্পে বিনিয়োগপযোগী মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে এইসব ব্যবস্থার সাহায্যে মূলধন বিনিয়োগের অপচয় বন্ধ করা উচিত। কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করাই উন্নয়নের প্রথম স্তরে মূলধন সংগঠনের পথ। অথচ আমাদের দেশে তা না করে বরং যে মূলধন বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগ হতে পারত তা কৃষিতে লগ্নী করা হচ্ছে। প্রথম দিকে শিল্পের প্রসার ঘটালে সেই শিল্প থেকে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি হতো এবং তার ফলে কৃষি-উৎপাদনপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারত। এর ফলে আবার একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, আমদানী বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন কালের খাদ্য সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। অথচ এ পথে না গিয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হারও হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অর্থনীতির আরেকটি দুর্বলতার দিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তা হলো বেকার সমস্যার দিক। বাস্তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনো বিশ্লেষণ না করে কেবল হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনার রিপোর্টে বলা হলো: "The increase in employment during the Second Plan has not kept pace with the growth of the labour force. It was hoped that the developmeut programmes envisaged would lead to the creation of 8 million additional jobs outside agriculture. The achievement for the plan period is at present estimated at about 6·5 million," পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করলেন যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাবে। ১৯৫৫-৫৬ সালের বেকারের পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ, বর্তমানে তার পরিমাণ ৭৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৫ লক্ষে। মনে রাখা দরকার কৃষিক্ষেত্রের বাইরের এই হিসেব। এই হিসাবে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্যে ১৫ লক্ষ লোক নতুন কাজ পেয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৩৫ লক্ষ লোক সেখানে নতুন কাজ পাবে। অথচ সবাই জানি, কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি সরিয়ে আনাই যেখানে মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা সেখানে এত বেশি লোককে নতুন করে কৃষিতে কোনো প্রকারেই নিয়োগ করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থায় বেকারের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের দিকটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের অনুপাত এমনভাবে সাজান হয়েছে যে এতে স্বনির্ভরশীল স্তরে পৌছানোর অভিযান শুরু করা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া 'রাষ্ট্র শিল্পক্ষেত্রে' বেশির ভাগ বিনিয়োগ হবে পুরনো অর্ধনির্মিত উৎপাদনক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও যে সব শিল্প লক্ষ্যানুযায়ী উৎপাদন করতে সমর্থ হয় নি বা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যে সব শিল্পের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা যায় নি—সেরূপ ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা হয় নি। তাই পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই বলেছেন, "তৃতীয় পরিকল্পনার অনেক কাজ চতুর্থ পরিকল্পনায় টানতে হবে।" ব্যক্তিক্ষেত্রে দেখি, সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে বহু বিচিত্র রকমের ভোগ্যদ্রব্যের ও হাল্কা ধরনের শিল্পের পত্তন হয়েছে। বাসগৃহ, আমোদপ্রমোদ এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অসংখ্য আধুনিক কায়দায় সৌখিন বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, সৌন্দর্যমণ্ডিত অট্টালিকা নির্মাণ, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ও গাড়ি তৈরি প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের প্রসারের দরুণ আর্থনীতিক কাঠামোর তৃতীয় ধাপের অভূতপূর্ব বিকাশ ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের আর্থনীতিক জীবনে এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বড় বড় শহর নগর এলাকায় দুষ্প্রাপ্য উপকরণগুলি এই ধরনের শিল্পের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ যাতে প্রকৃত উন্নয়নের হার দ্রুত হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে শিল্পায়নের কার্যক্রম, উপকরণের অপচয়, অপব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষে অব্যবহারের রূপেই প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া, তৃতীয় পরিকল্পনাতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে এবং এর পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার মোট সঙ্গতির এক-তৃতীয়াংশ। আর ঐ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনের পরিমাণ ৫৭৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে ৩৭০০ কোটি টাকা রপ্তানী বাণিজ্য থেকে আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে গড়ে বার্ষিক রপ্তানীর তুলনায় প্রতি বৎসর ৭৩ কোটি টাকা অধিক রপ্তানী হবে এই আশায় এই

হিসেব কষা হয়েছে। কিন্তু রপ্তানীর এতটা বৃদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থাতেই সম্ভব কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। তার উপর, এই বৎসর থেকে বৃটেনের ইওরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানের ফলে স্বাভাবিক পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ২৭·৫ ভাগ বৃটেনের সঙ্গে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসেবে শুল্কের ব্যাপারে আমরা এতদিন যে সব সুযোগ সুবিধে ভোগ করেছি তা এবার হ্রাস পাবে—কাজেই রপ্তানী থেকে পাওনা হ্রাসের দরুণ বৈদেশিক মুদ্রা সংকট নিঃসন্দেহে তীব্রতর হবে। আমরা স্ব-নির্ভরশীল নিয়মের পর্যায় থেকে কত দূরে আছি তা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের আজও অসহায় ও অস্বাভাবিকভাবে নির্ভরশীলতা থেকে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়।

আবার দেখি পরিকল্পনামূলক আর্থনীতিক কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আমাদের তার প্রত্যেকটিই অনুপস্থিত। যেমন, ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের মাধ্যমে সঞ্চয়ের যথার্থ উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, বৃহৎ ব্যক্তিগত ফাটকাদারী ও শেয়ার ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দেশের আর্থনীতিক সম্পদ উদ্ধারের ব্যবস্থা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণমূলক কোনো ব্যবস্থাও আমাদের পরিকল্পনায় আজ পর্যন্ত স্থান পেল না। অথচ সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থকতার অন্যতম সর্ত প্রধান প্রধান পণ্য ও আয়ের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আর তা না করা হলে, ব্যক্তি-মালিকানা পরিচালিত মূল্যনীতির মাধ্যমে জাতীয় আয় ও বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক রসদ এমনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টিত হবে যে তাতে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিলাসদ্রব্যমূলক ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে উন্নয়নের পক্ষে বাঞ্ছিত মূল্যস্তর রক্ষা করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী শিল্প-গোষ্ঠীর স্বার্থানুযায়ী মূল্যস্তরে যে পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন তা ঘটছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গ্যাডগিল লিখেছিলেন : A great number of policy decisions and even more their absence in relation to Indian Planning can only be explained reasonably in the light of interest of classes or groups in power. The deliberate shally-shalling about food policy has no meaning except as

arising out of desire to protect the threaded interests of the rural money-lender, trader and grain wholesaller who even today form an important part of the Indian capitalist class. In the same way, the foregn exchange debacle of 1956-57, the continuance of *adhoc* licensing policies for export and import quotas with large speculative gains which they flagrantly make possible, the twofold misdirection of plan involved in the special licensing of imports of industrial capital goods and materials in the supposed interests of promotion of exports, all these appear related to more closely to profits of private groups than to national development policy.

উপরের বিশ্লেষণ থেকে আমাদের পরিকল্পনার সংকট সহজেই চোখে পড়ে এবং এই সংকট যে প্রচলিত আর্থনীতিক কাঠামোপ্রসূত, তাও পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, ক্রমশই যে পরিকল্পনার পরিধি সীমিত ও সংকুচিত হয়ে আসবে—তার লক্ষণও এখনই ফুটে উঠেছে বিভিন্ন দিক থেকে। এই সংকটের উৎস হলো, বিশেষ করে কৃষি ও বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পক বজায় রেখে অধিকতর ক্ষমতাশালী ও ব্যাপকতর ব্যক্তিক্ষেত্র-প্রধান আর্থনীতিক কাঠামোয় সীমিত রাষ্ট্রীয় মালিকানা। বিপুল ও বর্ধমান জনসংখ্যাসংবলিত অনুন্নত আর্থনীতিক কাঠামোয় এই পদ্ধতি সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়নের পরিবর্তে এই সব দেশের বিলম্বিত দুর্বল ধনিকশ্রেণীর পুষ্টির সহায়ক হয়। ভারতবর্ষের গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। কাজেই সত্যিকারের আর্থনীতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে আমাদের নতুন করে ভাববার দিন এসেছে।

ডাকবাংলার ডায়রি

স্নবচনী

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

সুন্দরবনে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। ফিরলাম কোলাঘাট থেকে। শুনলে লোকে হাসবে।

যখন মোমিনপুরের মোড়ে বাস ধরব বলে দাঁড়ালাম তখন গরমের ঠিক-দুপুর। গলা পিচের ওপর ঠিক্‌রে পড়ছে রোদ। চোখ চাওয়া যাচ্ছে না। মোমিনপুরের আকাশকেও বলিহারি। আকাশ তো নয় যেন আদেখলের ঘটি। ৭৬ নং বাসটাও এলো রোদ্দুরে বেজায় মাথা গরম ক'রে। যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সেখান থেকে বাস বদলে কাকদ্বীপ।

বাসের যাত্রীদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ রোদ্দুরে সবাই বেরিয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে। কেউ রুগীর জন্যে ওষুধ কিনতে, কেউ সওদা করতে, কেউ মামলা লড়তে শহরে এসেছিল। গাঁয়ের তালেবর লোকগুলোকে দেখলেই চেনা যায়। দশ আঙুলে আংটি, কিন্তু কাপড়টা ঠিক হাঁটুর ওপর তোলা। যেসব গঞ্জ-মতো জায়গায় বাস বেশীক্ষণ থামে, সেখানে ডাব নিয়ে দরাদরি করবে, তারপর গজর গজর করতে করতে ডিবে থেকে বিড়ি বার করে উল্টোমুখে বারকয়েক ফুঁকে ধরাবে।

একটা লোক আমার ঠিক পাশেই সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসে ছিল। খানিকক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে একটু রুক্ষভাবেই বললাম পাটা নামিয়ে নিতে। লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে পাটা নামিয়ে আধতোলা করে থাকল। প্রথমটা বুঝিনি, খালি পা মেঝেয় ছোঁয়াতেই তার পা তোলার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঝেটা তেতে আগুন হয়ে আছে। আর আমার পাশের লোকটির পায়ে জুতো নেই।

বেলাবেলি কাকদ্বীপে পৌছুবে বলেই এমন ঠিকদুপুরে বাড়ি থেকে বেরুনো। বেলাবেলি। কাকদ্বীপে পৌছুনো। আশ্চর্য। বছর পনেরো আগেও কথাটা

কেউ ভাবতে পারত না। কাকদ্বীপ তখন ছিল অনেক দূরের রাস্তা। নৌকোয় করে ছাড়া যাওয়াই যেত না। আসতে যেতে জোয়ার-ভাঁটার জন্যে বসে থাকতে হত। শহরবন্দরে রাতটুকু অপেক্ষা করতে গিয়ে কত যে সব বিশ্রী বিশ্রী রোগ হতো। খালের ওপর পুল আর সটান পাকা রাস্তা হওয়া অব্দি কাকদ্বীপ তো এখন কলকাতার কোলের কাছে চলে এসেছে। ঘড়ি ঘড়ি বাস। এখন হুস্ করে গিয়ে হুস্ করে চলে আসা যায়।

আমতলা ছাড়াবার পর পেছনের একটা বাস হুস্ করে এগিয়ে যেতে একটা কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল। রাস্তা এমন কিছু চওড়া নয়। পাশে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি, নাহলে খাদ। আমাদের বাসের ড্রাইভারের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে সামনের বাসটাকে পেছনে ফেলতে হবে। বাসের অমন স্পীড জন্মে দেখিনি। রীতিমত ভয় করতে লাগল। সামনের বাসটা রাস্তা আটকে আটকে চলেছে। একটা গরুর গাড়ি সামনে পড়ায় আগের বাসটা যখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের বাসটা পাশের গড়ান জমিতে কাত হয়ে কিভাবে যে এগিয়ে গেল সে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। ড্রাইভারের ওপর কি রাগ যে হচ্ছিল বলবার নয়। এতগুলো মানুষের (বিশেষ করে আমার) জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবার কী অধিকার আছে তার? আগের বাসটাকে পিছিয়ে পড়ে যেতে দেখে খানিক পরে আবার ভালও লাগল। মোট কথা, প্রাণ হাতে করে শেষ পর্যন্ত ভালোভালি ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে গেলাম।

কাকদ্বীপের বাস ছাড়তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সেই ফাঁকে গঙ্গার ধারটা ঘুরে এলাম।

গঙ্গা না বলে হুগলী বললেই ঠিক বলা হয়। নাম যাইহোক, নদী এখানে প্রকাণ্ড চওড়া। মাঝগাঙের নৌকোগুলো এইটুকু এইটুকু দেখাচ্ছিল। পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। ছেলেবেলার কতকগুলো ধারণা থাকে, বড় হয়েও মন থেকে কিছুতে যেতে চায় না। ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্র আছে, এ কথাটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বন্ধুবান্ধবেরা গাড়ি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে যেত ফুর্তি করতে, বোধহয় তাদের কাছ থেকে শুনে থাকব। খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে থাকত আমার এক ইস্কুলের বন্ধু। তাদের ছিল লোহালক্কড়ের ব্যবসা। গরমের সময় দু-চারদিন তাদের গাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে গিয়েছি। তাদের মুখ

থেকে শুনতাম দক্ষিণের হাওয়া আসে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ময়দানে তখন ফেরি করে তপ্‌সে মাছ বিক্রি হত। শুনতাম তপ্‌সে মাছ নাকি মাছের রাজা। সাহেবসুবোরা খায়। এই তপ্‌সে মাছও নাকি ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্র থেকে আসে। আর যুদ্ধের সময় জাপানী গুপ্তচররা বঙ্গোপসাগর থেকে তো সটান ডায়মণ্ডহারবারেই নেমেছিল। আসলে মানচিত্রে যাই থাক মনে মনে আমরা বরাবরই সমুদ্রকে ডায়মণ্ডহারবারের কোলে বসিয়ে এসেছি।

এককালে বাইরের জাহাজগুলো আসতে যেতে ডায়মণ্ডহারবারেই নঙ্গর ফেলত। সে আজ দেড়শো বছরেরও আগের কথা। আসতে মাল খালাস আর যেতে মাল তোলার কাজ প্রধানত এখানেই হতো। তখন এখানে ছিল সারবন্দী মালগুদাম। গ্রামে খাবারদাবার জিনিসপত্র মিলত। পাশেই ছিল সাহেবসুবোদের কবরখানা। ডায়মণ্ডহারবার ছিল তখন খুব এক ফুর্তির জায়গা। দমদম নিয়ে পুরনো একটা গান আছে না:

দেখো মেরি জান
কোম্পানি নিশান।
বিবি গিয়া দমদমা
উড়ি হ্যায় নিশান।
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব
বাঁকা কাপ্তান,
দেখো মেরি জান,
লিয়া হ্যায় নিশান।

এ গান সে সময়ে ডায়মণ্ডহারবার সম্পর্কে খাটত।

জলপথে ডায়মণ্ডহারবার উনপঞ্চাশ মাইল হলেও, গাড়ির রাস্তায় বত্রিশ আর ট্রেণে আটত্রিশ মাইল। এককালে যে ডায়মণ্ডহারবারের নাম ছিল হাজিপুর, সে কথাটা লোকে এখন ভুলেই গেছে।

ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে কাকদ্বীপের বাস ছাড়ল। পুলটা পার হতেই দেখলাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে লোকে কী সব দেখছে। 'এইখেনে হ্যাঁ, এইখেনে'—কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। পরে শুনলাম আগের দিন একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা লরি খালে পড়ে গিয়েছিল। জল থেকে লাস তোলা হয়েছে আজ সকালে।

বেশ কিছুক্ষণ সারা বাস থমথম করতে লাগল।

বাইরে পড়ন্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠ। মাঝে মাঝে বেড়া-দেওয়া উঁচু উঁচু ভাঙা জমি। বেড়ার গায়ে ঘুর ঘুর করছে ছাগল। এক জায়গায় মাঠের মধ্যিখানে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

এ রাস্তায় আগেও একবার এসেছিলাম। বাস তখনও চলতে আরম্ভ করেনি। তখন এ রাস্তায় যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ট্যাক্সি। শুধু ট্যাক্সি বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বিশ্বম্ভর ট্যাক্সি। যেখানে গায়ে গা দিয়ে ছ-জনের বসবার জায়গা হয়, সেখানে যে কেমন করে ভেতর-বাইরে তিরিশ চল্লিশটা লোক এঁটে গেল না দেখলে বিশ্বাস হতো না। ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কথা মনে আছে। সারা রাস্তা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গিয়েছিলাম। লোকটা ছিল নেপালী। কিন্তু দখ্‌নো ভাষা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। স্বভাবটা ভারি মিষ্টি। গালের ওপর প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ। যুদ্ধের সময় মিলিটারিতে ট্রাক চালাত। কোহিমার কাছে এক পাহাড়ে বাঁক নিতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। কী করে যে বেঁচে গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য। মিলিটারি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পেটের ধান্ধায় অনেক জায়গায় ঘুরেছে। বছর দুই দেশে যায়নি। ছোট মেয়েটার জন্যে মন কেমন করে। বাস হওয়ার পর থেকে এ রাস্তায় ট্যাক্সির আর কদর নেই। কোথায় গেল সেই লোকটা ?

মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামারি, কুল্‌পি, ট্যাংরার চড়া, করঞ্জলি পেরিয়ে সন্ধ্যে হব-হব সময়ে কাকদ্বীপে পৌঁছুলাম। সামনে নামখানার বাস দাঁড়িয়ে। বনবিভাগের আপিস নামখানায়। যেতে কতক্ষণ লাগে, কত ভাড়া, সব জেনে নিলাম।

বাসস্টপ থেকে ডায়নামোর ভটর ভটর আওয়াজ শুনছিলাম। বুঝলাম এ আওয়াজ বরাবর গেলেই কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপ পেয়ে যাব। কদিন ওখানেই আস্তানা গাড়া যাবে। তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় যাব।

সম্মেলনে বিস্তর চেনা লোক মিলে গেল। সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছে। আমার মতো রবাহূতের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। যাদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেছিলাম তাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সভা, মিছিল, সম্মেলনে যাওয়ার মধ্যেও একটা নেশা আছে। না যেতে পারলে মন খুঁতখুঁত করে। অথচ বক্তৃতা হলে যে মন দিয়ে শুনি, তা মোটেই নয়। আসলে

নেশা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া। একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া। দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কথার তুব্ড়ি ছোটানো। কাজ কিছু হয় না। কিন্তু মন হাল্কা হয়।

কাকদ্বীপে এই আমার প্রথম রাত কাটানো। হাটতলার কাছে একটা ছিটেবেড়ার ঘরে আমরা শোবার জায়গা পেয়েছিলাম। আলো ছিল না। মাটির মেঝেতে ঢালাও মাদুর। ঝোলাটাকে বালিশ করে শুলাম। শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প। বেশির ভাগই চেনা মানুষদের খোঁজখবর নেওয়া। অমুক এখন কী করছে? সে কী! দালাল হয়ে গেছে। ভাবাই যায় না। কী গরম গরম কথা বলত সে। শুনলে ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ জীবনে এমন তো আকছার ঘটছে। খুব ভাব ছিল, এমনও কেউ কেউ ছিট্‌কে গেছে। দূরের স্বপ্নটা হঠাৎ মুছে গিয়ে সুখে থাকার চিন্তাটা নাকের ডগায় চলে আসে। তারা হাতে হাতে কিছু পেলেও হারায়ও অনেক। নইলে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না কেন? দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালায় কেন?

সকালে সম্মেলনে বসে নানা জেলার অবস্থা শুনলাম। চাষীর হাত থেকে অচাষীর হাতে জমি চলে যাচ্ছে। বেনামে জমি রেখে সিলিংকে কলা দেখানো হচ্ছে। নালিশ করেও সুবিচার নেই। এ অবস্থা বেশীদিন চললে লোকে মরীয়া হয়ে উঠবে। সমস্যা যেমন জটিল, লড়াইও তেমনি জটিল। সোজা রাস্তায় হবার নয়। সমিতিতে সবাইকে জড়ো করতে না পারলে এর বিহিত হওয়াও শক্ত।

ফ্রেজারগঞ্জের একজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে দেখা।

যাকে আমরা ফ্রেজারগঞ্জ বলি, তার স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। ফ্রেজার-গঞ্জের গায়েই বঙ্গোপসাগর। জায়গাটা সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার খবর নেওয়া ছিল: দেড়শো বছর আগে বাংলার ছোট লাট সার এণ্ড ফ্রেজার এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলবার। লোকে এসে এখানে যাতে বসবাস করতে পারে তার জন্যে মাটি ফেলা আর জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া রাস্তাঘাট আর বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল। নারায়ণতলা জায়গাটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। দক্ষিণে ধু ধু করছে বালিয়াড়ি তারপর সমুদ্র। উত্তরে আর পশ্চিমে পাত্তিবুনিয়া খাল। পুবে সপ্তমুখী নদী আর পুকুরবেড়িয়া

খাল। দুই বালির পাহাড়ের মাঝখানে মিষ্টিজলের প্রকাণ্ড ঝিল। কিন্তু ফ্রেজারসাহেবের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। বহু টাকা ঢালবার পর বোঝা গেল খরচে পোষাবে না। জঙ্গল পরিষ্কার আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই সময় কিছু বাড়ির ভিত পাওয়া গিয়াছিল, ভিতগুলোর কাছেই ছিল তেঁতুল আর মনসা গাছ। তাছাড়া এ জায়গার দক্ষিণপূবে পাওয়া গিয়েছিল চারটে ইঁটখোলার চিহ্ন আর কিছু ছড়ানো ইঁট। আগে কোনো এক সময়ে এখানে যে লোকালয় ছিল তাতে সন্দেহ থাকেনি।

সুতরাং ও অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই আমার ঘোরবার সাধ। কিন্তু ফ্রেজারগঞ্জের লোকটি বললেন, 'সুন্দরবনে এখন যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। খালবিল সব এখন শুকনো। কোথাও ঘুরতে পারবেন না। সুন্দরবনে ঘোরবার সময় হলো বর্ষা, নৌকোয় করে তখন যেখানে খুশী যত দূরে খুশী যেতে পারবেন।'

শুনে খুব দমে গেলাম। আসবার সময় সবাইকেই বলে এসেছি সুন্দরবনে যাচ্ছি। সুন্দরবনে যাওয়া মানেই তো প্রায় ডোরাকাটা বাঘের সামনে পড়া। ফিরে গিয়ে জায়গাবিশেষে খানিকটা বানিয়ে না বললেও তো মান থাকবে না। কাজেই সুন্দরবনের একটা মোটামুটি চেহারা পাঁচমুখে জেনে নিতে হলো।

যা শুনলাম তাতে সুন্দরবন খুব একটা সুন্দর জায়গা ব'লে বোধ হলো না। আসলে ভাটির দেশ। চারিদিকে শুধু সরুমোটা নদী, খাল, খাঁড়ি, জলা আর চড়া। কোনো চরে শুধুই জলকাদা, ছোট ছোট গাছ আগাছার জঙ্গল। উত্তরের যেসব চরে বাঁধ আছে, সেখানে ভালো ধান হয়। সুন্দরবনের বন বলতে একটানা ছোট গাছের জঙ্গল। বড়ো গাছ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুটের চেয়ে লম্বা গাছ খুব কমই আছে। আগে যদি কোথাও বন হাসিল করা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দেখা যাবে এখন খুব ভালো বড়ো গাছ হয়েছে। জঙ্গল ঘন আর মাটি নোনা বলেই সুন্দরবনে গাছ ছোট। আগেকার হাসিল করা জায়গায় আগাছা কম, বেতবন আর কাঁটাঝোপই বেশী। বর্ষার সময়েই যা গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। নদীর ধারে ধারে একরকমের হলুদ ফুলের গাছ হয়, যার ফুলগুলো ঝরে পড়লে রং হয় লাল। জোয়ারের জলে এই লাল লাল ফুল যখন ভেসে যায়, তখন তার ওপর রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখায়। আর আছে ঢোলা ঢোলা পাতাওয়ালা গোলপাতার গাছ। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে হয় সবুজ কেয়াগাছের ঝাড়। পাতাগুলো জলে নুয়ে পড়ে।

যেখানে কাকদ্বীপের বাসস্ট্যাণ্ড, তার পাশেই খালপুলের নীচে সারি সারি নৌকা বাঁধা রয়েছে কদিন থেকেই দেখছি। নৌকোর ওপর লাল রঙের নিশান দেখেই বোঝা যায় তারা সম্মেলনের লোক নিয়ে এসেছে। ওদের খাওয়া-থাকা সবই নৌকোয়।

সম্মেলন ভাঙবার দিন হঠাৎ একটা প্রস্তাব এসে গেল : 'যাবেন আমাদের সঙ্গে নৌকোয় মেদিনীপুর ?'

আমি তো তক্ষুনি রাজী। ঠিক হলো রাত দশটায় আমি যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে সটান নদীর ঘাটে চলে যাই। জোয়ারের মুখে হল্‌দিয়ার নৌকো ছাড়বে।

আমরা সবাই ঠিক সময়েই পারঘাটার মুখে এসে জড়ো হয়েছিলাম। খানিক পরে 'এসো গো' বলে খালের মুখে হাঁক শোনা গেল। অন্য সকলের দেখাদেখি আমিও ছুটলাম খানিকটা যাওয়ার পরই জুতো খুলতে হলো। বেজায় কাদা। নৌকোর কাছে প্রায় হাঁটুজল। অত কাণ্ডকারখানা ক'রে যাওয়ার পর শুনলাম নৌকো ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। সামনে একজনের হাতে হারিকেন। সামনে সমস্তই ছায়া ছায়া। অনেকক্ষণ কাদাজলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কে একজন বলল, 'এসব জলে বড় কাঙট, ডাঙায় ওঠো হে, হ্যাঁ—।'

নৌকো ছাড়ার ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। ঘাটে চাঁদের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। দলের একজনই আমার চেনা। তাকেও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। একজনদের মনে হলো আমাদেরই দলের। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে এসে উঠলাম তার পাশেই লঞ্চ ষ্টিমারের জেটি। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। আঁশটে গন্ধে বেশ বুঝলাম এটা মাছ-ওঠার ঘাট। আবছা অন্ধকারে মাছের খালি চুপ্‌ড়িগুলো এতক্ষণে ঠাহর করতে পারলাম। যে দলটাকে ছেড়ে এসেছিলাম ফিরে গিয়ে তাদের পাশেই একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসলাম। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বারান্দায় আমি একা। দলের সবাই উঠে চলে গিয়েছে। ভারি রাগ হলো। আমি তো এখানেই ছিলাম, ডাকল না কেন ? উঠে এখন যাবই বা কোথায়। রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দিই। তারপর সকালে উঠে বাড়ির ছেলে বাড়ি।

রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

'হল্‌দিয়া যাবে গো, হল্‌দিয়া।' তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলাম। আমি তো হল্‌দিয়াতেই যাব। জুতোজোড়া হাতে নিয়েই খালমুখে ছুটলাম। কাদার ভেতর দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে নৌকোর কাছে গেলাম। নৌকোর মাথার ওপর থেকে একজনের গলা পেলাম। 'আসুন, আসুন—থপ্‌ ক'রে আসুন। ছিলেন কোথায় এতবেলা? আমি তো ভাবতেছিলাম আর এলেন না।' দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। চোখে ভালো ক'রে ঠাহর হচ্ছিল না। ওঠবার পর বুঝলাম নৌকোটা প্রায় একতলা সমান উঁচু।

নৌকো যখন ছাড়ল, তখনও অন্ধকার। ঘাটের যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। হাওয়ায় রীতিমত শীত-শীত করতে লাগল। ডানদিকের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। এবার আমরা উত্তরমুখো চলেছি। আরো খানিকক্ষণ পর আলো যখন আরো স্পষ্ট হলো, তখন চেয়ে দেখলাম কোনো দিকে কোথাও মাটির কোনো চিহ্ন নেই। জলের এতবড় ঢেউ জন্মে দেখিনি। কোথায় এসে পড়লাম? এ নদী, না সমুদ্র? নদীতে এত উঁচু ঢেউ হয়? এতক্ষণে পুরো নৌকোটা নজরে পড়ল। একে বলে বোটনৌকো। এ নৌকোয় করে লোকে সাগরে যায়। পালে পুরো হাওয়া লাগছে। নৌকো চলেছে সাঁই সাঁই করে। একটা ধার একেবারে কাত হয়ে গেছে। আমরা সেইদিকটায় বসে। ঢেউয়ের ফেনাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে গায়ে এসে লাগছে। জলে গড়িয়ে পড়ার ভয়ে মাঝে মাঝে উঠে বসতে হচ্ছিল। নৌকোর মাঝখানটায় হঠাৎ একটা খোদল চোখে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখলাম সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। একজন লোক ওপর থেকে উঠে সেই সিঁড়ি দিয়ে খোলের মধ্যে নেমে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম খোলের মধ্যে কে একজন বমি করছে। নৌকোর দুলুনিতে যাদের গা পাকিয়ে ওঠে, শুনলাম তারা খোলের মধ্যে বসে যায়।

ঢেউয়ের ছিটে আর ঝিরঝিরে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমার বেশ ভালো লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো? গঙ্গা সেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর

আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মণ্ড-হারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহানাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুড়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহানা। লোকে বলে মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্রে পড়ে।

সাগরদ্বীপের কথা বলতে বলতে ছেলেটা মজনতালি সঈফের গল্প বলল। মজনতালি সঈফ গঙ্গাসাগরের এক পীর। একদিন নাপিতের কাছে খেউরি করতে করতে পীর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। নাপিত তো খুর হাতে নিয়ে বসেই আছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে পীর এসে হাজির হলো। গা দিয়ে তার দর দর করে ঘাম ঝরছে। নাপিত জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে কোথায়? পীর বলল, চড়ায় আটকে গিয়েছিল জাহাজ; খালাসীরা তাই ডেকেছিল। কী আর করি, টানতে টানতে জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। নাপিত কিন্তু পীরের কথা বিশ্বাস করেনি। ফলে, তার কী শাস্তি হলো জানেন? সেইদিনই সে আর তার বাড়ির সবাই শিঙে ফুঁকল। বলে ছেলেটা হো হো করে হাসতে লাগল।

কিন্তু তার পরের প্রশ্নটা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম।

'পাতালে এক ঋতু' পড়েছেন আপনি?' পড়িনি শুনে খুব অবাক হলো। বলল, দীপকবাবু আমাদের ওদিকে এসেছিলেন একবার একটা মিটিঙে। আমার সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছিল।

খানিকক্ষণ কথা বলেই বুঝলাম হালের কোনো উপন্যাসই তার না পড়া নয়।

মাঝে মাঝে একেকটা চর যায় আর ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, বুঝলেন এটা ঘোড়ামারার চর, এটা লোহাচর। কোনো কোনো চরে নাকি পোস্টাপিস আছে, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, তাও ওর মুখ থেকেই শুনলাম।

যেতে যেতে আকাশে রোদ বেশ ভালোভাবেই উঠে গেল। কিন্তু জলো হাওয়া থাকায় একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। সামনে একঘেয়ে জল নেই আর। দু-পা গেলেই একটা ক'রে চর। জেমস্ অ্যাণ্ড মেরী চড়ার নাম শোনেন নি।

বহুকাল আগে সেই চড়ায় আটকে একটা জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজটার নাম ছিল রয়াল জেমস্ অ্যাণ্ড মেরী।

ডেকে দেখাল বাঁদিকে হল্‌দি এসে হুগলীতে পড়েছে। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতে দেখতে হল্‌দিয়া এসে গেল। নতুন বন্দর হচ্ছে হল্‌দিয়ায়। চারদিকে তার তোড়জোড়ের চিহ্ন। নদীর বেশ খানিকটা ভেতরে জেটি। জলের ওপর বড় বড় বয়া ভাসছে।

ডাঙায় নেমে অনেকের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হলো।

বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। আমরা যাব রাণীচক। সন্দিয়ার চক হয়ে দক্ষিণ রাণীচকে যখন পৌছলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। এ গাঁয়ে থাকে পতিতদার এক মামাতো ভাই। ভুবন জানা। চায়ের জন্য তখন মরে যাচ্ছি। ভুবন জানার মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দুধচিঁড়ে খাইয়ে ছাড়লেন।

গাঁয়ে যার সঙ্গেই কথা বলি এক কথা। হল্‌দিয়ার বন্দর হবে। আটষট্টিটা মৌজার ওপর নোটিশ হয়েছে উঠে যেতে হবে। আস্তে আস্তে রাস্তায় যতটা চোখ পড়ল, মনে হলো এদিকটায় বসতি খুব ঘন। দক্ষিণ রাণীচকে দুশো ঘর লোকের বাস। পাঁচমিশেলী গ্রাম। পাঁচভাগের একভাগ মুসলমান। পঞ্চাশ ঘর ধোপা। একঘরই শুধু কাপড় কাচে। বাকি সবাই ঘরগেরস্তি করে। জাতব্যবসার পুরনো পরিচয়টাও এখন আর তারা দিতে চায় না। নিজেদের তন্তুবায় বলে। বলে, শুকনি তাঁতী।

ব্রাহ্মণ আছে তিন ঘর। চাষবাস করেই খায়। তবে একটু নল্‌চে আড়াল করার ব্যাপার আছে। তাই জমিতে লাঙল দেওয়ার কাজটা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেয়। বাকি সবই—ধান রোয়া, ধান কাটা—নিজেরাই করে। তাছাড়া গ্রামে পুজো-পার্বণ বিয়েশ্রাদ্ধে টাকাটা সিকিটা মেলে।

দু-ঘর নাপিত আছে, তাদেরও উপজীবিকা চাষবাস।

গ্রামের আর যারা, তারা সবাই মাহিষ্য। কৈবর্ত কথাটা অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এদিকের গোটা তল্লাটই মাহিষ্যপ্রধান। চাষবাসই তাদের জাতের জীবিকা।

জীবিকা চাষ হলে হবে কি, গ্রামের প্রায় অর্ধেকই জমিহীন ক্ষেতমজুর। নিজেদের বাস্তটুকুই তাদের সম্বল। আর যারা, তাদের বেশির ভাগই ভাগচাষী।

ঘর পিছু একশো পঁচিশ থেকে একশো ত্রিশ একর জমি আছে, এমন

জোতদার আছে গ্রামে তিন ঘর। আর আছে দু-ঘর রায়তচাষী। তাদের দু-এক একর করে নিজস্ব জমি আছে। অভাব-অভিযোগ থাকলেও তারা ভাগে চাষ করে না। দায়েআদায়ে ধারদেনা হায়হাবালত করে চালায়। ভাগচাষীদের মধ্যে বারোআনা অংশের কিছুটা রায়তজমি, কিছুটা ভাগচাষ। অন্যদের ছিটেফোঁটাও জমি নেই। মুসলমানপাড়ার দশ আনা লোক দিনমজুরি ক্ষেতমজুরি করে পেট চালায়। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো। নামগুলো এখনও মনে আছে : শেখ তালেব, শেখ দেবু, শেখ কানাই, শেখ এক্তার, শেখ রাখাল।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম রাণীচক থেকে। রাতটুকু রত্নার চকে থেকে সকালবেলায় রওনা দেব। রত্নার চকে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এল গুণধর। মাঝখানে অনেকগুলো গ্রাম। সাউতান চক, হাতিবেড়ে, চক তাড়ুয়ান, বিশ্বনাথ দত্তের চক। তারপর রত্নার চক। কমখানি রাস্তা নয়। গোটা তল্লাটের ওপরই উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে।

মন্বন্তরের বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কিছুটা কিছুটা ঘুরেছিলাম। সে আমলে হিন্দু চাষীর বাড়িতে মুরগি পুষতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এবার দেখলাম ঘরে ঘরে মুরগির চাষ। কেউ কেউ আছে ডিম খায়, মাংস খায় না। কারো কারো দুটোই চলে। রাস্তায় কোনো চায়ের দোকান দেখলাম না। মুদির দোকান ময়রার দোকানও চোখে পড়ল না।

অনেকগুলো বাড়ির দেখলাম জীর্ণদশা। গুণধর বলল লোকে এখন আর বাড়িঘর সারাচ্ছে না। উঠেই যখন যেতে হবে তখন আর ডোবা পুকুর সংস্কার করিয়ে, ঘরবাড়ি সারিয়ে কী লাভ? ফলে, ঘরামীরা ঠায় বসে। কেউ আর উলু কাটছে না। খড়েরও দাম পড়ে গেছে। সুতাহাটা থানার আটষট্টিটা মৌজা জুড়ে এখন একটা থমথমে ভাব। জমির ভালোমন্দ হিসেবে জমির দাম এখানে চার পাঁচশো টাকা থেকে হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘে। সে দর আর থাকছে না। হু হু করে পড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এই মওকায় জলের দরে জমি কেনবার মতলব ভাঁজছে। সরকার যে দরে জমি নেবে সে দরটা অবশ্য সুবিধের নয়। তিন বছরে শোধ করার শর্তে বিঘে পিছু তিনশো টাকা। যাদের জমি আছে, তারা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। উঠে তো যেতে হবেই। কিন্তু যাবে কোথায়? ও দামে এমন জমিই বা পাবে কোথায়? তারওপর মানুষের ভিটে বলে কথা।

বাপদাদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই ভিটেমাটিতে। কেউ কেউ গ্রামের মায়া কাটিয়ে আগেভাগে কোথাও ভালো জমিজায়গা দেখে উঠে যাচ্ছে। এর পরে সে-সব জায়গার জমির দর আরও বেড়ে যাবে। যারা থেকে যাচ্ছে তারা উপায় নেই বলেই থাকছে। নতুন জায়গায় গিয়েই কি শান্তি আছে? জমি হলেই তো হয় না। এ জমির সঙ্গে কতদিনের চেনাজানা। এইটুকু বয়েস থেকে। নতুন জমির ভাবগতিক বুঝতে, তার সঙ্গে ভাব করতেই তো ঢের দিন যাবে। পাড়াপড়শী সবই হবে নতুন। এ তো উঠে যাওয়া নয়, একেবারে যাকে বলে জলে-পড়া।

এ অঞ্চলের ছেলের বাপদের হয়েছে আরেক মুস্কিল। বিয়ের বাজারে ছেলের দর সাংঘাতিক পড়ে গেছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে যারা মেয়ের বিয়ের দেনা শুধবে ভেবেছিল, তাদের এখন মহা অশান্তি। তার ওপর উঠন্ত সংসারে মেয়ে দিতেও মেয়ের বাপেরা এখন কিন্তু-কিন্তু করছে।

কথা বলতে বলতে যখন রত্বার চকে এসে পৌছলাম, বাড়িতে বাড়িতে তখন সন্ধ্যে জ্বলে গেছে। সটান উঠলাম শ্রীহরি দিন্দার বাড়ি। উঠোনে আমকাঁঠালের গাছ। মাচার ওপর লতানো লাউগাছ। তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে।

রত্বার চক গ্রাম খুব বড়ো নয়। মোট বিয়াল্লিশ ঘর লোক। ছু-পাঁচ ঘর ক্ষেতমজুর; থাকার মধ্যে শুধু বাস্তু। এক ঘর রায়তচাষী, তাদের বিঘে চল্লিশ জমি। বাকি সবাই ভাগচাষী। পীতাম্বর চকের বেরা আর পাড়ুইদের জমি তারা ভাগে করে। ছ-সাত ঘর বাগ্দী, এক ঘর বামুন, ছু ঘর করণ; বাকি সবাই মাহিষ্য।

এদিককার গাঁয়ের অবস্থা আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে ভালো। আগে যাদের বছরে ন-মাস উপোষ করতে হতো, এখন তারা বছরে ন-মাস ছু মুঠো খেতে পায়। আগে বেশির ভাগ বাড়িতেই চৈত্র বৈশাখেই খোরাকি ফুরিয়ে যেত। তখন তারা দাদন আনতে যেত বেরাদের বাড়িতে। বেরারাও সেই মওকায় তাদের বেগার খাটিয়ে নিত—ঘাস নিড়ানো, জ্বালানির কাঠ চেলা করার কাজ করিয়ে নিত। দাদন একবারে দিত না। ঘোরাত।

বছর পনেরো যোল আগে এখানে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্মগোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।

ধর্মগোলা থেকে ধান নেবার সাধারণ নিয়ম হলো, এক মণ ধান নিলে একমণ দশ সের ফিরিয়ে দিতে দিতে হবে। তবে ফসল ভালো না হলে স্থদ মাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলটা শুধতেই হবে। তাছাড়া ধর্মগোলার হাতে আছে নগদ এক হাজার টাকা। এই টাকা মাসে টাকায় এক পয়সা স্থদে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয়। টাকাটা ওঠে এইভাবে: ন টাকা আর ছেলের বিয়ে হলে, মেয়ের বিয়ে হলে এক টাকা গ্রামকে মান্য দিতে হয়—তাকে বলে 'বাপ' দেওয়া। বাইরের বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষকেই এ টাকা দিতে হয়। তাছাড়া গ্রামে যে বিচার-আচার হয়, তাতে যে জরিমানার টাকা ওঠে, তাও এই ধর্মগোলার তহবিলেই জমা পড়ে। এ ধরনের ধর্মগোলা শুধু এই গাঁয়েই আছে।

শ্রীহরির বয়স বেশি নয়। বছর পঁয়ত্রিশ হবে। চোখেমুখে বেশ একটা তাজা ভাব। বাপ মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই এখন শুধু বেঁচে। শ্রীহরি মেজো। দাদার তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে বিধবা বৌদি আছেন তাঁর এক মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। ছোট ভাইটা বছর চারেক আগে কলেরায় মারা যায়। ছোট ভাইবৌ আছে বাপের বাড়ির সংসারে। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বউ—এই নিয়ে এখন শ্রীহরির সংসার। নিজের আছে তিন বিঘে আর ভাগে বিঘে চারেক জমি। তাইতে কোনোরকমে বছরের খোরাক হয়ে যায়। দুটো আছে হালগরু, দুটো গাইগরু আর দুটো বাছুর।

বাড়িতে লোক এসেছে শুনে পাশের বাড়ি থেকে এলেন শ্রীহরির জ্যেঠিমা প্রভাবতী দিদ্দা। বিধবা মানুষ। বয়স কম। মেয়েদের নিয়ে সমিতি করেছেন। ঐ সব নিয়েই থাকেন। লেখাপড়া জানেন না বলে খুব দুঃখ। পড়বেন বলে একবার বইও কিনেছিলেন। পড়ানো দূরে থাক, সবাই এমন ঠাট্টা শুরু করে দিল যে বইখাতা কুলুঙ্গিতেই তোলা থাকল। রাত্তিরে দল বেঁধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প হলো। গ্রামের লেখাপড়া নিয়ে।

রাণীচক গাঁয়ে এবার এই প্রথম কৃষকের ঘরের চারজন ছেলে বি, এ পাশ করেছে। গোটা থানায় আগে হাইস্কুল ছিল দুটি। একটা এখান থেকে বারো মাইল দূরে, আরেকটা আট মাইল দূরে। পঞ্চাশ একান্ন সাল পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা। এখন সেখানে পাঁচটা হাইস্কুল। সবচেয়ে কাছেরটা দু মাইল দূরে—ভবানীপুর গ্রামে। থানায় জুনিয়র হাইস্কুল তিনটি। দু এক বছর হলো হয়েছে। কাছেরটা মাইলখানেকের মধ্যে। সব চেয়ে দূরেরটা

এখান থেকে দশ মাইল। এই ইউনিয়নে ইউ, পি স্কুল চারটি। এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ ইস্কুলে পড়ে। এ পর্যন্ত এ গাঁয়ের মোটে একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সে এখন মহিষাদল কলেজে পড়ছে। বড় ভাই লেখাপড়া করেনি, চাষের কাজ করে। নিজেদের বিঘে তিনেক জমি, ভাগে নিয়েছে বিঘে পাঁচেক।

এ অঞ্চলে মেয়েদের ইস্কুল হয়েছিল পীতাম্বর চকে যুদ্ধের গোড়ার দিকে। ইউ. পি. ইস্কুল। একশো দেড়শো মেয়ে পড়ত। তিনজন মাষ্টারণী, একজন মাষ্টার। গিরীশ জোতদার ছিলেন সেক্রেটারি। তিনি ইংরিজি জানতেন না। ইস্কুলের পাকা বাড়ি হয়েছিল। কিন্তু সেক্রেটারি হওয়া নিয়ে এমন গোলমাল লাগল যে শেষ পর্যন্ত ইস্কুলই উঠে গেল। ইস্কুলের অমন সুন্দর পাকা বাড়িটা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। এখন মেয়েদের ইস্কুল থানায় তিনটি। তার মধ্যে দুটি হাই স্কুল আর একটি মাইনর। হাই স্কুল এখান থেকে আট মাইল আর মাইনর স্কুল তিন মাইল দূরে। সোলাট গ্রামের মাইনর স্কুলে এ গাঁয়ের মোটে একটি মেয়ে পড়ে। মেয়েটি বোর্ডিঙে থাকে। থাকা আর পড়ার কোনো খরচ নেই। খাওয়া বাবদ লাগে মাসে আধমণ চাল আর পাঁচটা করে টাকা।

সকালে উঠে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা আত্মীস্য় গ্রাম আর কদিন পর বাঙলা দেশ থেকে মুছে যাবে। ধর্মগোলাটা ভেঙে যাবে। মানুষগুলো এখানে সেখানে ছিটকে যাবে। শ্রীহরির সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, সে তেমন ঘাবড়ায়নি। সে বলল, দেখুন এই উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বুড়োদের সঙ্গে আমাদের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। বুড়োরা চাইছে অন্য কোথাও জমি জায়গা আর পারলে মোটা রকম খেসারত। আমরা চাইছি বন্দরে চাকরিবাকরি নিয়ে কিংবা স্বাধীন কোনো ব্যবসা ফেঁদে এখানেই থাকতে। আর কিছু না হোক, লরি চালানোটাও তো জোয়ান ছেলেরা শিখে নিতে পারবে।

তখন আমার বেরিয়ে পড়বার সময় হয়ে গেছে। জ্যেঠিমাকে ডেকে বিদায় নিলাম। জ্যেঠিমা বললেন, 'এখন তো আমরা পাখির মত কাঠি গুণছি। আবার এস।' শ্রীহরির কথাটা কিন্তু আমাকে সারা রাস্তা ভাবাল। রাস্তায় পড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজে ঘাড় তুললাম। দেখি গাছের ডালে একটা মাছরাঙা। তারপরই কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল।

নতুন রাস্তা হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে এসব জায়গা গমগম করবে। শীতের ক'টা মাস এখনই তো বাস চলে। রাস্তা হচ্ছে বলে বাস এখন বন্ধ। অনেকখানি রাস্তা এখন আমাকে হেঁটে যেতে হবে। ডায়মণ্ডহারবারের এপারে কোঁকড়াহাটি। তার আগে চৈতন্যপুর। সেখানে তমলুকের বাস মিলবে।

পড়িয়ার চক থেকে ফরেস্ট শুরু। ঝাউবনে ঝিরঝির করছে বাতাস। এ বনে ভাল কাঠ হয়। গাছ থাকায় নদীও পাড় ভাঙতে পারে না। তমলুক মহকুমায় বনবিভাগের ছ-টা আপিস। তার একটা বালুঘাটার বাজারে। একটু চা খেয়ে নিলাম। রাস্তার ধুলো তখনই তেতে উঠেছে। চর বাজিতপুরে এসে আর হাঁটা সম্ভব হল না। পকেটের অবস্থা সুবিধের নয়। খানিকটা বেপরোয়া হয়েই শেষ পথটুক্ সাইকেল রিক্সা নিতে হল। তারপর চৈতন্যপুর থেকে বাস।

ঠিকানাটা আগেই নেওয়া ছিল। মেছেদায় এসে নৌকোয় আলাপ হওয়া ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে বেশি বেগ পেতে হল না। পানের বরজ থেকে তাকে ডেকে আনা হল। চা জলখাবার না খাইয়ে ছাড়ল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এলাম। সাহিত্য নিয়ে নানান কথা হলো। বললো এখনও লেখবার কথা কিছু ভাবেনি। তবে কোনোদিন হয়ত লিখতেও পারে।

স্টেশনের কাছেই পানের বাজার। মেছেদা থেকে রেলে গড়ে পাঁচশো কুড়ি পান দৈনিক চালান যায়। বেশির ভাগ যায় বাংলার বাইরে। বাকিটা কলকাতায়। মুখে মুখে হিসেব করে দেখলাম রোজ প্রায় লাখ চল্লিশেক পান এখান থেকে যায়। এ অঞ্চলে পান চাষের বয়স বেশি নয়। পান চাষ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চার নম্বর ইউনিয়নের চাটরা আর বল্লুক গ্রামে। সে আজ প্রায় একশো বছর আগে। শুধু পান চাষ করে এমন লোক কমই আছে। ধানপান দুটোরই চাষ করে বেশির ভাগ লোক। তবে পানই হলো প্রধান অর্থকরী ফসল। ঘন বসতি, জমি কম এবং পান বেচে টাকা বেশি পাওয়া যায়—তার জন্যেই পানচাষের দিকে এদিককার লোকের এত নজর।

বাঙলাদেশে মিঠে পান একমাত্র এখানেই হয়। মিঠে পান অবার বেলে মাটি ছাড়া হয় না। চাষে ডবলেরও বেশি খরচ। সারও দিতে হয় প্রচুর।

অগ্রাণ থেকে জষ্টি পর্যন্ত বিক্রি হয় গোড়া পান। বছরে প্রধান বিক্রি এই পান। তাছাড়াও বারো মাসই কিছু না কিছু পান কাটা আর বিক্রি হয়। পান বিক্রি হয় গোছ, শ আর হাজার হিসেবে। পঞ্চাশটা পান নিয়ে হয় এক গোছ। এখানকার চাষীরা পাইকারদের কাছে সেরা মিঠে পান বেচে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সে পান যায় বিকানীর, জয়পুর, যোধপুর, নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা, মুসৌরি। নিরেস পান বিক্রি হয় পনেরো টাকা হাজার। দর পড়ে গেলে কখনও কখনও সেরা পানও ঐ দরে বেচতে হয়। পানের টুকরি পিছু পাইকাররা পায় দু টাকা করে। গাছের মূল থেকে যেটা বেরোয়, সেটা খাড় পান—ভাল পান। আর ভাল পানের গোড়া থেকে ফ্যাকড়া বেরিয়ে সরু বোঁটায় এক সঙ্গে তিনটে থেকে ছটা যে পান ধরে, তাকে বলে পালা পান। পালা পান হলো নিরেস পান।

মিঠে পান ছাড়াও এ অঞ্চলে বাঙলা পান আর সাঁচি পান হয়। মিঠে পানের গাছ দশ থেকে পনেরো বছর থাকে। বাঙলা আর সাঁচি পানের গাছ খুব বেশি হলে তিন থেকে চার বছর থাকে। পঁচিশ সারি গাছের ভালো বরজ করতে জায়গা লাগে পাঁচ কাঠা। তা থেকে রোজগার হয় দেড়-দু হাজার টাকা। খরচ পড়বে হাজার টাকার মতো। এ হলো যখন বাজার দর ভালো থাকে তখনকার হিসেব।

চাষীরা বলে, বরজ মানে রোজ যেতে হবে। বেশি গরম, বেশি ঠাণ্ডা—এর কোনোটাই পানগাছের সয় না। তাছাড়া বরজে পোকা লাগে, পানের রোগ হয়—পান চাষে ঝকমারিও অনেক। একটা রোগ আছে। তার নাম চিংলা। পানের গায়ে বসন্তের দাগের মতো হয়। সে পান এখানে চার আনা শ। চিংলা থেকে হয় আভারি। পানের লতা পচে যায়। গাছের এক জায়গায় পচ ধরে, পরে গোটা গাছটাই মরে যায়। বল্‌মা রোগে পানের রং পোড়া হয়ে যায়, ঝল্‌সে যায়। আবহাওয়া বদলে গেলেই এ রোগ সেরে যায়। অতিরিক্ত রোগে পানের হয় তসর‍্যা—পান হয়ে যায় তসরের মতো। পাতাগুলো হয় পাঁশুটে লাল। এ রোগে গাছও যায়, পানও যায়। ফোস্কা ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলো ফেলে দিতে হয়। সব চেয়ে মুস্কিল হলো পানের রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে চাষীদের যেটুকু আছে তা হাতুড়ে বিদ্যে। সরকারি কৃষি-বিভাগের আছে অনেক ভালো ভালো গবেষণার জ্ঞান। কিন্তু দুটোর মধ্যে লেনদেন কম।

ঠিক হল ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা আমাকে কোলাঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরবেলার ট্রেনে আমি কলকাতায় পাড়ি দেব।

রূপনারায়ণে ব্রিজ হচ্ছে। দীঘায় যাবার রাস্তাও তৈরি। তাছাড়া সোজা বোম্বাই পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে। শুধু ব্রিজটার অপেক্ষা। সেই দিনটার জন্যে কোলাঘাটও অপেক্ষা করে আছে। এখন তো কোলাঘাট বলতে দেনান গ্রাম থেকে পাইকপাড়ি পর্যন্ত মাইল দুই লম্বা নদীর ধারের জায়গা।

আগে নাম শুনে ভাবতাম কোলাঘাট না জানি কী বড় জায়গা। সিনেমা মোটে একটা। শহরের লোক বলতে ব্যবসাদার আর ডেলিপ্যাসেঞ্জার। গাড়ি নেই। শুধু বড় বড় বাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদে বাহার নেই। শৌখীন স্থায়ী নাট্য সম্প্রদায় নেই। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে যাত্রা, কবিগান, পুতুল-নাচের দল আসে। কলেজেপড়া ছেলেরা চায়ের দোকানে বসে তর্ক করে গলা কাটায় না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে, পড়ুয়া ষাট-সত্তর। রাজনৈতিক সভা হলে তেমন লোক হয় না। বড়লোক আছে যথেষ্ট। তাদের লাখ লাখ টাকার কারবার। ইউনিয়ন বোর্ডের কলকাঠি নাড়া পর্যন্ত তাদের পাবলিক অ্যাকটিভিটির দৌড়।

একেবারে নেহাতই কাঠ, পাট, কয়লা, ধানচাল আমদানি রপ্তানির জায়গা। তবে ব্রিজটা একবার হয়ে গেলে কী হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। এখানে কাঠের আট দশজন বড় বড় আড়তদার। কাঠ আসে কটক, নাগপুর, শিলিগুড়ি থেকে; যায় হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর। কড়িবরগার জন্যে শাল, চাকুন্দা, লোহাশাল, কটকী শাল, পিয়া শাল; খুঁটির জন্যে বাতিকাঠ। আসবাবের জন্যে সেগুন, সিসু। ময়না, দাসপুর, আরও নানা জায়গা থেকে আসে পাট। পাটের আড়তদারি মাড়োয়ারিদের একচেটে। কয়লার আড়তদাররা স্থানীয় বাঙালী। ধানচালে বাঙালীও আছে, মাড়োয়ারিও আছে। মাছের কারবার মরশুম নির্ভর। আড়ত একটাই।

ছেলেটি কার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল বোধহয় জানত না। এক ভাগে রুগী দেখার ঘরে রাত্তিরে আমার থাকার জায়গা হল। সারাদিন স্নান হয়নি। সিনেমা হাউসে গিয়ে অন্ধকারে টিউবওয়েলের জলে আরাম করে স্নান সেরে নিলাম। পকেটে পয়সা নেই। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। চা দিয়ে ক্ষিধেটাকে মেরে নেওয়া গেল।

এতক্ষণ চেয়ারেই বসে ছিলাম। এবার শোবার জায়গাটার দিকে তাকালাম। রবারক্লথ পাতা রুগী দেখার বিছানা। তার ওপর নিচেয় রক্ত-মোছা তুলো। শোবার চিন্তা মাথায় উঠে গেল। ঠিক করলাম চেয়ারে বসেই যতটুকু পারব ঘুমিয়ে নেব। রাত এগারোটা নাগাদ সেই ভদ্রলোক এসে হাজির; দেখতে এসেছেন আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বিনয়ে আমার সঙ্গে তিনি পারবেন কেন?

ঠিক যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। এটা ওটা কথার পর হঠাৎ পকেট থেকে তিনি কাগজের একটা তাড়া বার করলেন। আমাকে তিনি তাঁর কবিতাগুলো শোনাবেন। আমি একবার মেঝের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

ভদ্রলোক কবিতা শোনালেন বটে, কিন্তু সে রাতে তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। যখন তাঁর খুব হাই উঠতে লাগল, তখন আমরা গেলাম তাঁর চেনা এক গেঁজেলদের আড্ডায়। সেখানে রাত তিনটেয় চা পাওয়া গেল। তারপর আমরা দুজনেই বললাম খুব ভাল লাগল।

বলে ভোরে একেবারে ফার্স্ট ট্রেনেই সটান কলকাতা।

শিল্প সাহিত্য ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী

সত্যেশ রায়

[বিমূর্ত শিল্পীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে গত সংখ্যা পরিচয়-এ শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে সে সম্পর্কে এক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আলোচনাটি পাঠ করে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঠিক কী বলেছিলেন পরিচয়-এর অনেক পাঠক তা জানতে চেয়েছেন। তাঁদের চাহিদা মেটাবার জন্যই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার নির্বাচিত অংশের সারানুবাদ প্রকাশিত হল। এ বিষয়ে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে আলোচনা আহ্বান করছি। মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের দেওয়া হবে। তবে রচনাগুলি যেন ছোটো হয়, যুক্তিপূর্ণ হয়, উষ্মা বা ব্যক্তিগত কটাক্ষ বর্জিত হয়। একই যুক্তির পুনরুক্তিও বর্জনীয়।

সম্পাদক, পরিচয়]

বিগত শীতকালটিতে সোভিয়েত দেশে সাহিত্য ও শিল্পের সমস্যাবলী নিয়ে সতেজ ও জোরালো বিতর্ক হয়ে গেছে। শিল্প সাহিত্যের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা যে ওদেশে অত খোলাখুলি আর সামনাসামনি কেন এসেছে তা বোধহয়, বোঝা খুব দুষ্কর নয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এখন তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে ব্যাপক কমিউনিজম গড়ার জন্য দ্বাবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে রূপায়িত করার কাজে।

এরকম অতিগুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ভাবাদর্শমূলক কাজ, সাহিত্য এবং শিল্প প্রভৃতি, বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে আর জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষায় এক বড়ো ভূমিকা পালন করে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা যে—কাদের স্বার্থে সাহিত্য ও শিল্প নিয়োজিত হবে, কোন আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রনেতারা সেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের গত বছরের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ৭ই ও ৮ই মার্চ পর্যন্ত তিনবার সম্মেলন হয়। এবং ওই দুটি তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে, প্রায়

তিন মাস জুড়ে সারা সোভিয়েত দেশে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সংস্থাগুলিতে, বেতার, সাময়িকী ও সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে, বলা যায় দেশব্যাপী এক আলোচনা চলে। শুধু সাহিত্যিক, সমালোচক ও শিল্পীরাই নন সাধারণ সোভিয়েত নাগরিক—পাঠক, শ্রোতা দর্শকসমাজ—এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে শিল্প-সাহিত্যের সমস্যাবলী সে দেশে শুধু লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, সোভিয়েত সমাজের ব্যাপকতম অংশও কিভাবে সৃজনশীল শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে কতখানি আগ্রহী এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে কি তারা পেতে চান।

কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের সংগ্রামী অগ্রবাহিনী, সেজন্য পার্টি এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। প্রথম, ১৭ই ডিসেম্বরের তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বৈঠকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি এল. এফ. ইলিচভ পার্টির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তারপর ক্রুশ্চভ বলেন শেষের মার্চের বৈঠকে। ক্রুশ্চভ তাঁর বক্তব্যে সাহিত্য ও শিল্পের প্রধানতম তত্ত্বগত সমস্যাবলী আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন এবং ব্যাপক কমিউনিজম গড়ার যুগের কর্তব্যগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন সোভিয়েত শিল্পের মূলনীতি, যা হলো জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ ও পার্টিজান-চেতনার প্রশ্ন। ক্রুশ্চভ তত্ত্বগত দিক থেকে উপস্থাপিত করেন সেই সব প্রশ্ন ও সমস্যা যথা: শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সাহিত্য-শিল্পের ভাবাদর্শগত বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়। বৈদেশিক নীতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, কেননা পারমানবিক যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিপদ থেকে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা, এই ভয়াবহ বিপদের অবসান ঘটানোর, তাই একমাত্র পথ। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নির্দিষ্টভাবেই প্রত্যাখান করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনও আপোষ নেই। প্রণিধানযোগ্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ক্রুশ্চভের এই উক্তিটি: "মানবতার প্রশ্নে আমরা অবশ্যই নিয়ে আসব স্বচ্ছতা, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ ও কাদের জন্য। আমরা এই বিষয়টিকে,—যেমন অন্য সব বিষয়ও—দেখি শ্রেণীগত দিক থেকে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার দিক থেকে। বিশ্বে যতক্ষণ শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব আছে, 'এ্যাবসলিউট' মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। বুর্জোয়াদের জন্য, সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য যা ভালো, শ্রমিক

শ্রেণীর পক্ষে তা খারাপ, এবং অনুরূপ অপরপক্ষে, তারই উল্টোটা। শ্রমজীবী জনগণের জন্য যা ভালো তা সাম্রাজ্যবাদীদের, বুর্জোয়াদের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। আমরা চাই আমাদের নীতিগুলি সকলে উপলব্ধি করুক ভালোভাবে, বিশেষত তাঁরা, যাঁরা আমাদের উপর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দিতে চান। রাজনীতিতে ঠাট্টার স্থান নেই। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যিনি প্রচার করছেন, বিষয়গতভাবে (অবজেকটিভলি) তিনি অবস্থান নিচ্ছেন কমিউনিজম বিরোধিতার। কমিউনিজমের শত্রুরা আমাদের ভাবাদর্শ-গতভাবে নিরস্ত্র দেখতে চায়। এবং এই বিশ্বাসঘাতী উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য তারা প্রচার করতে চায় ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধুয়া, এই 'ট্রোজান ঘোড়ার' সাহায্যে তারা আমাদের মধ্যে নাক গলাতে পারলে সুখী হয়। আমরা স্থিরনিশ্চিত যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের শত্রুদের এই ছলাকলা আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক ও জনগণের বুদ্ধিজীবীদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক অখণ্ড (মনোলিথিক) ঐক্যের সম্মুখে চূর্ণ হবে।"

কমিউনিজমের গঠনকার্য ও সৃজনশীল শিল্প

নিকিতা ক্রুশ্চভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং সরকারেরও প্রধান। পার্টির ভাবাদর্শগত কমিশন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন তাতে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সমস্যা বিষয়ে ব্যাপকভাবে মতের আদানপ্রদান হয়। এই সমস্ত আলোচনার শেষে ক্রুশ্চভ সুদীর্ঘ ভাষণ দেন সমগ্র পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। প্রধান চারটি পর্বে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন। এই পর্ব-গুলি হলো: কমিউনিজমের গঠনকার্য এবং সৃজনশীল শিল্পের কর্তব্য; সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের মূলনীতি—জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তা ও পার্টিজ্ঞান-বোধ (Partisanslip); ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরুদ্ধে; এবং লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব—সমস্ত সাফল্যের মূল। উল্লিখিত বিষয়সূচী-গুলিই বলা যায় ক্রুশ্চভের ভাষণের সারবস্তুকে নির্দেশ করছে। ক্রুশ্চভের এই বক্তব্যের সংক্ষেপিত বিষয়বস্তুগুলিকে তাই এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমাদের দেশের লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার, ভাস্কর,

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের শিল্পী—আমাদের সমগ্র বুদ্ধিজীবীদের কাজ সব সময়েই পার্টি ও জনগণের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। এবং এই অবস্থাটা পুরোপুরি বোঝা যায়। আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সাহিত্য ও শিল্প—লেনিন যেমন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—হয়ে উঠেছে আমাদের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করছে। কমিউনিজম গঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো—এবং এটার উপর জোর দিয়ে চাই যে—শ্রমশীল জনগণের উন্নততর জীবনের জন্য সমস্ত শর্তগুলি সৃষ্টি করা। এবং কমিউনিস্ট সমাজ হবে, এককথায় বলতে গেলে, শ্রমশীল জনগণের সমাজ।

শ্রম বস্তুটা স্বাভাবিক এবং মানুষের দৈহিক গঠনজাত প্রয়োজনেরই অঙ্গাঙ্গী। একমাত্র পুঁজিতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষকে অসহনীয় অবস্থায় ফেলে তাদের পঙ্গু করে দেয় এবং শ্রমের প্রতি এক বিকৃত ধারণার ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ব্যবস্থাকে যারা মেনে নিতে পারে না তারা শ্রমগত পদ্ধতির মধ্য দিয়েই শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে এবং হয়ে ওঠে শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সক্রিয় যোদ্ধা। আর আছে যারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে জনজীবনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামে অংশগ্রহন করে না। আরও আছে, যারা অন্যের, তার সমাজেরই প্রতিবেশীর শ্রমের ফলভোগ করে জীবনযাপন করে—এরা হলো শোষক এবং শ্রমজীবী জনগণের নিপীড়ক।

কমিউনিজম শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং একমাত্র কোটি কোটি জনগণের শ্রমের দ্বারা। এইজন্যই আমাদের পার্টি সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস করছে সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে—শ্রমিক, যৌথখামারের চাষী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ, শিক্ষক, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রের কর্মীদের—কমিউনিজমের গঠনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণে এক অখণ্ড 'কালেকটিভ' ঐক্যবদ্ধ করতে। কমিউনিজমের আদর্শে এবং চেতনায় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, এই যুগে যখন আমরা কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম করছি, তখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টির আদর্শগত কার্যাবলীরও সর্বপ্রধান কর্তব্যও এখন তাই। পার্টির সমস্ত আদর্শগত হাতিয়ারগুলিকে আমাদের অবশ্যই যথাযথ সংগ্রামী অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে। কমিউনিস্ট

শিক্ষার জন্য শক্তিশালী মাধ্যম শিল্প ও সাহিত্যও তেমনই একটি হাতিয়ার।

পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্প সাফল্যের সঙ্গেই উন্নতিশীল এবং মোটের উপর সন্তোষজনকভাবেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলির সম্পাদন করছে। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলিকে বেশি বাড়িয়ে দেখাও আবার ক্ষতিকর হবে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার, চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের যেখানে গুরুতর ঘাটতির দিক আছে তাও না দেখা ঠিক হবে না। খুব বড়ো রকমের আদর্শগত কিংবা শিল্পগত ব্যর্থতা নেই এ কথা সত্য, কিন্তু আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে যে গুরুতর ত্রুটি, ভ্রান্তি ঘটেছে, সে সম্পর্কেও নির্বিকার থাকতে আমরা পারি না।

কি ধরণের শিল্পকর্ম সোভিয়েত জনগণ প্রত্যাশা করে? কোন ধরণের কাজকে তারা মূল্যবান মনে করে এবং গ্রহণ করে এবং কি তারা প্রত্যাখ্যান করে?

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্প ও সাহিত্য শিল্পগত উচ্চমান অর্জন করেছে, তার রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সম্পদ ও বিশ্বব্যাপী সুনাম। প্রতিটি সোভিয়েত রিপাবলিকেই সৃষ্ট হয়েছে এমন সব সুন্দর শিল্পকাজ যার উন্নত আত্মিক মূল্যবোধে সোভিয়েত জনগণ ন্যায়ত গর্ব অনুভব করে।

ক্রুশ্চভ দেমিয়ান বেদনির কবিতার প্রসঙ্গ আনেন। গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে সোভিয়েত জনগণ তাদের সংগ্রামে কবি বেদনির কবিতা ও গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে রক্ষার সংগ্রামে লাল ফৌজ ও পার্টিজানদের গলায় বেদনির গানগুলি বেজে উঠত।

বার্লিনে সোভিয়েত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের উল্লেখও ক্রুশ্চভ করেন। খ্যাতনামা সোভিয়েত ভাস্কর ই. ভ. ভূচেতিচ-এর এই ভাস্কর্যটিতে ফ্যাসিজমের অন্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীর সোভিয়েত সৈনিকদের স্মৃতি মূর্ত। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মস্কোয় যে বিজয়-স্মারক স্তম্ভটি ভাস্কর ভূচেতিচ রচনা করেছেন, সেই উদ্দীপ্ত ভাস্কর্যের বিষয়ও ক্রুশ্চভ বলেন। কেরবেলের কাল মার্কসের স্মৃতিমূর্তিও এরকম একটি বলিষ্ঠ ভাস্কর্য-সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কসের মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব এই ভাস্কর্যে সার্থক শিল্প আঙ্গিকে রূপায়িত।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমাদের জনগণ চায় সংগ্রামী বিপ্লবী শিল্প। এবং সোভিয়েত শিল্প ও সাহিত্য প্রোজ্জল শিল্পগত চিত্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিজম গড়ার এই মহান ও বীরত্বপূর্ণ যুগকে পুনঃসৃষ্টি করবে, কমিউনিস্ট সম্পর্কগুলিকে, নতুনের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়কে, সঠিকভাবে প্রতিভাত করবে—এই হলো তার সাধনা—'মিশন'। আমাদের সময়ের বাস্তবতার ইতিবাচক দিকগুলি, শিল্পীকে দেখতে সক্ষম হতে হবে এবং, সানন্দে তাকে সহায়তা দান করতে হবে। সেই একই সঙ্গে আবার নেতিবাচক দিকগুলিকেও না এড়িয়ে গিয়ে, যা নতুনের এই অভ্যুদয়ের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছে।

এমনকি খুব ভালো জিনিষেরও অন্ধকার দিক আছে, সবচেয়ে সুন্দর মুখও নিব্রণ নয়। সবকিছু নির্ভর করছে বাস্তবতাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে, কোন অবস্থান থেকে তার নিরূপণ—তার উপর। প্রবাদে বলে যা তুমি চাও, তা খুঁজে পাবে। অপক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি, যিনি জনগণের সৃজনশীল প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন তিনি বিষয়গতভাবে (অবজেকটিভলি) ভালো এবং মন্দ উভয়ই দেখতে পাবেন এবং উভয়েরই সঠিক উপলব্ধি ও মূল্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে যা প্রগতিশীল, প্রধান এবং আমাদের সমাজের অগ্রসরণে চূড়ান্তভাবে নিয়ামক—তাকেই তিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগাতে পারবেন।

কিন্তু যে মানুষ আমাদের বাস্তবতাকে নিঃসাড় দর্শকের (ইমপ্যাসিভ অনলুকার) মতো দেখে, সে দেখতে পায় না এবং জীবনকে বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মাঝে মাঝে এরকম ঘটে যে আমাদের শিল্পকর্মীরা বাস্তবতার বিচার করেন শুধুমাত্র আঁস্তাকুড়ের পূতিগন্ধ শুঁকে, ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে আঁকেন কদাকার, কৃষ্ণতম রঙ ব্যবহার করেন। এ সবই একমাত্র বিতৃষ্ণা, হতাশা ও নৈরাশ্যই জাগাতে পারে। এই শিল্পীরা বাস্তবতার বর্ণনা করেন তাঁদের নিজস্ব একপেশে, বিকৃত ও 'সাবজেকটিভ' ধারণা থেকে, নিজেদের 'আবিষ্কার' এক কৃত্রিম, নিরক্ত একঘেঁয়েমিপনার সৃষ্টি করে। আর্নেষ্ট নেইজভেসৎনির যে সব 'বীভৎস উদ্ভাবনী'গুলি (রিভোলটিং কনককসান্স) এক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে, সেগুলি দেখে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলতে হয় যে, যে সোভিয়েত-সমাজ তাকে লালন করল, এবং যাকে একেবারে দক্ষতাহীনও বলা চলে না, সোভিয়েত জনগণের নিকট সে কী অকৃতজ্ঞতা ভরেই না ঋণশোধ দিল! এবং নেইজভেসৎনি আমাদের শিল্পকর্মীদেরও মধ্যে

একক নয়, আরও কয়েকজনের বিমূর্তবাদী শিল্পও প্রদর্শনীটিতে দেখা গেছে। আমরা এর নিন্দা করি, নিন্দাবাদ করে যাব এরকম বিকলাঙ্গতার, খোলাখুলি এবং আপোষহীনভাবে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গেও ক্রুশ্চভ এসেছেন। এক্ষেত্রেও রয়েছে উচ্চ শিল্পমানের সাফল্য। কিন্তু ভাবাদর্শগতভাবে অন্তঃসারশূন্য ও নিচু শিল্পমানের ছবিও তোলা হচ্ছে, একটি নতুন ফিল্ম যার প্রাক-প্রদর্শনী হয়ে গেছে সে সম্পর্কে ক্রুশ্চভের সমালোচনা তীক্ষ্ণ। সুপরিচিত পরিচালক গেরাসিমভের নির্দেশাধীনে "জাস্তাভা ইলিচা" (ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামাঙ্কিত একটি অঞ্চল নিয়ে) নামে এই রূপকাশ্রিত ফিল্মটি তুলেছেন মার্লেন খুতাসিয়েভ নামক একজন তরুণ পরিচালক। ক্রুশ্চভ দেখান যে এই চলচ্চিত্রটিকে সোভিয়েত দেশের দুই পুরুষকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিকৃতিসাধন। ক্রুশ্চভ বলেন : পিতা-পুত্র সমস্যাটি তুর্গেনিভের সময়ে যে ধরণের ছিল, আমাদের যুগে সে রকম কোনো সমস্যার অস্তিত্ব নেই। ইতিহাসের সম্পূর্ণ যে ভিন্ন যুগে আমরা বাস করছি, মানবিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে তার এক নিজস্ব প্যাটার্ণ রয়েছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুরুষপরম্পরায় মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই এবং অতীত যুগে "পিতা-পুত্র" সমস্যা বলতে যা বোঝাত তাও বর্তমানে অতীত হয়ে গিয়েছে। উল্লেখিত ফিল্মটির প্রযোজকরা নিজেদের মাথা থেকেই "সমস্যা" বানিয়ে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছেন, যার উদ্দেশ্যকেও সাধু বলা যায় না। খুব উচিতভাবেই তাই, পরিচালক খুতসিয়েভ এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক গেরাসিমভকে জিজ্ঞাসা করা যায়—এ রকম ছবি করার দুর্ভাবনা তাঁদের মাথায় এল কি করে ?

পার্টিজ্ঞানবোধ ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক

সম্প্রতি কয়েক বছরে সোভিয়েত লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের সৃজনাত্মক কাজে সোভিয়েত সমাজের স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রকালীন পর্যায়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন। ক্রুশ্চভ বলেন, এর যৌক্তিকতা রয়েছে এবং এই মনোযোগের কারণও যথেষ্ঠ বোধগম্য। এমন সমস্ত সাহিত্য ও শিল্প রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যাতে ব্যক্তিতন্ত্রের বছরগুলির সোভিয়েতের বাস্তবতা বিশ্বস্তভাবে এবং পার্টি অবস্থানের দিক থেকে চিত্রিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্রুশ্চভ উল্লেখ করেন আলেকসান্দর ভার্দোভস্কির উপন্যাস "দূর দিগন্ত," সোলঝেনিৎসিনে'র

লেখা "ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একটি দিন" ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকো রচিত কিছু কবিতা, চুকরাই পরিচালিত চলচ্চিত্র "পরিচ্ছন্ন আকাশ" প্রভৃতি শিল্পসৃষ্টি। ক্রুশ্চভের বক্তব্য যে, প্রকৃত সততাযুক্ত শিল্পরচনা পার্টি সমর্থন করে জীবনের নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে সে কাজ রচিত হলেও, যদি তা নতুন সমাজ গঠনে জনগণের প্রযত্নের প্রতি সহায়তা, জনগণের শক্তিকে সংহত এবং জোরালো করার জন্য নিযুক্ত হয়। আমরা জানি শ্লেষাত্মক সাহিত্যের, গল্প, নাটকের এদিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন বলা যায় সের্গেই মিখালখভের এই জাতের লেখাগুলি। শ্লেষ যা হলো ধারালো ছুরির মতো। দক্ষ সার্জেনের হাতে যেমন শরীরের বিষাক্ত বিস্ফোটক কেটে বাদ দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যেরই প্রয়োজনে। তেমনি। কিন্তু তার জন্য দরকার সেরকম অভিজ্ঞ দক্ষ হাত। যদি সেরকম দক্ষতা না থাকে, ওকাজে হাত না লাগলেই ভালো। তাতে অন্যের আখেরে ক্ষতিই হয়, হয়তো কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে নিজের আঙুলটাই কেটে যায় পর্যন্ত। তাই সবারই সবকাজে হাত না দেওয়া ভালো। মায়েরা যখন ছেলেদের হাতে ধারালো জিনিষ দেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্যবহারের জ্ঞান শিশুটির জন্মায়, তখন তাঁরা ঠিক কাজই করেন।

সত্য যে ব্যক্তিতন্ত্রের বছরগুলি এক দুর্বহ স্মৃতি, ক্রুশ্চভ যাকে বলেন এক "গ্রীভাস হেরিটেজ" রেখে গেছে। সোভিয়েত পার্টি তার সম্পর্কে সমগ্র সত্য জনগণকে জানিয়েছে। কিন্তু, ক্রুশ্চভ বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে সেই সব বছরগুলি সোভিয়েত সমাজের বিবর্তনে শুধু বদ্ধতার যুগই ছিল না, আমাদের শত্রুরা যেভাবে তা দেখাতে চায়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং লেনিনের ভাবাদর্শে ও উত্তরাধিকারে অনুপ্রাণিত আমাদের জনগণ সাফল্যের সঙ্গেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিল এবং তার নির্মাণকার্য শেষ করছিল। পার্টি ও জনগণের প্রযত্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল যা সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়, ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর উৎসাদন করে, ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়ী হয়ে। সেজন্য যে সব লেখকরা সোভিয়েত জীবনের এই অধ্যায়টিকে নিতান্ত একপেশে ভাবে দেখেছেন, সবকিছুকেই নিছক কালোরঙে বর্ণনা করেছেন—আইনভঙ্গ, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এইগুলিকেই সবকিছু ভেবেছেন, তাঁদের পথ ভ্রান্ত। ফেলে দেওয়া জঞ্জালস্তূপ থেকে বিষয়বস্তু টেনে নিয়ে সেগুলিকেই অনেক লেখক

'বাস্তবতার বিশ্বস্ত ছবি' বলে দেখাতে চান। এই সব লেখকের মতে যে সব বইতে আমাদের জীবনের ইতিবাচক দিক, জনগণের কৃতিত্ব ও অর্জনকে বিবৃত করা হয়েছে, সেগুলি হলো "বার্নিশ করা।" এ দৃষ্টিভঙ্গী আমরা গ্রহণ করতে পারি না। জানি যে, এমন কিছু লেখা হয়েছে যাতে "পালিশ চড়ানো" আছে, পার্টি তার সম্পর্কে নঙর্থক মনোভাবই ব্যক্ত করেছে। ব্যক্তিতন্ত্রের ঐসব বছরগুলিতে সবকিছুই খারাপ ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ওই যুগেও জনগণ যথেষ্ঠ বীরত্ব দেখিয়েছে, সবকিছুকেই আমরা তাই কালো রঙ মাখিয়ে দেখাতে পারিনা। যে সব লেখকরা শুধু তাই করেন ক্রুশ্চভ তাঁদের নাম দেন "কালিমালেপনকারী"। ক্রুশ্চভ বলেন, লেখক ও শিল্পীদের দৃষ্টি ফেলতে হবে বাস্তবতার গভীরে এবং সঠিকভাবে তা বর্ণিত হতে হবে। প্রত্যেক শিল্পীকেই জনসাধারণ গ্রহণ করবে রচনার গুণের বিচার দিয়ে। ব্যক্তিতন্ত্রের যুগে যে লেখক আমাদের জীবনের সদর্থক দিকটিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন, অনেকে তাঁদেরও নিন্দাবাদ স্বরু করেছেন। এটা ঠিক নয়।

ইলিয়া এরেনবুর্গের স্মৃতিকথার প্রসঙ্গ এই সূত্রে আসে। ক্রুশ্চভ বলেন, এরেনবুর্গ সব কিছুকেই আঁধার বর্ণে চিত্রিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিতন্ত্রের যুগে নিজে দমন ও বিধিনিষেধের অধীন হন নি। কিন্তু গালিনা সেরেব্রাকোভার মতো লেখিকাকে কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েন নি, পার্টির আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এবং পুনর্বাসনের অব্যবহিত পরেই আবার সৃষ্টিধর্মী কাজে কলম ধরেন। শ্রীমতী সেরেব্রাকোভার হাত থেকে পার্টি ও জনগণ সে সময়ের যথার্থ চিত্র পেয়েছে।

স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রের যুগের প্রশ্নটি নিয়ে ক্রুশ্চভ এই প্রসঙ্গে আবারও আলোচনা করেন। ক্রুশ্চভ বলেছেন: প্রায়ই জানতে চাওয়া হয় যে স্তালিনের জীবীতকালেই কেন আইনের লঙ্ঘনগুলি, ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করা ও যাতে তা আর বাড়তে না পারে সেরূপ করা হয় নি? তখন কি তা সম্ভব ছিল?

এই প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পার্টির দলিলাদিতে বহুবার পুরোপুরি ও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যত এখনও অনেকে আছেন, তার মধ্যে শিল্পী সাহিত্যিকও, যাঁরা এই ঘটনাগুলিকে বিকৃত আলোয় দেখতে চান। নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীরা কি গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলি জানতেন? হাঁ, জানতেন। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন নির্দোষ লোকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? না, এ তাঁরা

জানতেন না। তাঁরা স্তালিনের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং কল্পনাও করতে পারেন নি যে সৎ, আদর্শনিষ্ঠ মানুষও দমন-পীড়নের শিকার হবেন।

ক্রুশ্চভ অতঃপর বিবৃত করেন অক্টোবর বিপ্লবের সুরু থেকে যত দিন না শোষক শ্রেণীগুলির চূড়ান্ত উৎখাত শেষ হয়, ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজ কি তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রেণী-শত্রুরা সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ, হত্যা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়। বিপ্লবের জয়কে রক্ষা করা কি প্রয়োজন হয়ে পড়ে নি? হয়েছিল। এবং প্রথম দিন থেকে দৃঢ়হাতেই তা করা হয়। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার কয়েকমাসের মধ্যেই লেনিন স্বাক্ষর দেন এক আদেশে যার দ্বারা প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সারা-রুশ জরুরী কমিশন—বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বহারার একনায়কত্বের শাণিত অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তালিন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহনের দায়িত্বে ছিলেন এবং জনগণের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামের ধ্বনির মাধ্যমে এই তীব্র সংগ্রাম চালান। এ ছাড়া সে সময় কোনোও উপায়ও ছিল না। কেননা পার্টির ইতিহাসে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্টেট ডুমায় বলশেভিক গ্রুপেরই একজন সদস্য ম্যালিনোভস্কি যে পুলিশের চর ছিল, তা ধরা পড়ে।

সমাজতন্ত্রের নির্মাণ ও বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে পার্টির এই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকায় স্তালিনের মর্যাদাও বেড়ে যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে, ঐ সময়ে ও পরবর্তী সমাজতন্ত্র গঠনেরকালে স্তালিনের অবদান সুপরিচিত ছিল। বিশেষতঃ পার্টির ভিতরকার বিরোধী গোষ্ঠী ও লেনিনবাদ বিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্তালিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পার্টির মধ্যে ট্রটস্কিবাদ জিনোভিয়েভবাদ, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি লেনিনবাদবিরোধী ধারাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে পার্টি ও সরকারকে শক্তিশালী করার এটি পর্যায় ছিল। লেনিনের মৃত্যুরপর ট্রটস্কিবাদী ও জিনোভিয়েভবাদীদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ পার্টিজীবন ও সমাজতন্ত্রের গঠনকার্যের মৌল বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভের সহযোগীদের কার্যকলাপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে এবং লেনিনবাদ বিরোধী সমাজতন্ত্র বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়ে যায়। ট্রটস্কিবাদীদের পর পার্টিকে লেনিনবাদী নীতির জন্য ঝুঝতে হলো বুখারিন, রিয়াকভ ও টমস্কির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে,—লেনিনের নীতি অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি যৌথ করণের জন্য। লেনিনের মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে ট্রটস্কিবাদী, জিনোভিয়েভবাদী, বুখারিনবাদী এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদী নীতি উর্দ্ধে তুলে রাখার জন্য পার্টির নিরন্তর সংগ্রামে স্তালিনের অবদান বিরাট। এজন্য পার্টি ও জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁর উপর এবং তাঁর কার্যাবলীর সমর্থনে।

কিন্তু স্তালিনের নিজের চারিত্র্যবৈশিষ্টের মধ্যেই গুরুতর ত্রুটি ও ভুল ছিল, লেনিন তাঁর জীবিতকালে যে দিকে পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

লেনিন দেখিয়েছিলেন স্তালিনের হাতে বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার বিপদ, যা স্তালিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁর স্বভাবগত বড় ত্রুটির জন্যই। সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে বদল করার উপদেশ দিয়ে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখেছিলেন ঐ পদ আর কোনো নেতার হাতে দেবার যাঁর থাকবে "স্তালিনের থেকে বেশি সহিষ্ণুতা, অধিকতর সহমর্মীতা, আরও সৌজন্যশীল, অন্যান্য কমরেডদের প্রতি বিবেচনা-পরায়ণ, কম অব্যবস্থিতচিত্ত ইত্যাদি।

লেনিন স্তালিনকে মনে করতেন পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান, মার্কসবাদী, বিপ্লবের প্রতি অনুগত। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের কাছে লেনিন তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে এক চিঠিও দেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তা তলিয়ে ভাবেন। এ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে শক্তিসম্পর্ক খুঁতিয়ে দেখা হয়। নেতা হিসেবে স্তালিনের ইতিবাচক দিকগুলি ওজন করে দেখে এবং লেনিন-নির্দেশিত ব্যক্তিগত ঘাটতির দিকগুলি তিনি উৎরে নেবেন বলে স্তালিনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্তালিন এ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেন এবং পার্টি তাঁর ওপর যে আস্থা ন্যস্ত করেছিল তার অপব্যবহার করেন। এরই পরিণতি হল ব্যক্তিতন্ত্রের যুগের বেদনাদায়ক সংঘটনগুলি। পার্টি জীবনের লেনিনীয় মানগুলি স্তালিনের দ্বারা স্থূলভাবে লঙ্ঘনের ব্যাপারে পার্টি আপোষহীন নিন্দাবাদ করেছে। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, কমিউনিস্ট স্বার্থের গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিন যে কাজ দিয়েছেন পার্টি তা যথার্থতার সঙ্গে স্বীকার করে। আজও আমরা স্তালিনকে কমিউনিজমের

প্রতি বিশ্বস্ত, একজন মার্কসবাদী বলে মনে করি। তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির যে সব স্থূল ভ্রান্তিগুলি তিনি করেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর অপরাধ নিহিত। সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতিগুলি লঙ্ঘন ও পার্টি এবং জনগণ তাঁর উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল তার অপব্যবহার স্তালিন করেছিলেন। ক্রুশ্চভ বলেন যে, স্তালিনের অন্ত্যেষ্টির সময় তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন এবং তা ছিল আন্তরিক অশ্রু, যদিও জানা ছিল স্তালিনের ব্যক্তিগত অপূর্ণতাগুলি, কিন্তু তাঁর ওপর ছিল বিশ্বাস, আস্থা। এই বিশ্বাসের জন্যই মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনেও বিশিষ্ট বলশেভিক সামরিক নেতা সম্পূর্ণ নিরপরাধ যাকির বলতে পেরেছিলেন তাঁর এই শেষ কটি কথা "স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন।" কেননা মৃত্যুর মুহূর্তেও যাকির বিশ্বাস করেছিলেন, সম্পূর্ণ নির্দোষ তাঁকেও যে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয় স্তালিনের হাত নেই। এবং যাকির এরকম মাত্র একজন নন।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে স্তালিন হয়ে পড়েছিলেন এক গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি—পার্সিকিউশন কমপ্লেক্সে এবং সন্দেহপরায়ণতায় ভুগতেন।

স্মৃতিচারণ সাহিত্যের অনুরাগী অনেক সাহিত্যিক প্রায়ই এই সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত করতে গিয়ে এমনভাবে বিষয়টিকে দেখেন যাতে মনে হয় যে তাঁরা সমস্ত বিষয়টিকে যেন দূর থেকে নিরীক্ষণ করেছেন, যেন অন্য কোনো দেশে থেকে, দূরত্ব বজায় রেখে।

কিন্তু এমন কমরেডরাও রয়েছেন, যাঁরা স্তালিনের এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলাফল নিজের ব্যক্তিগতভাবে বোধ করেছেন, এবং সেই অভূতপূর্ব বিপদের সময়েও এই সব বিষয় মেনে নিতে পারেন নি, প্রতিবাদ করেছেন, স্তালিনের কাছে বিবৃতি, প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন।

১৯৩৩ সালের বসন্তে এরকম চিঠি লেখেন স্তালিনের কাছে বিখ্যাত লেখক মিখাইল শোলোকভ। ডন অঞ্চলে এরকম আইনভঙ্গের বিরুদ্ধে শোলোকভের লিখিত দুটি প্রতিবাদপত্র ও স্তালিনের উত্তরও এখন জানা গেছে। শোলোকভের এই চিঠি দুটি যন্ত্রণাপীড়িত হৃদয়ের সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। ডন জেলার ভেশেনস্কায়া ও অন্যান্য এলাকায় যে সব অপরাধের ঘটনা সংঘটিত করা হয় তার বিরুদ্ধে এই পত্রগুলি ছিল নির্ভীক ধিক্কার। একজন প্রকৃত বলশেভিকের মতই মিখাইল শোলোকভ এই সব জাজ্জ্বল্যমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন, হাল ছেড়ে দেন নি। তৎকালীন

অরাজকতার বিরুদ্ধে শোলোকভ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যেমন শোলোকভের সতর্কবাণীর প্রতি তেমনি অন্যান্য সাহসী কমিউনিস্টদের সতর্কীকরণের সম্পর্কেও স্তালিন সম্পূর্ণ বধির হয়ে থাকেন। স্তালিনের মৃত্যু এবং বেরিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনের পরই এই সব অরাজকতা ও স্তালিনের ক্ষমতার অপব্যবহারের তথ্যগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্রুশ্চভ বলেন, সব কথাই মনে রাখতে হবে। এবং সোভিয়েত সমাজ ও জীবনের বর্তমান ও অতীত নিয়ে যিনি লিখতে বসবেন, তাঁর তাই ইতিহাসের ঘটনাবলীর গভীর বিশ্লেষণের পর্যবেক্ষণশক্তি আয়ত্ত করা দরকার। এ কাজ সোজা নয়। কিছু সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাজে এবং ফিল্ম দেখে বিস্ময় বোধ করতে হয় যে, এই সব লেখকরা তাঁদের ব্যক্তিগত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত অসুবিধা ও প্রতিক্রিয়াগুলি বলছেন। জনগণের গঠনাত্মক কাজে যাঁরা কোনও অংশ গ্রহণই করেন নি তাঁদের দ্বারাই এরকম 'বাস্তবতা'র ছবি দেওয়া যেতে পারে।

একজন ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতার নিরূপণ নির্ভর করে সেই সময় ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই ব্যক্তির ভাবাদর্শগত বোধের উপর। আমাদের পার্টি সাহিত্য ও শিল্পে পক্ষপাতাশ্রয়ীতার পক্ষে সর্বদা আছে। পার্টির ও পার্টির বাইরের লেখক ও শিল্পী যাঁরা শিল্পদৃষ্টিতে কমিউনিজমের সঙ্গে দাঁড়ান, পার্টি সেই সব তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের স্বাগত জানান।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সমাজে কোনো অপক্ষপাতাশ্রয়ীতা (নন-পার্টিজানশিপ) বলে কিছু নেই। যিনি নিজের এই অপক্ষপাতাশ্রয়ী মনোভাব জাহির করেন, তিনি তা করেন প্রকৃতপক্ষে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য গোপন করার জন্য। তিনি চান তাঁর মতের সমর্থক বাড়াতে। ইতিহাসে বহু সময় দেখা গেছে বহু প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী ব্যক্তি এই অপক্ষপাতাশ্রয়ী ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এবং পরে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের বুর্জোয়াদের পক্ষপাতাশ্রয়ীতার প্রমাণ।

সোভিয়েতের গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে যখন প্রতিবিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছিল, তখন আমাদের শ্রমজীবী জনগণ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই রাজনীতিগতভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁদের রাজনৈতিক অ, আ, ক, খ শেখায় আর তাঁরা বুঝতে পারেন কার পক্ষ বেছে নেবেন এবং বলশেভিক হয়ে ওঠেন।

এই বাস্তবতার যথার্থ চিত্রণই দিমিত্রি ফুর্মানোভের উপন্যাস 'চাপায়েভ' (ঐ উপন্যাসের চিত্ররূপটিতেও), আলেকসান্দর সেরাফিমোভিচের 'আয়রন ফ্লাড', আলেকসান্দর ফাদায়েভের 'দি নাইনটিন', নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'হাউ দি ষ্টীল ওয়াজ টেম্পারড' এবং অন্যান্য সোভিয়েত বিপ্লবী লেখকদের গ্রন্থে ফুটে ওঠে। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমানে কিউবায় এবং অন্যান্য অনেকগুলি দেশ যারা এখন স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে সে সব দেশে 'হাউ দি ষ্টীল ওয়াজ টেম্পারড'-এর মতো সোভিয়েত উপন্যাসের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নয়

ক্রুশ্চভ বলেন: ইতিহাসের অভিজ্ঞতা শেখায় যে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামে শুধু কথায় নয়, কার্যাবলী দেখে বিচার করতে হয়। বিচার করতে হয় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি রয়েছে কোথায় এবং কেন। এবং তজ্জন্য মার্কসবাদী—লেনিনবাদী হতে হয়, একজন কমিউনিস্ট যার জীবন ও প্রতিভা নিয়োজিত হবে এই পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে। শ্রেণীসংগ্রামের পরিধির বাইরে সমাজের কোনও অংশই থাকতে পারে না। এমন কি একটি পরিবারও এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে।

এক স্তরের মানুষ আছেন, যাঁরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ না করার যুক্তি হিসেবে তথাকথিত 'মানবিক' প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিপ্লব সামাজিক শ্রেণীগুলির দ্বারা সাধিত হয়। পুঁজিতন্ত্রের অবসানের জন্য শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী যে বিপ্লব সাধন করেন তা হল সর্বাধিক মানবিক সক্রিয়তা। শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা মানবতাবাদেরই চূড়ান্ত প্রকাশ। শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাত না হলে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি ও তাদের সুখীজীবন গঠন হতে পারে না। এটা কি বোঝা খুবই শক্ত যে যারা সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ গ্রহণ করছে না তারা কার্যত বুর্জোয়াদের সাহায্য করছে? যারা শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে নেই তারা অনিবার্যভাবে তাদের বিরুদ্ধে আছে। এটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে।

আবার এমনও ব্যক্তি আছেন যাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ গ্রহণ করেন বলেন এবং অনেক সময়ে কমিউনিজমের পক্ষে দাঁড়ান কিন্তু সংগ্রামে

সক্রিয়ভাবে অংশ নেন না। তাঁরা শুধুমাত্র যোদ্ধাদের পথেই দাঁড়ান নিজেরা হতবুদ্ধি হয়ে এবং অপরকে হতবুদ্ধি করে। বিপ্লব শুধু একটি সদিচ্ছা মাত্র নয়, এ এক কঠোর ও তীক্ষ্ণ সংগ্রাম। বিপ্লবের জন্য লড়তে হয়, শুধু বিপ্লব করার সময়েই নয় তার জয়কে সংহত করার পর্যায়েও, কমিউনিজমের নির্মাণপব পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ বিপ্লবের সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সশস্ত্র শ্রমিক ও শত্রুপক্ষের গুলিবিনিময়ের মাঝখানে ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলির ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা করে এ. ভি. লুনাচারস্কী একবার লেনিনের কাছে প্রতিবাদ করেন এবং এমন কি সোভিয়েত সরকার থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন। লেনিন এতে শুধু হেসেছিলেন, বিপ্লবের এই উন্নাসিক ধারণায়। পরে লুনাচারস্কী নিজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ আবার এরেনবুর্গের কথায় আসেন; কমরেড এরেনবুর্গ একবার প্যারিসে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং লেনিন তাঁকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন, এরেনবুর্গ নিজেই লিখেছেন। কমরেড এরেনবুর্গ পার্টিতে যোগ দেন এবং পরে পার্টি থেকে সরে যান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তিনি কোনো প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন নি, তিনি বাইরে থেকে দর্শকের ভূমিকা বজায় রাখেন। এ কথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না যে কমরেড এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথা 'মানুষ, বছর, জীবন' বইতে আমাদের বিপ্লব ও পরবর্তী সমগ্র সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পর্যায় সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তা তাঁর ঐ ভূমিকা থেকে আসে।

সোভিয়েত লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার এবং সমস্ত সৃজনশীল শিল্পের কর্মীদের কমিউনিজম গঠনকারীদের সারিতেই স্থান নিতে হবে, পার্টির আদর্শ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ের জন্য তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে বিশ্বে আজ দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ ভাবাদর্শের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলেছে—সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া। আমাদের শিল্পীর দায়িত্ব হল তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা কমিউনিজমের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠ করা, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানা, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। পার্টিগত উপলব্ধি ও দেশপ্রেম অনুগত মহা শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসাবে ক্রুশ্চভ মিখাইল আলেকসান্দ্রোভিচ শোলোকভের রচনাবলীর উল্লেখ করেন। শোলোকভের 'ধীরে বহে ডন', 'ভার্জিন সয়েল আপটানর্ড', 'একজন মানুষের ভাগ্য' এবং তাঁর

নতুন উপন্যাসের প্রকাশিত অধ্যায়গুলি। শোলোকভের শিল্পকর্ম এই কথাই প্রমাণিত করে যে কমিউনিস্ট পক্ষাশ্রয়ীতা লেখকের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে সীমায়িত করা তো দূরের কথা তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করতে এবং রচনার সামাজিক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে সহায়তাই দান করে।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমরা শিল্পে শ্রেণীগত অবস্থান গ্রহণ করি এবং জোরালোভাবে বিরুদ্ধতা করি সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। শিল্প প্রবেশ করে ভাবাদর্শের (ইডিওলজি) পরিধির মধ্যে। যাঁরা মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আঙ্গিক সর্বস্বতা, বিমূর্তবাদ প্রভৃতি ধারাগুলি সোভিয়েত শিল্পে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে অনিবার্যভাবে তাঁরা নেমে যান ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের অবস্থানে—ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থানে। আমরা সম্প্রতি এরূপ এক ধারার সম্মুখীন হচ্ছি। দুর্ভাগ্যত এটা একটা ফাঁদ—কিছু কমিউনিস্ট, লেখক ও শিল্পী এমন কি আমাদের সৃজনশীল শিল্পে কিছু নেতৃস্থানীয়রাও এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।

কমরেড এরেনবুর্গ অবশ্য বলেছেন তিনি যখন ভাবাদশের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলেছিলেন তখন তা নেহাতই পরিহাসচ্ছলে বলা: এ কথা বললে অবশ্য ভালো কথা। কিন্তু এরেনবুর্গ যে পরিহাসই করে থাকুন তা খুবই খারাপ পরিহাস।

ক্রুশ্চভ বলেন: আমি পূর্বেই বলেছি ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বিমূর্ত শিল্প, আঙ্গিক সর্বস্বতা, সমাজতান্ত্রিক শিল্পে এই ধারায় অস্তিত্ব রক্ষা করার কথা যাঁরা বলেন—তাঁদের বুঝতে হবে—এগুলি হলো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আঙ্গিক। কমরেড এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "তৎকালে ছিল নানা শিল্পমতের 'স্কুল': কমিউনিস্ট-ভবিষ্যবাদী, চিত্রকল্পবাদী, প্রলেটকাল্টবাদী, প্রকাশবাদী, উদ্দেশহীনতাবাদী, বর্তমানবাদী, আকস্মিকতাবাদী, এবং এমন কি কিছু-না বাদী। অবশ্যই, কিছু তাত্ত্বিক নানা ধরণের অর্থহীন কথা বলেন···আমি কিন্তু সেই ফেলে আসা সময়ের সমর্থনে দাঁড়াতে চাই।" স্বভাবতই প্রকাশ পেয়েছে, লেখকের রয়েছে তথাকথিত ঐ "লেফট" ধারাগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং এই সবের প্রতি অনুমোদন জানাতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। প্রশ্ন আসে কাদের বিরুদ্ধে

তিনি এ সবের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। স্বভাবতই, আমাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? স্বভাবতই আমাদের আধুনিক শিল্পে অনুরূপ সম্ভাব্য ধারাগুলির পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করতে। এর মানে হলো সোভিয়েত শিল্পে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আঙ্গিক সর্বস্বতাবাদের সহাবস্থানকে মেনে নেওয়া। কমরেড এরেনবুর্গ একটি গুরুতর আদর্শগত ভুল করছেন, আমাদের কর্তব্য হলো তাঁকে এটি বুঝতে ও সংশোধনে সাহায্য করা। তরুণ কবি ইয়েভতুশেঙ্কোও তাঁর বিমূর্ত শিল্পের পক্ষে বক্তব্যে কমরেড এরেনবুর্গের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো, বাস্তবতাবাদী ও আঙ্গিক সর্বস্বতাবাদী উভয় দিকেই ভালো লোক আছে। কমরেড ইয়েভতুশেঙ্কোর দৃষ্টান্তকে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু আদর্শগত কমিশনে তাঁর বক্তৃতায় অবশ্য তিনি নিজের দোলাচলা থেকে উত্তীর্ণ হবার আশ্বাস দিয়েছেন। ইয়েভতুশেঙ্কো এবং তরুণ লেখক যাঁরা জনগণের আস্থা অর্জন করতে চান, তাঁদের পরামর্শ দিই যে শস্তা উত্তেজনার দিকে যাবেন না, উন্নাসিকদের মনোভাব ও রুচিকে পরিবেশন করবেন না। মনে রাখতে হবে আমরা যখন আপনাদের সমালোচনা করি নীতিগত অবস্থান থেকে আপনাদের বিচ্যুতির জন্য, তখন শত্রুরা আপনাদের প্রশংসা শুরু করে। এবং আমাদের আদর্শের বিরোধীরা তাদের মনোমত লেখার জন্য যদি আপনাদের প্রশংসা করে, তবে আমাদের জনগণ ন্যায়তই আপনাদের সমালোচনা করবে। সুতরাং বেছে নিন কোনটি আপনাদের পক্ষে ভালো। কমিউনিস্ট পার্টি বিমূর্ত শিল্প এবং আঙ্গিক সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং করবে। ফর্মালিজম সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। অনেকে বলে উঠবেন, ক্রুশ্চভ তা হলে ফটোগ্রাফিক শিল্প, শিল্পে প্রকৃতিবাদ চাচ্ছেন। না, কমরেডরা, মোটেই না। আমরা চাই চারপাশের বাস্তব জগতকে তার বহুবিচিত্র বর্ণবহুলতায়, রঙে, রেখায় বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করবে এমন এক প্রাণবন্ত শিল্প। এমন শিল্প সৃষ্টিই জনগণের হৃদয় ও মন অধিকার করতে পারবে। আঙ্গিকসর্বস্ব ও বিমূর্তবাদী শিল্পীরা ও তার সমর্থকরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে এখন রক্ষণশীল বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী শিল্পীদের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন,—জনগণ জানেন আসলে প্রশ্নটি হলো প্রকৃত শিল্পী ও প্রকৃত শিল্পের প্রশ্ন। শিল্পে বিকৃত রুচি ও মনোভাব প্রচার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

সৃজনশীল শিল্পের প্রশ্নে আমাদের নীতি হলো বিমূর্ততা, আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং শিল্পে এই ধরনের বুর্জোয়া অপসৃষ্টির বিরুদ্ধে নিরন্তর বিরোধিতা, এই লেনিনবাদী নীতি আমরা দ্বিধাহীন ভাবে অনুসরণ করে এসেছি ও করে যাব। লেনিন মনে করতেন সাহিত্য ও শিল্প জনগণের শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে অবশ্যই নিয়োজিত হবে।

তথাকথিত "বামপন্থী শিল্প"কে লেনিন অভিহিত করতেন, অর্থহীন বিদূষণ এবং তাকে অস্বাভাবিক সর্বনেশে বলে মনে করতেন। এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতি-কথায় এক স্থানে লিখেছেন: "এ. ভি. লুনাচারস্কী আমাকে বলেন যে, 'লেফট' শিল্পীরা মে-দিবসের জন্য রেড-স্কোয়ার সজ্জিত করতে পারবে কিনা। যখন তিনি লেনিনকে তা জিজ্ঞাসা করেন লেনিন তখন উত্তর দেন: আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই, আমার রুচি অপরের উপর চাপাতে চাই না।" এরেনবুর্গ লেনিনের এই উক্তিকে সোভিয়েত শিল্পে বিভিন্ন ভাবাদর্শগত ধারার সহাবস্থানের পক্ষে যায় বলে বোঝাতে চেয়েছেন। এটা ঠিক নয়। সাহিত্য ও শিল্পের ভাবাদর্শগত মূল্যের ও পার্টিজানত্বের নীতির প্রবক্তা লেনিনই ছিলেন। পরবর্তী যুগে গর্কি ও অন্যান্য সোভিয়েত নেতৃস্থানীয় লেখকরা এই নীতিকেই তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পার্টিজানবোধ ও ভাবাদর্শগত ও শিল্পগত গুণাবলীর কারণেই ম্যাকসিম গর্কির "মা" উপন্যাসটিকে লেনিন অত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়েছিলেন।

* * * *

ক্রুশ্চভ তাঁর এই সুদীর্ঘ ভাষণটিতে সাহিত্য ও শিল্পের নানা দিক বিষয় এবং ভাবাদর্শের দিক থেকে পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার পরিধিও বিস্তীর্ণ। এই আলোচনা বিশেষ সংক্ষেপিত ভাবেই উপস্থিত করা গেল, কারণ, স্বভাবতই স্থানাভাবের সমস্যাটি থাকে। সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিক, জনগণ ও পার্টির নেতৃবর্গ যে ওদেশের শিল্প-সাহিত্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে এরকম খোলাখুলি মতবিনিময়ে মিলিত হতে পেরেছেন, তাতে বিংশতি ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী বছরগুলিতে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে যে নতুন আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে, তারই প্রকাশ। ক্রুশ্চভ নিজেই বলেছেন: আমরা যে পরস্পর মিলিত হয়ে যে সব সমস্যাগুলি এখন আমাদের চিন্তিত করছে তাই নিয়ে আলোচনা করছি, আমাদের দেশের নতুন আবহাওয়াকেই তা প্রকাশিত করে।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

De l'e´ternel azur la Sereiue ironic

—Mallarme

আপেক্ষিকতাবাদ কি কোনো বিপ্লব

মননের আদর্শ বাস্তবের প্রয়াসকে নিরুত্তাপ দূরত্ব থেকে বিদ্রূপই করে চিরদিন—ফরাসী প্রতীকী-কবি মালার্মের এই পরাভবের যন্ত্রণা, বিজ্ঞানীর জন্য এক অনির্বাণ প্রেরণার মতো। পদার্থবিজ্ঞান প্রাকৃত বাস্তবের সেই চত্বরে তার আসন পেতেছে প্রকৃতি যেখানে প্রাণিক স্পন্দনে বিচিত্র হয়ে ওঠে নি, চেতনা যেখানে তার নির্মোক ছিঁড়ে ফেলে, বিশ্ব-বিবর্তনের সক্রিয় অংশীদার হতে পারে নি। স্বাধীন ইচ্ছা নেই অথচ সত্তা আছে, এমন একটি জ্ঞেয়কেই পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলা চলে। তাকেই 'ম্যাটার' বলা হয়, আর তারই সার্বিক envelope কিম্বা material world হলো পদার্থবিজ্ঞানের সীমা। ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যদি এই হয়, তার অজস্রতার ভেতরেও একটা ঐক্যের উপস্থিতি অনিবার্য। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে আমাদের তত্ত্ব থেকে যেন জড়ের এই অস্তিত্বের ঐক্যতানটুকু হারিয়ে না যায়—যে-কোনো ভাষাতেই বা যে-কোনো ভাবেই বলা হোক, বিজ্ঞানের কাছে আইনস্টাইনের দাবির রূপরেখা এই ছিল।

প্রকৃতির রাজ্য প্রতিসাম্যের দুর্লঙ্ঘ্য বিধি—এই প্রত্যয় থেকেই আইস্টাইন চেয়েছিলেন পদার্থবিদ্যার সমস্ত সমীকরণ এবং সূত্রগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য আনতে। তাই বলে, 'ইন্‌ডাকটিভ' পদ্ধতিতে নয়। সেই মূল ঐক্যের তত্ত্ব থেকে যেন তথ্যের মতো বিশ্লেষণ করা যায় সমস্ত বিশেষ অভিজ্ঞতার। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এই অভীপ্সা পূর্ণসিদ্ধির সাক্ষাৎ পায় নি; তার সম্ভাবনাকে শুধু মুক্ত রেখে এই বিরাট যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত লোকান্তরিত হয়েছেন। তার চেয়ে ঢের আগে উৎসাহী অনেক সহকর্মীর প্রাণে 'হেমন্ত আসিয়া গেছে' জেনেও, একে-একে অনেকেই piecemeal পদার্থবিজ্ঞান নির্মাতাদের সঙ্গী হয়েছেন দেখেও, সপ্ততিপর মহাবিজ্ঞানী শেষ দিনটি পর্যন্ত নিষ্ঠা এবং আস্থা নিয়ে সেই অপসৃয়মান আদর্শের সন্ধান করে গেছেন। আদর্শ বিদ্রূপ করবেই বাস্তব প্রয়াসকে। মালার্মের ছিল 'সৎ ক্ষোভ'—আধুনিক মানসে আছে আদর্শের 'অবজেক্‌টিভিটি'-তেই সংশয়।

আইনস্টাইনও তাঁর বিজ্ঞানের অনুধ্যান শুরু করেন সৎ সংশয়ের ভিত্তিতে।

প্রচলিত প্রতিটি সংজ্ঞা এবং ভাবনার বিপরীতও সত্য হলে কী হতো এই জিজ্ঞাসা থেকেই সমাধান এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা উনিশ শতকের শেষার্ধে যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, তাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবার মতো উপাত্তের জন্ম তখনো হতে বাকি ছিল। জ্ঞানের রাজ্যে একটা নৈরাজ্যবাদের অবস্থা যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। এই পর্যায়ে আইনস্টাইনের প্রতিক্রিয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে অনুরূপ এক উৎপাদন-সম্পর্কের বিশৃঙ্খল দুর্দশায় ব্যথিত কার্ল মার্কসের অঙ্গীকারের মধ্যে : "The philosophers have so for interpreted the world. The point is to change it."

এবং এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল তথ্যে যতটা তত্ত্বে তার চেয়ে বেশি, আর সব চেয়ে বেশি epistemology বা theory of knowledge-এর ক্ষেত্রে। অপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে যা পরিবর্তন এনেছে তার মাত্রা প্রায় ক্ষেত্রেই দার্শনিকের অনেক বক ছাড়িয়ে গিয়ে, দৃষ্টিভঙ্গী বা মানে যে পরিবর্তন এনেছে তা ইওরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে Bacon এবং Descartes-এর দুই ভিন্ন ধারার সম্মিলনের পরিণামের স্বাক্ষর। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার দিকে বড়ো একটা না গিয়েই সাধারণভাবে এর স্বরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে। বস্তুর হাজারো গুণাগুণ বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতায় আসে। তার বর্ণালী, তার ভর, বিদ্যুৎ, উষ্মা এবং অনেক কিছু। বিশেষ বলের প্রযোগে তার চলার পথটুকু পর্যন্ত। এ-সব লক্ষণ বা গুণই বাস্তব অভিজ্ঞতায় আসে যন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এদের প্রত্যেকটার সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এমন একটা অবস্থা বস্তুর স্বরূপ—এই কল্পনাটুকু বিজ্ঞানীর নিজস্ব। এই প্রকল্পেরই নাম 'থিয়োরি', কিন্তু এইখানেই বিপদের প্রথম সংকেত। বিজ্ঞানী তাঁর প্রকল্পের নির্মাণকালে স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহার করতে বাধ্য, যার সত্যাসত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতীত, অথচ মিথ্যা মনেও হয় না, অনেকটা কান্ট-এর a prioric category-র মতো। আর স্বতঃসিদ্ধগুলোর সংখ্যা যদি সম্ভাব্য ন্যূনতম সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে, বুঝতে হবে থিয়োরী অসম্পূর্ণ—কারণ প্রকৃতির রাজ্যে উদ্যোগের মতো নিয়মেরও বাহুল্য নেই, কোথাও অনাবশ্যকের আবির্ভাব নেই। জড়প্রকৃতির বাস্তবের এই সহজক্রিয়া-সাধন যে তার সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য; দেকার্তের প্রথম নীতির মতো, একেই একটা প্রথম নীতি ধরে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর যে একটা রূপান্তর এসেছে,

তারই নাম আপেক্ষিকতাবাদ। 'সাবজেকটিভ' আকাশকুসুম এড়াবার তন্নিষ্ঠতায় এর সৃষ্টি, স্রষ্টা আইনস্টাইন।

অর্থাৎ, পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ধারার সমন্বয়-প্রয়াস প্রকৃত প্রস্তাবে তন্নিষ্ঠতারই অনুসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের রাজ্যে এই 'মনিজম'-এর আস্পৃহা সমকালীনদের মধ্যে একটা বিপ্লবের মতো এসেছিল। কিন্তু জন্মসূত্রে আপেক্ষিকতাবাদ কোনো বিপ্লব, না, পূর্বসূরীর সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি? আইনস্টাইনের নিজের কথায় এর উত্তরের সন্ধান এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। পদার্থবিদ্যার অনিশ্চয়তা এবং অহং-বাদ (ego-centricity) নিরসনে এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করেই এই ক্ষুদ্র রচনার উপসংহার টানা যাবে।

অবশ্যই কয়েক শতকের গণিত এবং বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির মধ্যে আপেক্ষিকতার যে পটভূমি বিধৃত হয়ে আছে, সেই বিপুল বিজ্ঞানের ইতিহাস এক্ষেত্রে উল্লেখ্য নয়। 'Mein weltbild' পুস্তকে আইনস্টাইনের নিজের অভিভাষণ সংকলিত করে, আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবিতার যে প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের ভিত্তিতে, জনসাধারণের একাংশে প্রচলিত একটা ভ্রান্তির নিরসন—অর্থাৎ, আপেক্ষিকতা যে 'সিনথেটিক থিয়োরি' নয়, এর সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য প্রচ্ছন্ন হলেও বর্তমান ছিল এর উপাদান বা 'ক্যাটিগরি'র মধ্যে, এবং সেই-অর্থে এও যে একটি বিশ্লেষণাত্মক (এ্যানালিটিক) থিয়োরি, এই বিবৃতির বাইরে এই রচনার কোনো লক্ষ্য নেই। এখন কিছুক্ষণ আইনস্টাইনের নিজের কথাই শোনা যাক: "The Theory of Relativity may indeed be said to have put a sort of finishing touch to the mighty, intellectual edifice of Maxwell and Lorentz, inasmuch as it seeks to extend field physics to all phenomena, gravitation included.

"Turning to the Theory of Relativity itself, I am anxious to draw attention to the fact that this theory is not speculative in origin; it owes its invention entirely to the desire to make physical theory fit observed facts as well as possible. We have here no revolutionary act but the natural continuation of a line that can be traced through centuries."

অনেক সময়েই একটা কথা শোনা যায় যে, আইনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় দেশ-কালের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছেন। 'দেশ এবং কালের একটা সম্পর্কস্থাপন'—বিজ্ঞানের ছাত্র নন এমন অনেকেই আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে

এ সংবাদ জানেন। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা জানা হয়ে যায় তাঁদের তা কিন্তু কল্পিত কাহিনীর নামান্তর। পাঁচজনের প্রচারের যে একটা মত্যাভাস সৃজনশক্তি আছে, ন্যায়শাস্ত্রে যাকে 'লৌকিকলক্ষ' এবং Bacon থাকে 'Idol of the Marketplace' বলেছেন, এই ভ্রান্তির উৎস হিসাবে তাকেই চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে, এই ধরনের অদ্ভুত কিছুতে বিশ্বাস করবার একটা জটিল জিদ আমাদের সকলেরই কম বেশি আছে। কাজে-কাজেই আমরা বেশ ফলাও করে বলে থাকি, আইনস্টাইন একজন ভাবুক কবি ছিলেন। পরীক্ষাশালার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল না। ইতিহাসের ধারাকে তিনি অস্বীকার করে, নিজের একটা ধ্যানের জগৎ নির্মাণ করেছেন, এবং হয়তো বা, ঊর্ণনাভরচিত আপন জালে আপনি বদ্ধ হয়ে, কিংবা কস্তুরীমৃগসম আপন গন্ধে আপনি মুগ্ধ হয়ে, বাস্তবের প্রতিরূপসদৃশ এক ভাবলোক রচনা করেছেন, যার সঙ্গে পরমাণুবিজ্ঞানী বা নতুনতর কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিওরির সমন্বয় একটা নিরর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র।

এই জাতীয় ধারণাগুলোর কয়েকটি নির্দোষ অজ্ঞান এবং অবশ্যই শেষের কথাগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার মাত্র। মন-গড়া একটা প্রকৃতি নয়, বাস্তব প্রকৃতির ব্যাখ্যানের দায়িত্বই নিয়েছিলেন আইনস্টাইন। ইন্দ্রিয়ের প্রমাণগুলোর অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিজ্ঞতার অপনয়ন নয়, তাদের একটা 'ইউনিটারি' চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করার উচ্চাশা নিয়েই, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে এই মহাবিজ্ঞানী তাঁর সাধনা শুরু করেন। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম পত্র প্রকাশ পায়। তার পর ১৯১৩ সালে বোর এবং ১৯২৫ সালে হাইজেন-বার্গ পরমাণু-বর্ণালী এবং পরমাণু-বলবিদ্যা বিষয়ে যে দুই রাজপথের সন্ধান দেন, তাদের প্রকৃত পথিকৃৎ ছিল আইনস্টাইনের কৃতনিশ্চয় আস্থা যে 'থিয়োরি'র ভিতর পর্যবেক্ষণের অযোগ্য কোনো ধারণাপ্রসূত পরিমাণ যেন না এসে পড়ে। বোরের থিয়োরীতে যে-টুকু কল্পিত চিত্র ছিল, হাইজেনবার্গ সেটুকুও দূর করেন। পরমাণুবিজ্ঞানের রক্ষাকবচের মতো, ধন্বন্তরীর মতো যে Quantum Mechanics আজ শাখা-প্রশাখায় এতদূর বিস্তীর্ণ হয়েছে, তারও প্রেরণার উৎস ছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক তত্ত্বটুকু। আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে 'সাবজেকটিভিটি'র অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর, কারণ এর একমাত্র লক্ষ্যই ছিল 'অবজেকটিভিটি'।

Fichte-র মতো চিন্তার জগতে যাঁরা একঘরে, তাঁদেরই মধ্যে আত্মগত

ভাবনার প্রাধান্য থাকে। তাঁদের পদ্ধতি এবং প্রামাণ্য—কোনটাই কোনো ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত হয় না। অধিবিজ্ঞানে যে 'Coherence Theory of Truth' নিয়ে আলোচনা থাকে, তার মধ্যেও প্রণিধানযোগ্য একটা দিক আছে। পূর্বসূরীদের সঙ্গে, অনুরূপ ক্ষেত্রের চিন্তানায়কদের সঙ্গে, যখন আমার চিন্তার মিল বা ক্রমটুকুই খুঁজে পাই না, তখন নিজেকে দিকপাল না ভেবে ভ্রান্ত ভাবলেই ভুলের সম্ভাবনা কম হবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব হঠাৎ আকাশ-থেকে-পড়া কোনো apotheosis নয়, শোপেনহাওয়ারের 'the world is my idea' গোছের কিছু নয়—অথবা, গণিতে পারদর্শী অথচ অন্তরে এবং মনের গঠনে রোমান্টিক কোনো স্রষ্টার তথাকথিত esemplastic কল্পনা নয়। এবং নয় বলেই, তা একটা উটকো বিস্ফোরণের আকারে না এসে, এসেছে নিশ্চিত ধাপে-ধাপে, যার প্রতিটি পদক্ষেপের পশ্চাতে আছে Newton, Leibniz, Maxwell, Lorentz প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অপূর্ণ ইচ্ছার অসহিষ্ণু প্রেরণা ; Gauss, Hamilton, Riemann, Minkowski, প্রমুখ গণিতবিদ্দের কথিত বাহ্য-প্রকাশের ব্যাপারে অর্থহীন অথচ অব্যক্ত ধ্বনির মতো গম্ভীর ভাবেভরা ভাষা। এ তত্ত্ব এই কারণেই 'অবজেকটিভিটি' এবং 'রিয়ালিষ্টিক' বলে মনে হয়।

লরেনৎস যখন ম্যাক্সওয়েলের electro-magnetic field equation-এর সাহায্যে electro-dynamico-এর সুন্দর 'ইকোয়েশন' এবং তত্ত্ব খুঁজে পেলেন, তখন একটা সমস্যা দেখা দিল যে, আলোকের গতিবেগের স্থিরতা কেন machanicsএও প্রযুক্ত হবে না? প্রকৃতি কি বিদ্যুৎ-চুম্বকের জন্য এক তত্ত্ব এবং জড়ের গতি-বিজ্ঞানের জন্য আর এক তত্ত্বের প্রয়োগ পছন্দ করেন? এই প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর আইনস্টাইন খুঁজে পেলেন যে যুক্তি-পরম্পরার মধ্যে তাই হলো তাঁর আপেক্ষিকতার প্রথম প্রকাশ। অর্থাৎ, Special Theory of Relativity, কোনো বৈপ্লবিক আবিষ্কার নয়, সমকালীন বিজ্ঞানের নৈয়ায়িক অনুক্রপূরণ। কিন্তু তাই বলে, তা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা এখানেও অভ্রান্ত। জৈব-বিবর্তনেও এ সত্য সন্দেহাতীত যে, self-exceeding is the nisus of self-manifestation—যে form বা species বা emergent প্রকাশ পায়, তা তার নিজের জ্যামিতিক মাত্রাতেই বদ্ধ থাকে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, ছাপিয়ে গিয়ে, নতুন emergent-এর সৃষ্টি করে। Alexander-এর Deity থেকে Bergson-র Creative Evolution সর্বত্র এই সত্য স্বীকৃত। মার্কসের চির নূতনের 'সিনথিসিস'ও কি এরই সগোত্র নয়?

এবং এই self-exceeding-এর মধ্যে এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ aesthetic value নিহিত, যদিও আমাদের attruistic value তার নগণ্য, অন্তত আমাদের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের এই স্তরে। Special theory-র একটি postulate ছিল, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত সাধারণ নিয়মগুলোই সমস্ত inertial frame-এ একরকম হবে। অর্থাৎ কোনো co-ordinate system এর linear Uniform motion-এর ওপর 'ল' বা 'ইকোয়েশন'-এর ফর্ম নির্ভর করবে না। অর্থাৎ law হওয়া চাই অবজেকটিভ। এর পরে co-ordinate system-এর rotation এবং অন্যান্য motion-ও বিবেচনা করা হয়। uniformly accelerated reference frame-এর ক্ষেত্রে অভিকর্ষক্ষেত্রের সমবায়—এই ভাবে General Theory of Relativity-র প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। অর্থাৎ, reality নয়, শুধুই observation, observer-এর state of motion-এর ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিয়েও এ-ব্যাপারটাকে আমরা সহজভাবে নিতে পারি। আমি যদি একটা দেয়াল থেকে দূরে সরতে থাকি আমার থেকে দেয়ালের দূরত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু 'measurement of one quality of the reality is not that reality'—কাজেই বাস্তবও যে আমার চেতনার সৃষ্টি তা এর থেকে বললে তর্কশাস্ত্রোক্ত fallacy of 'non sequitar দোষে দুষ্ট হতে হবে। Inertial এবং gravitational mass একই constant দ্বারা নির্দিষ্ট—এই পরীক্ষিত সত্যের কোনো ব্যাখ্যা নিউটনের গতিবিজ্ঞানে ছিল না। এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে এর প্রকৃত যুক্তিবাদী আলোচনা হয়েছে। আর এর কদর্থ যে যেভাবেই করুক, আসলে এতে যে 'সাবজেকটিভ' বা Subjective Idealism-এর প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি, তা খুব সংক্ষেপে হলেও দেখানো হয়েছে।

আসলে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বক্তব্য কী? এ তত্ত্ব যে সত্য, তা correspondence criterion দিয়েও যাচাই করা গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (১) বুধগ্রহের সূর্যপ্রদক্ষিণের উপবৃত্তের অক্ষের ঘূর্ণন, (২) সৌর মহাকর্ষের ক্রিয়ায় আলোকরশ্মির পথের ভ্রান্তি, (৩) বিশাল নক্ষত্রদের আলোকের ক্ষেত্রে বর্ণালীর লোহিত-প্রান্তের দিকে চ্যুতি। এগুলো ছাড়া পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি তো আছেই যেগুলো special theory-র সমর্থন করে। আজ কোন physical theory তাই নিখুঁত নয়, যদি relativistic criterion বা আপেক্ষিকতার মানদণ্ড মেনে চলতে সে ব্যর্থ হয়। সর্বত্র এই

চরম স্বীকৃতির সঙ্গেই একটা বিরুদ্ধ গুঞ্জনও যে আছে, তার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

কিন্তু বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা এ লেখার এক্তিয়ারের বাইরে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কী পরিবর্তন এসেছে তারই কথায় আসা যাক। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই দিক দিয়ে শুধু পদার্থবিজ্ঞানীর জন্যে নয়, প্রকৃতি সম্বন্ধে, দেশ-কাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুমাত্রেরই কাছে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তার স্বরূপ কী, দু-কথায় তা দেখানো যায় না, তবে ইঙ্গিতটুকু দেওয়া যায়।

অহং-বাদী চিন্তানায়কদের দুটো category ছিল—theory এবং practice—অর্থাৎ বাস্তবের জগতের পাশেই তার ওপরে নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠত এই মনীষীদের ভাবের বা মননের জগৎ। Plato-র 'Nous' বা World of Idea এই জাতীয় একটা concept ছিল। অর্থাৎ, বাস্তব যা, তার চেয়ে, তার সম্বন্ধে 'থিয়োরি' অন্য কিছু, বেশি বা কম, কিন্তু এক নয়। এক যে নয় তা শুধু অবিকল থিয়োরি করা দুরূহ বলেই নয়, অবিকল বাস্তবানুগ থিয়োরী মনীষীদের মনীষীরা 'poor picture' বলেই, 'থিয়োরি' এবং 'প্র্যাকটিস' মিল খেত না। '...অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' কিংবা 'the real Trojan War was that which was recounted by Homer'—এই সব আপ্তবাক্যে এই বাস্তব-বিধর্মী আদর্শেরই প্রচার করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে বেকন প্রথম স্পষ্ট ভাষায় এই ধরনের theory-কে Idol of the Theatre বলে বিদ্রূপ করেন—অর্থাৎ, বাস্তব জীবনে যে-সব মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, রঙ্গমঞ্চে সে-সব মিলন অবলীলায় ঘটে থাকে। মনোগত 'থিয়োরি'র ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র কি বৈজ্ঞানিকের মন জানতে চায়, না বাস্তবকে জানতে চায়? আইনস্টাইন এই সত্য উপলব্ধি করেই, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবকে মাপকাঠি করে, অজস্র পরস্পর অন্বয়হীন সমীকরণের বদলে, systematic unified theory-র প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতে প্রতিভা জাহির করার সুযোগ ছাড়া আর কিছুরই হানি হবে না জেনেই। প্রকৃতির ভেতরে আশ্চর্য নিয়ম এবং শৃঙ্খলা আছে। তার নিয়ম, যা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা সে-গুলো বোঝাবার ভাষা মাত্র, তার ভেতরেও তা থাকবে—এটাই শ্রেয়। Knowing এবং Being—এদের ব্যবধান বৃদ্ধি হয়েছে কোয়ান্টাম থিয়োরির অনির্দেশ্য-বাদের দার্শনিক পরিণাম; এদের মধ্যে সেতুবন্ধনের দুরন্ত আশাবাদ—এই হল আপেক্ষিকতাতত্ত্ব। ওখানে জ্ঞানের পরাজয়ের স্বীকৃতি। এখানে জ্ঞানের নিরন্তর প্রত্যাশা। Probability-র ভিত্তিতে প্রকৃতি চলে, এই কোয়ান্টাম-প্রকল্প আইনস্টাইনের মনঃপূত ছিল না। 'থিয়োরি' এবং 'প্র্যাকটিসে'র অভিসারী সঞ্চরপথের বাইরেও তাঁর সমর্থন ছিল না। এই চিন্তারই আর এক প্রোজ্জ্বল দিগন্ত খুলে দিয়েছিল মার্কসবাদ। সে-সবের বিশদীকরণের দায়িত্ব পাঠকের মনে করে এই প্রসঙ্গের এইখানেই ছেদ টানা যাক।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

না ট্য প্র স ঙ্গ

তিতাস একটি নদীর নাম

লিট্‌ল থিয়েটার কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক আলোচনা সভায় উৎপল দত্ত এই বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন যে মঞ্চে একক অভিনয়ের যুগ শেষ হয়েছে—এখন সম্মিলিত অভিনয়ের যুগ। একক অভিনয় সম্পর্কে এইরকম শমন জারী অবশ্য মানবার নয়, তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সম্মিলিত অভিনয়ের এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এ শতাব্দীতে বিশেষ করে 'আঁসেম্বল্ থিয়েটরে'র বিকাশের ফলে। আর সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'আঁসেম্বল থিয়েটরে'র উপস্থাপনায় লিট্‌ল্ থিয়েটর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন। 'অঙ্গারে'র সাফল্যের পর সেই পর্বে 'তিতাস একটি নদীর নাম' আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা অঞ্চলের তিতাস নদীর তীরবর্তী মৎস্যব্যবসায়ী মালো জাতির জীবন অবলম্বনে রচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেছেন এঁরা। মৎস্যব্যবসায়ীর জীবনের উপস্থাপনায় এঁরা ত্রুটিবিহীন বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের উৎসব-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার-বিশ্বাস, কলহ-ভালোবাসার চূড়ান্ত বিশ্বাস্য রূপায়ণে মঞ্চের ওপরে নাগরিকদের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দূরের জগতের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রামাণ্য চিত্র দৃশ্যমান হয়েছে। নাগরিকের 'ইন্‌হিবিশন'কে বর্জন করে সমগ্র অভিনেতৃ-সম্প্রদায় যে ভাবে চূড়ান্ত পরিশ্রম ও সাধনার সঙ্গে গ্রামীন কায়িক শ্রমজীবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মসমীকরণে সমর্থ হয়েছেন তার ফলে মঞ্চের উপর মানুষের নিছক শারীরীক শক্তির একটা সম্মিলিত জীবন্ত প্রতিমূর্তি লভ্য হয়েছে—শুধুমাত্র সেই কারণেই এই নাট্যপ্রচেষ্টা প্রশংসা পেতে পারে। সম্মেলক অভিনয়ের ক্ষেত্রে কালীপূজার মেলার দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একক অভিনয় সম্পর্কে বিরূপতা সত্ত্বেও, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, নীলিমা দাস এবং স্বয়ং উৎপল দত্ত অভিনয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, এবং উৎপল দত্ত আরেকবার প্রমাণ করেছেন যে কমেডিধর্মী অভিনয়ে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মঞ্চস্থাপত্যের প্রতি 'লিট্‌ল থিয়েটরে'র "মনোযোগ" চিরকালই প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। 'তিতাস'-এর মঞ্চসজ্জায় ও আলোকসম্পাতেও তাদের "মনোযোগ" প্রখর—এবং সম্ভবত তা ভবিষ্যতের অনেক বাগবিতণ্ডার উৎস। বিশাল জীবনকে উপস্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে এরা মঞ্চের সীমাকে সম্প্রসারিত করেছেন। জাপানী কাবুকীমঞ্চের আদর্শে মঞ্চের সামনের করিডোরে পাটাতন ফেলে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে পথ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রস্থান ও প্রবেশপথ হিসাবে দর্শকদের প্রবেশপথকে ব্যবহার করার ফলে এবং ঐ পাটাতনের ওপর অভিনয়ের ফলে ড্রামাটিক এক্‌শনের ক্ষেত্র মঞ্চের সীমাকে অতিক্রম করে দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগকে অনেকে যাত্রার পুনর্জন্ম ভেবে তুষ্ট হয়েছেন অনেকে আবার বিরক্তিবোধও করেছেন। কিন্তু এ পদ্ধতির পূর্বতন আদর্শ যাই হোক না কেন, সুপ্রশস্ত নাট্যভূমি হিসাবে এই পথ অবলম্বন অপ্রযুক্ত হয় নি। মঞ্চের অভ্যন্তরে স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ সরলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাঁশ ও খড়ের সাহায্যে রাম কেশবের ঘর ও আঙিনার সাঁকো তৈরী হয়েছে মোটামুটি ন্যাচারালিষ্টিক্‌ আদর্শে। পশ্চাৎপটে সাদা পর্দায় তাপস সেনের আলোকসম্পাতে নদীতীরের ও আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, মেলার দৃশ্যে এবং পাগল কিশোরের স্মৃতি ফেরাবার প্রচেষ্টার দৃশ্যে সাদা পর্দায় 'কালার প্যাচেস'-এর ব্যবহার চমৎকার 'এফেক্ট' তৈরি করেছে। নদীবক্ষে নৌকায় সুবলকে খুন করার দৃশ্যে আলো-আঁধারি মায়ার সৃষ্টি আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় নি। রামধনুর দৃশ্যটিতে একটু খেলোমির ছাপ আছে। রাস্তাঘাটের দৃশ্যে 'প্লেইন কার্টেনে' অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চের অভ্যন্তরে বাস্তবানুগ দৃশ্যসজ্জায় অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে একটু সচেষ্ট হতে হয়, তবে উপস্থাপনার নিছক শক্তিমত্তাতেই শেষ পর্যন্ত সেই বৈপরীত্য গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তবে সব মিলে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত অভিনয়ের পক্ষে কার্যকরী হলেও এবং লিটল থিয়েটরের পরিচিত গুণপনার সাক্ষ্য বহন করলেও 'অঙ্গার' বা 'ফেরারী ফৌজে'র তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চস্থাপত্যকে গুণগত বিচারে অতিক্রম করেছে মনে করবার কোনো কারণ নেই।

নির্মল চৌধুরীর লোকসঙ্গীত এবং ঢাক ঢোলের বাজনা পরিবেশ রচনায় বিশেষ সহায়তা করেছে। কিন্তু মেয়েলী উৎসবের দৃশ্যে 'প্লে ব্যাক্‌'-এ কোনো আধুনিক গায়িকার কণ্ঠের গানের কৃত্রিমতা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক মনে

হয়েছে—এ ত্রুটি লিটল থিয়েটারের কাছে প্রত্যাশিত নয়। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণে দু-একজনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব স্পষ্ট হয়েছে।

এপিসোডিক দৃশ্যবিন্যাসে চলচ্চিত্র নাট্যের গতির আদর্শে প্রাণবন্ত মানব-দলিল রচনার কৃতিত্ব 'তিতাস'-এর জন্য লিটল থিয়েটরের প্রাপ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু একথা সেই সঙ্গে স্মর্তব্য যে মূলকাহিনীর অংশটি সে দলিলের উজ্জ্বল অংশ নয়—বরঞ্চ মহাজনের অত্যাচার, মেলার দৃশ্য, মালো রমনীর কলহ, উৎসব, ওঝার ঝাড়ফুঁক, মালো যুবকের ঈর্ষা ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড রূপায়ণেই উজ্জ্বলতা প্রকট এবং মূলকাহিনীতে সেন্টিমেণ্টাল মেলোড্রামা বর্জন করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব না হওয়ায় একটা অতৃপ্তি থেকে যায়।

অসামান্য প্রযোজনা শক্তির অধিকারী হয়েও লিটল থিয়েটর যদি নাটক নির্বাচনে আরো সাহসী এবং গতানুগতিকতার পরিপন্থী না হন, তবে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত ফসল ফলবে না।

ধ্রুব গুপ্ত

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীবিদ্যুৎ মিত্রের 'অভিযান' সম্পর্কিত আলোচনাটি যথেষ্ট আনন্দদায়ক। এ ছবিকে যারা সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে মনে করেন এযাবৎ তাদের কাছ থেকে superlative-সম্বলিত উচ্ছ্বাসবাক্য ছাড়া সুনিশ্চিত বক্তব্য বিশেষ কিছু শুনিনি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ লেখা যথেষ্ট অর্থবহ।

এবারে আমার পক্ষ থেকে জবাব দেবার চেষ্টা করি।

প্রথম কথা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বিনাটকীকৃত গভীরতা (অত্যন্ত সংহত নাট্যমুহূর্ত কিন্তু এ ছবিতে আছে) আর 'অভিযানে'র সংঘাতময় নাটকীয়তার পৃথকীকরণে আমাকে কোনো "অসুবিধা"র সম্মুখীন হতে হয়নি। অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘটনাবহুল অথচ ভাবগভীর ছবি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ('পটেমকিন' 'সেভেন্থসীল' বা 'এসেজ্ এণ্ড ডায়মণ্ডস্'-এর নাম করছি)। দ্রুতগতির প্রতি আমি স্বভাবতই বিরক্ত নই। কিন্তু এ সব তো প্রকৃতিগত কথা, গুণগত কথা তো নয়! আমার বক্তব্য 'অভিযানে'র "নিটোল কাহিনী"র অভ্যন্তরে কোনো ভাবের সংঘাত প্রত্যাশিত গভীরতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি।

শ্রীমিত্রের মতে সত্যজিৎ রায় নরসিংকে কায়িক শ্রমজীবীর প্রতিভূ করতে চাননি, তাকে সেই শ্রেণীর নৈতিকতার প্রতিমূর্তি করতে চেয়েছেন, এবং 'অভিযান' ছবির উদ্দেশ্য "depiction of proletarian ethics." সত্যজিৎ রায়ের জীবনদর্শন সম্পর্কে আমার যতদূর ধারণা তাতে আমার মনে হয় না বিশেষ কোনো শ্রেণীর নীতিবোধের সঙ্গে participation তাঁর অভিষ্ট—শ্রেণী-চেতনাতিক্রামী মানবত্ববোধই তাঁর চৈতন্যে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায় বলে আমার বিশ্বাস। এ ব্যাপারে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কথোপকথনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যাই হোক, যদি মেনে নেওয়া যায় যে 'অভিযান' ছবির উদ্দেশ্য শ্রমজীবী শ্রেণীরই নৈতিকতার প্রতীকী রূপায়ণ তবে কতগুলো বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রেণীবিশেষের চেহারাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে শ্রেণীগত নৈতিকতার প্রতীকী রূপ দেওয়া যেতে পারে কাহিনীর naturalistic বিন্যাসকে অগ্রাহ্য করে বাস্তবাতিক্রান্ত কোনো বিমূর্ত রূপের

মধ্যে। 'অভিযানে'র সে-রকম দাবি থাকতে পারে কি? 'অভিযানে' archetype স্থষ্টির উদ্দেশ্য সত্যজিৎ রায়ের ছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু সরল কাহিনী বর্ণনায় নরসিংহের চরিত্রে কোনো আর্কিটাইপ হবার সফলতা নেই। প্রতাপ সিংহের উল্লেখ বা ট্যাক্সীর গায়ে অশ্বারোহীর ছবি 'মিলিউ' রচনার কাজে স্থনির্বাচিত 'ডিটেইল'-এর কাজ করেছে বটে, কিন্তু তার ফলেই যে নরসিংহের চরিত্র কোনো প্রতীকী মূল্য অর্জন করেছে একথা মানতে পারি না। লাইটারকে একটা 'ডিভাইস' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ওর মধ্যেও কোনো অসামান্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অপর পক্ষে গোলাবী-উদ্ধার পর্বে অশ্বারূঢ় নরসিং-এর ছবিতে নরসিং-এর ভাবনাকে দৃশ্যমান করার মধ্যে কিছুটা crudity এসে পড়েছে। গোলাবীর সঙ্গে প্রেম-পর্বের মধ্যে যে উগ্র বাস্তবতার রূপায়ণ প্রত্যাশিত ছিল তাকে বেখাপ্পাভাবে মোলায়েম করা হয়েছে রূপকথাশ্রয়ী পরিবেশ স্থষ্টি করে।

শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন এ ছবির নায়কের চরিত্রে সৎ লোকের বড়ো হবার প্রচেষ্টার সমস্যাকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রে এই চরিত্রের সঙ্গে শ্রেণীনির্বিশেষে আমাদের সকলেরই একাত্মতার অবকাশ আছে। আমার মনে হয় 'অভিযানে'র অন্বিষ্ট ছিল তাই। একথা যদি সত্য হয় তবে কিন্তু বিশেষ শ্রেণীগত নৈতিকতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে ওঠে। বরঞ্চ তখন সামগ্রিক মানবিকতার প্রশ্নই আসে যাকে বিদ্যুৎবাবু হয়তো 'বুর্জোয়া লিবারালিজম' বলবেন। আমার মতে সামগ্রিক মানবিকতার ব্যঞ্জনার যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা অপু-চিত্রত্রয়ে বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় লভ্য তা 'অভিযানে' অনুপস্থিত, আর তাকে উপস্থিত করতে হলে যে শ্রেণীর চরিত্রকে অবলম্বন করে সেই মানবত্ববোধ প্রতিভাত হবে, তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রাথমিক প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কি সামান্য, কি বিশেষে 'অভিযান' আশানুরূপ তাৎপর্য স্থষ্টি না করে নিছক well-made brilliant narrative-এর পর্যায়ে থেকে গেছে।

অন্তরে গভীরতা না থাকলে উচ্চাঙ্গের হিউমার স্থষ্টি সম্ভব নয়, এবং সত্যজিৎ রায়ের আন্তরিক গভীরতা এবং হাস্যরসস্থষ্টির নৈপুণ্য তর্কাতীত—এসব "ট্রুইজমে"র পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য হলো 'অভিযান' ছবিতে কি পাওয়া গেছে।' "নিম্নতম শ্রেণীর লোকের পক্ষে উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহনের ইচ্ছাটাই হাস্যকর"—এ-জাতীয় মারাত্মক জেনারালাইজেশনে আমার কোনো

সমর্থনই নেই। এইখানেই আমি প্রাসঙ্গিকভাবেই 'অযান্ত্রিকে'র কথা উল্লেখ করছি। একথা অনস্বীকার্য যে দুটি ছবির পার্থক্য বিস্তর—একটি শেষ পর্যন্ত a compassionate study of obsession-এ দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আরেকটি একটি বলিষ্ঠ সুস্থ লোকের জীবনসংগ্রামের স্বাভাবিক কাহিনী। কিন্তু "বিমলে"র জীবনেও 'বাবুশ্রেণী'র সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নটি নিতান্ত নগণ্য নয় এবং বিশেষ করে ভদ্রশ্রেণীর একটি মেয়ের প্রতি তার দ্বিধাবিভক্ত চিত্তের সশঙ্ক আচরণের irony চিত্তআলোড়নকারী। ট্রেনের টিকিট হাতে জানালা অনুসরণ করে বিমলের ছোটার দৃশ্যে ইঞ্জিনের শব্দে মেয়েটির শেষ কথা শুনতে না পাওয়ার মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে তার তুল্য গভীরতা 'অভিযান'-এ লভ্য হয়নি। আমি এখানে গুণগত তুলনা করছি, প্রকৃতিগত তুলনা করছি না, ঠিক যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সঙ্গে 'অভিযানে'র গুণগত তুলনা করছিলাম। বিমলের চরিত্রে যে "deeper level of personality" উদ্ঘাটিত হয়েছে নরসিং-এর চরিত্রে আমি তা পাইনি। জগদ্দল সম্পর্কে সমস্ত আশা নির্মূল হবার পর "লোহার বাচ্চা" বলে বিমলের আর্তনাদ ও পাথর দিয়ে তাকে আঘাত করার মধ্যে যে অস্তিত্বের মূল কাঁপানো হাহাকার আছে তার তুলনায় অভিযানে 'কেরাইসলারে'র গায়ে ঢিল মারা বা যোশেফ্‌কে চড় মারার দৃশ্য অনেক রক্তশূন্য বলে মনে হয়—যেমন রক্তশূন্য মনে হয় মারামারির দৃশ্য। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়ার কান্নার তারসানাই-এর সাঙ্গীতিক রূপায়ন, 'অপরাজিত'তে হরিহরের মৃত্যুতে উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক এবং সর্বজয়ার 'কি হোল' আর্তনাদ, এমনকি ভিন্নপ্রকৃতিতেও কাঞ্চনজঙ্ঘায় নিঃসঙ্গ ধূসরতায় লাবণ্যের কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত—এই সব অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ঐ মৌলিক হাহাকার চিত্রস্থায়ী রূপকল্পে নিবদ্ধ আছে—এমনি অনেক মৌল আনন্দের প্রকাশ সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির অনেক উজ্জ্বল মুহূর্তে ঘটেছে। অভিযানে ঐ প্রকারের উজ্জ্বল মুহূর্তের একান্ত অভাব লক্ষ্য করেছি। বিদ্যুৎবাবুর বর্ণিত চিত্রাংশগুলির কোনোটিই উপরিলিখিত চিত্রাংশের তুল্য গভীর বলে আমার মনে হয় না।

বিদ্যুৎবাবুর 'প্রলেতারিয়া মরালিটি'র বিশ্লেষণ করলে এই রকম দাঁড়ায়—একজন শ্রমজীবী ইংরেজী লিখে ভদ্দরলোক হতে চায়—সেটা খুব হাসির ব্যাপার—ভদ্দরলোকদের সঙ্গে অত মাখামাখি ভালো নয় বাপু, নীতিভ্রষ্ট হবে। এবং শেষপর্যন্ত দেখলে তো মজা—ভদ্রকন্যা তোমাকে ছেড়ে দেড়খানা পা-

ওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেল তোমারই সাহায্য নিয়ে! এই অংশটি ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ, কিন্তু এর 'বিটার আইরনি'কে অব্যবহিত পরেই তরলীকৃত করা হয়েছে লঘু হাস্যপরিহাসে গোলাবীর সঙ্গে আলাপে। ভদ্রলোকদের বদ্ ব্যবসার ফাঁদে পা দিয়ে তোমাকে পাপের পথে পা বাড়াতে হলো—বন্ধুরা তোমায় ত্যাগ করলে। শেষ পর্যন্ত বাবা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চাষবাষ করোগে। অবসরমত গাড়ী চালিও! এই কি প্রলেতারিয়া নীতিবোধের জয়ের নমুনা! এই কি অপ্রতিহত 'অভিযান'? আমি 'অভিযানে'র বিষয়বস্তুকে অতি লঘু বা সংকীর্ণ করে দেখতে রাজি নই—এই-জাতীয় বিচারে পরশপাথরের মতো বুদ্ধি দীপ্ত কমেডির নায়ক পরেশবাবুকে হয়তো পেটি বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতীক বলে ঘোষণা করা হবে এবং ঐ ছবিকে ব্যাখ্যা করা হবে পেটি বুর্জোয়ার উচ্চবিত্ত হবার মোহ ভঙ্গের পর নিজস্বশ্রেণীগত 'নৈতিকতা'র জয়ের রূপায়ন হিসাবে। ঐ ধরণের "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা"র মানদণ্ড প্রয়োগ করেই 'পরশপাথর' সম্পর্কে এক সমালোচক সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে এতে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে সুখী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে! তা ছাড়া—আমার অভিযোগ রূপায়নের লঘুত্ব সম্পর্কে—যে জন্য আমার কাছে শেষ দৃশ্যটি নিছক নিটোল গল্পের সুখী পরিসমাপ্তি ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য বহন করেনি।

তা ছাড়া গিরিবর্জায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারকে "প্রলেতারিয়া নৈতিকতার জয়" বলে ব্যাখ্যা করার বিপদ আছে। 'সেমি-আরবান লেবার'কে 'রুরাল এগ্রিকালচারে" ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় কেউ যদি সত্যজিৎ রায়ের "সামাজিক বাস্তবতায়" পিছুটান আবিষ্কার করেন? আমি ঠাট্টা করছিনে—শিল্পকর্ম ব্যাখ্যায় এ-জাতীয় বিচারের আদর্শে আমার খুব আস্থা নেই।

'অভিযান' ছবির অনেক গুণ আছে—এবং এ-ছবি শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়েরই মহৎ শিল্পকর্মের এবং 'অযান্ত্রিকে'র মতো মহৎ ছবির তুলনায় খাটো। আমরা অধীর আগ্রহে 'মহানগরে'র অপেক্ষায় আছি সে ছবিতে আমাদের নাগরিক জীবনের আনন্দ বেদনার সুমহান রূপায়নের স্থির আশা নিয়ে।

ধ্রুব গুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

The Modern Prince and other Writings—Antonio Gramsci. Publisher—Lawrence & Wishert.

এ্যানটোনিয়ো গ্রামচি ছিলেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ্ গ্রামচি ফাসিস্ট মুসোলিনির কারাগারে একাদিক্রমে ১১ বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগ করে জেলের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনিই ছিলেন ইটালির সর্বপ্রথম মার্কসবাদী।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এ্যান্‌টোনিয়ো গ্রামচি ইটালিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। ১৯২৬ সালের ৮ই নভেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল কারাগারের অভ্যন্তরেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। এই সুবিখ্যাত দার্শনিক—যাকে বেনেডিটো ক্রোস্ দার্শনিক পাণ্ডিত্যে টমাস একুইনাস এবং ব্রুনোর সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছিলেন—সেই বিশ্ববিখ্যাত পরমজ্ঞানী গ্রামচি ইটালিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব করে মার্কসের একটি সুবিখ্যাত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন—সেই উক্তিতে মার্কস বলেছিলেন যে: "এতকাল দার্শনিকদের কাজ ছিল জগতের অর্থ ব্যাখ্যা করা, এখন থেকে তাঁদের কাজ হলো কেবল অর্থ ব্যাখ্যা নয়, জগতের পরিবর্তন ঘটানো।"

এ্যান্‌টোনিও গ্রামচির 'আধুনিক মহারাজ এবং অন্যান্য লেখা'য় মার্কসবাদের সারমর্ম অনুধাবনে এবং তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগে গ্রামচির অসামান্য প্রতিভা যে-কোনো পাঠককে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করতে বাধ্য। সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের সংগে মতান্ধতার কোথায় পার্থক্য তা বুঝতে হলে গ্রামচির লেখা পড়তেই হবে।

মার্কসবাদী তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সারমর্ম উদ্ঘাটিত করে গ্রামচি লেখেন:

"নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির অর্থ কেবল কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক "মৌলিক" আবিষ্কার নয়। তাছাড়াও তার বিশিষ্ট অর্থ হলো সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে আবিষ্কৃত সত্যের প্রচার, বলা যেতে পারে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের "সামাজিকীকরণ" এবং তার ফলে তা যাতে জীবন্ত কর্মের ভিত্তি হতে পারে, তা যাতে

সামূহিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় এবং তা পরিণত হয় চিন্তার ও নৈতিক জীবনের উপাদানে, তারই ব্যবস্থা করা।"

এই একটি মন্তব্যের ভিতর দিয়েই গ্রামচি সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির একটি কর্মসূচির যে নমুনা দিয়ে গেছেন তা সর্বদেশের এবং সর্বকালের প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদদের জন্য সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিত।

আজ যখন সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদ তথা মতান্ধতার গোঁড়ামি নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে তখন গ্রামচির লেখনী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুখারিন্ কর্তৃক লিখিত 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" নামক গ্রন্থ এবং "ডায়লেকটিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ" নামক প্রবন্ধের সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন এই সম্বন্ধে গ্রামচির সমালোচনা পড়ে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে তাত্ত্বিক গোঁড়ামির বা মতান্ধতার অনেক জড় বুখারিন কর্তৃক লিখিত "ঐতিহাসিক বস্তুবাদে"র মধ্যে নিহিত।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের তত্ত্ব সম্বন্ধে বুখারিনের ভ্রান্ত ধারনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে গ্রামচি বলেছেন—"·····তিনি (অর্থাৎ বুখারিন) ডায়লেকটিক তত্ত্বের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝেন না, তিনি ডায়লেকটিক তত্ত্বকে চেতনার নীতি, ইতিহাসের সারবস্তু এবং রাজনীতির বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত করে আনুষ্ঠানিক তর্কশাস্ত্রে এবং বিদ্যাবাগীশতার 'অ-আ-ক-খ' য় পরিণত করেছেন। (আলোচ্য গ্রন্থ, ৯৯ পৃষ্ঠা) !

গ্রামচি যখন বুখারিনের এই সমালোচনা করেন বুখারিন তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বপদের শিখরদেশ অলঙ্কৃত করছেন। তখনকার দিনে গ্রামচির এই নির্ভীক সমালোচনা ইটালির কমিউনিস্ট পার্টিতে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল।

"ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" নামক গ্রন্থে বুখারিন ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাববাদ (subjective idealism)-এর যে সমালোচনা করেছেন, গ্রামচি তার দুর্বলতা তুলে ধরে বলেছেন যে বুখারিন বুঝতে পারেন নি এই সমালোচনায় তিনি বাস্তব সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রহেলিকাবাদের অভিযোগ আসতে পারে। (১০৬ পৃষ্ঠা)

বুখারিনের বস্তুবাদ মার্কসবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রামচি বলেছেন—মানুষের মনের বাইরে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এই কথা প্রমান করবার

জন্য বুখারিন শুধু সাধারণ মানুষের বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাসকেই প্রধান স্থান দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর অপলাপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গ্রামচি এঙ্গেলসের যে ব্যাখ্যাটিকে প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করেছেন; সেই ব্যাখ্যাটি হলো এই :

"জগতের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে দর্শনের এবং বিজ্ঞানের দীর্ঘকালীন শ্রমসাধ্য বিকাশের ভেতর দিয়ে।"

এঙ্গেলসের এই সংজ্ঞাটির উল্লেখ করে গ্রামচি দেখিয়েছেন বুখারিনের দুর্বলতা কোথায়। বুখারিন বলেন—ইতিহাসে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পূর্বেও জগৎ ছিল, এ থেকে বস্তুই যে আদি তা প্রমাণিত হয়। গ্রামচি বলছেন যে, এই ইতিহাসও তো মানুষের মনের গোচরীভূত ইতিহাস, এমন ইতিহাস কোথায় আছে যা মানুষ তার চিন্তা দ্বারা সৃষ্টি করে নি? একজন মানুষের কাছে যে ইতিহাস বাস্তব সত্য সমগ্র মানবসমাজের সম্মিলিত চিন্তার কাছে তা বস্তুনিরপেক্ষ ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্য। সুতরাং বুখারিনের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করলে বস্তু শেষ পর্যন্ত মনের ওপর নির্ভরশীলই থেকে যায়। তাহলে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ সত্যের অস্তিত্ব কি করে প্রমাণিত হয়?

এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাটি পরীক্ষা করে গ্রামচি দেখিয়েছেন যে দার্শনিক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এই দুয়ের সমবেত ফলস্বরূপ বস্তুর বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হলো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দৈহিক মিলনের ফল। দার্শনিক গবেষণা চিন্তা দ্বারা সেই ফলটিকে যাচাই করে। আবার দার্শনিক চিন্তার ফলটিও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করা হয়। এই দুয়ের ফল যখনই মেলে তখনই বস্তুর বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয়।' তখন 'র‍্যাশনাল' এবং 'রিয়েল' এই দুয়ের মিলন ঘটে। "এই দুয়ের সম্বন্ধটি না বুঝলে মার্কসবাদ আদৌ বোঝা হয় না।"

গ্রামচি আরও অনেক আলোচনা করেছেন বুখারিনের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যে অতীতকালের বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনকে যে-রকমভাবে তিনি নেহাৎ মূর্খতার নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন তা মার্কসবাদী পর্যালোচনার বিরোধী।

মেকিয়াভেলির 'মডার্ণ প্রিন্স' আলোচনা করে গ্রামচি মার্কসবাদী তত্ত্বের সংগে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে অতীতকালের দর্শনের মধ্যেও বর্তমান কালের মার্কসবাদের জড় নিহিত আছে, সুতরাং সত্যের

উৎস তাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। অতীতের কোনো ভাববাদী দর্শনও একেবারে মিথ্যা বা মূর্খতার নজির নয়।

সমাজের বিকাশ এবং সামাজিক বিপ্লবের আলোচনায় গ্রামচি মার্কসবাদের মূলতত্ত্বটি অতি সংক্ষেপে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে যতক্ষণ না পুরাতন সমাজের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজবিপ্লব দেখা দেয় না, ভাবী সমাজের বীজ যতক্ষণ না বর্তমান সমাজের ভিতর পরিণতি লাভ করে ততক্ষণ নূতন সমাজের আবির্ভাব ঘটে না (১৬৫ পৃঃ)। এমনও হয় যে দীর্ঘকালীন সংকটের মধ্যেও সমাজটা বহুকাল টিকে থাকছে, তখন বুঝতে হবে যে বর্তমান সমাজের কর্ণধারগণ বর্তমানের মধ্যেই সংকট সমাধানের সংগ্রাম চালাচ্ছেন এবং তার ফলে সাময়িক সমাধানও ঘটছে।

'মডার্ণ প্রিন্স'-এর বিশ্লেষণসূত্রে গ্রামচি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি মূল্যবান সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। মানুষের চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়, যাকে বলা হয় 'পারস্পেকটিভ', বাস্তবক্ষেত্রে তার অবিকল প্রতিরূপ কখনও আবির্ভূত হয় না। চিন্তা দ্বারা মানুষ যে লক্ষ্য স্থির করে তার মধ্যে থাকে বহু নৈয়ায়িক যুক্তির সুশৃংখল সমাবেশ। বাস্তক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ঠিক তার অবিকল প্রতিকৃতি নয়। তাই চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য ঘটে এবং যেমনটি ভাবা যায় ঠিক তেমনটি ঘটে না। (১৬২ পৃষ্ঠা)

দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে, কর্মসূচি রচনায় এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে পরিবর্তনশীল জটিল জগতের সারমর্ম-উপলব্ধির প্রতি গ্রামচি অনেক জোর দিয়েছেন যাতে যান্ত্রিক পরিকল্পনা থেকে ডায়লেকটিক ভাবধারার পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে যে বহুমুখী আলোচনা আছে তা মার্কসবাদ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মহামূল্য অবদান। চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধনের তপস্যারত এই মহামনীষী ফাসিস্ট কারাগারের নির্যাতনের ভেতরও যে সৃষ্টিশীল অবদান রেখে গেছেন, তা পাঠকসমাজের সম্মুখে হাজির করে প্রকাশক আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা, অর্জন করেছেন। মার্কসবাদের ছাত্রদের নিকট এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। এত সম্পদশালী লেখার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার ভেতর এর প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। আরও পর্যালোচনা এবং সম্ভব হলে, অংশবিশেষের সারানুবাদও পাঠকেরাও সত্যই দাবী করতে পারেন।

ভবানী সেন

সে নহি, সে নহি। শ্রীচাণক্য সেন : ক্লাসিক প্রেস। দশ টাকা।

শ্রীচাণক্য সেনের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সে নহি সে নহি' যখন 'প্রবাসী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন মাসের পর মাস সাগ্রহে আমি তাহার অনুসরণ করি। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস "রাজপথ জনপথ" পড়িয়া মনে হইয়াছিল বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে এই নূতন আগন্তুকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিবার মতো। দ্বিতীয় উপন্যাসখানি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল, "বহুলাংশে" পরিমার্জনার পর। আমার আন্তরিক ধারণা বাঙালী পাঠকসমাজের চিন্তাশীল বিভাগ ইহাকে অবহেলা করিবেন না।

চাণক্য সেনের বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী, যদিও তাঁহার শিক্ষাজীবন কাটিয়াছে পূর্ববঙ্গের গ্রামে ও কলিকাতায়। কর্মজীবনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কলিকাতার 'স্টেটসম্যান' ও মধ্যপ্রদেশের 'নাগপুর টাইমস্'-এ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাঁহার মনোযোগের প্রকৃষ্ট পরিচয় 'ধীরে বহে নীল'—যাহা ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সমীক্ষা হিসাবে পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে। সাংবাদিকতার এই স্তর হইতে উদ্ভূত হয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস। ১৯৬০ সালে রচিত "রাজপথ জনপথ" উপন্যাসে দেখা যায় যে তাঁহার সাংবাদিকতা ও সাহিত্যিকতা কিছুটা কাছাকাছি ভাবে জড়াইয়া আছে।

বর্তমান যুগে সকল সভ্যদেশেই কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের সহিত সাংবাদিকতার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড় হইয়া গিয়াছে। সাংবাদিকের তথ্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিকের রূপায়ন-শক্তি নিশ্চয় একই শ্রেণীর রচনা-কুশলতার নিদর্শন নয়। কিন্তু উপন্যাসকার যদি তাঁহার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেন একেবারে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি খঞ্জ হইয়া পড়ে সাংবাদিকতার সম্পূরক শক্তির অভাবে। নিছক কল্পনা দিয়া উপন্যাস রচিতে গেলে তাহার সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইয়া পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। 'সে নহি সে নহি' উপন্যাসে চাণক্য সেন তাঁহার সাংবাদিক দৃষ্টি-নৈপুণ্যের সহিত সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার সংযোগ সাধনের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন।

"সে নহি সে নহি"-র রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬১ হইতে এপ্রিল ১৯৬২। আর এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা—সাবিত্রী আম্মার সহিত দেবযানীর নিউ দিল্লীতে সাক্ষাৎ—ঘটে ১৯৫৮-৫৯ সালে, যখন ইরাকে কাশেম-বিপ্লবের চমকপ্রদ অগ্রগতি ভারতের পার্লামেণ্টারি মহলে ভোজন-টেবিলেও আলোচনার

অন্তর্ভূক্ত। এই কেন্দ্রীয় ঘটনা হইতে গল্পের পরিসমাপ্তির কালব্যাপী ব্যবধান মাস-খানেকের বেশি হইবে না। কেবল এইটুকু বিস্তারের উপর নির্ভর করিলে উপন্যাসকার হয়তো ঘটনা পরম্পরাকে শরীরস্থ অস্থিগুলির মতো সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে না থাকিত দৈহিক লাবণ্য, না থাকিত প্রাণের প্রকাশ। গ্রন্থকার তাই তাঁহার বক্তব্যের তাগিদে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতকে। তিনি বলিতেছেন: "বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতবর্ষ এ উপন্যাসের পরিবেশ। তার সঙ্গে এসে মিশেছে বর্তমান কালের পৃথিবী। বহু মানুষের বিচিত্র ছায়া পড়েছে উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিবেশে তবু তাঁদের ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি প্রধান চরিত্র।" বলা বাহুল্য, সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে উপন্যাসকারের প্রধান দায়িত্ব এই প্রধান চরিত্রগুলির চিত্রনে। পশ্চাৎ-পট যতই বিস্তীর্ণ ও পরিবেশ যতই বিচিত্র হোক না কেন, উপন্যাস সাহিত্য-হিসাবে সফল হইতে পারে না যদি না তাহারা সম্পৃক্ত হয় প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়নের সহিত। শ্রীচাণক্য সেন সজাগভাবেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে প্রবাহিত দুটি নারীর জীবনধারা—তামিলনাদের সাবিত্রী আম্মা ও বাংলার দেবযাণী। দুজনের পরিচয় স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। সাবিত্রী আম্মা, গল্পের সূচনায়, জীবন-সায়াহ্নে কংগ্রেসী এম. পি স্বাধীনতা-সংগ্রামের গান্ধী-আন্দোলনে দীর্ঘকাল যোগদানের ফলে। দেবযাণীর বিজ্ঞান-শিক্ষা কলিকাতায় তবে বর্তমানে নিজের কৃতিত্বে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না তরুণী অধ্যাপিকা। সে স্বল্পকালের জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে, দিল্লীতে উচ্চমানের বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে। উপন্যাসে এই দুটি জীবনধারা অনুসৃত হইয়াছে তাহাদের উৎসমুখ হইতে। সাবিত্রী আম্মার পিতামাতার কাহিনী, ও দেবযাণীর মাতা ও মাতামহের কাহিনী উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অধুনা প্রচলিত সিনেমাশিল্পের আঙ্গিক অনুসারে লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন অতীত সম্বন্ধে 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' ও বর্তমান সম্বন্ধে 'ক্লোজ-আপ'। আধুনিক সাহিত্যশিল্পের বহুল-প্রচলিত প্রণালীর—ভাবের অনুষঙ্গ ও স্বগতোক্তি—ব্যবহারেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দিল্লী হইতে মাদুরাই, শবরমতী ও মাদ্রাজে, কলিকাতা হইতে বাংলার পল্লীতে এবং লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে। আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজ আমলের ভারত হইতে আজ পর্যন্ত

ক্রমবর্ধমান নারী-প্রগতির সুদীর্ঘ ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে রূপায়িত করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক গতিশীলতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নারীর প্রগতি ঘটিতেও পারে না, এবং তাহার বিশেষত্বকেও উপলব্ধি করা যায় না। তাই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক দাবীতেই লেখক বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও অগ্নিযুগকে। দক্ষিণ ভারতের পশ্চাৎপদ সমাজ, থিয়োসফি আন্দোলন ও মিসেস বেসান্তকে একদিকে, ও অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকালে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও গান্ধীজির শান্তি-প্রচেষ্টা, দেশবিভাগ, ও বিভাগ-জর্জর ভারতে দেশবাসীর পক্ষে ইংরেজের হাত হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শাসনভার গ্রহণ—এ সমস্তই উপন্যাসের চলিষ্ণু প্রবাহে যথোচিত স্থান পাইয়াছে। নারীর জীবনে, ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সমষ্টিগত ভাবেই হোক, পুরুষের সমর্থন ও বিরোধিতা অনিবার্য। তাই, সাবিত্রী আম্মা ও দেবযানী উভয়কেই কেন্দ্র করিয়া দেখা যায় নানাবিধ পুরুষ চরিত্রের আবর্তন। আর নারী প্রগতি সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে নারীমাত্রেই অন্য নারীর সহায়িকা নয়, এমনকি মা ও মেয়ে সবসময়েই পরস্পরের সহানুভূতিশীল সহযোগী নয়। নর-নারীর সম্বন্ধের নানা জটিলতার রহস্য নিহিত থাকে তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের অন্তরালে অপ্রকাশ্য মানসিক সংগঠনের স্বকীয়ত্বে। এই সব জটিলতা প্রকটতর হইয়া ওঠে কোনো দেশের ইতিহাসে যখন ঘটে কোনো অভূতপূর্ব দ্রুত পরিবর্তন। ভারতের স্বাধীনতা-লাভ ও সমাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্র ঘোষণা এমনই একটি ঘটনা যাহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কেবল ভারতীয় সমাজের মরা গাঙে জোয়ার আনে নাই, সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে করিয়াছে নূতন সংযোগের ও সংঘাতের নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলন।

এই নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলনের দশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে বিশেষত্ব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে প্রায় অপ্রতিবাদ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, বুদ্ধিজীবী উপন্যাসকার হিসাবে চাণক্য সেন তাঁহার গ্রন্থে তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

"স্বদেশের রাজধানীতে সেক্রেটারিয়েট ব্যাপারটা দেবযানীকে খানিকটা অভিভূত করেছে। ছাত্রীজীবন কেটেছিল কলকাতায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম শুনেছিল অনেক, কিন্তু একবার ছাড়া, কোনোদিন, তার সংস্পর্শে আসতে হয় নি। কোম্পানী আমলের ওই লাল ইটের বাড়ীটাকে ভালো করে

দেখে নি পর্যন্ত কোনও দিন।... কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং না জেনে থাকা গেছে, কিন্তু দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট না জেনে, না মেনে, বাঁচবার উপায় নেই। এ শহরের প্রাণ-কেন্দ্র হলো 'বড়া দপ্তর'। সে এত বড়, এত তার দাপট, তার কাছে মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সে চলে নিজের অমোঘ নিয়মের দীর্ঘসূত্র বেতালে; আপন মাহাত্ম্যে সে মাতাল। দেবযাণী ভেবেছিল, সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবেরা বুদ্ধিমান, কর্মকুশল, দেশের জনকল্যাণ তাঁদের, একমাত্র না হোক, প্রধান কাম্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, প্রয়োজনের তাগিদে, যাঁদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে তাঁরা অন্য জাতের মানুষ। তাঁরা নিজেদের দাম বড় বেশি বোঝেন, অন্যের দাম বড় কম। তাঁরা বাস্তব থেকে দূরে বাস করেন, পৃথিবীটাকে দেখেন নিজস্ব এক কৃত্রিম দৃষ্টিতে, বিকৃত করে। তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে চান, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। বলেন বেশি, শোনেন খুব কম। সর্বদা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা যা করেন তাই ঠিক, যা করেন তা নির্ভুল। দেবযাণীর রাগ হয়, মজাও লাগে। পশ্চিমে তার দশবছর কেটেছে, কিন্তু ব্যুরোক্রাটদের মাহাত্ম্য বোঝবার সুযোগ হয় নি। য়ুরোপ আমেরিকায় সিভিল সার্ভেন্টদের চেয়ার ছেড়ে দিতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। ভারতবর্ষেই উপন্যাসের আদর্শ নায়ক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে রাজপুরুষের মর্যাদা আকাশ-উঁচু। পাশ্চাত্যে সরকারী চাকুরেদের প্রতি বেসরকারী মানুষের বরং একটু প্রচ্ছন্ন অবহেলা। ওদেশের সিভিল সার্ভেন্ট সেবক। এদেশে তারা শাসক।"

দেবযাণী ছিল রাজনীতি-নিঃস্পৃহ বিজ্ঞান-সাধিকা। কিন্তু অল্পদিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বিস্মিত-ক্ষোভে অনুভব করিল, সরকারের কর্তৃত্ব-মুক্ত কোনো প্রচেষ্টারই—হোক না যতই কেন উচ্চতম মানবিক আদর্শের অনুগামী ও সর্বভারতীয় জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক—সহজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিদেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইল হিমাদ্রিকে, যে তাহার জীবনে বিজ্ঞান-সাধনার উদ্‌বোধক, গবেষণা-সাফল্যের প্রধান হোতা, তাহার আন্তর-আনুগত্যের প্রধান দাবীদার। কিন্তু গান্ধীবাদী হিমাদ্রিও বর্তমানে রাজনীতিতে বিগতস্পৃহ। দেবযাণীর স্বামী-বিচ্ছিন্ন জীবনের দ্বিতীয় অবলম্বন তাহার একমাত্র সন্তান, খোকন। এই খোকনের মুখ চাহিয়াই দেবযাণী হিমাদ্রিকে সর্বাঙ্গীনভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। হিমাদ্রি তাহার মানবিকতার সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া খোকনের চিত্ত জয় করিয়া জননী দেবযাণীকে

পুনরায় জায়াত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল। দেখা গেল, সন্তানবতী স্নেহশীলা মাতার পক্ষে পুনরায় পতিগ্রহণে যে সব সামাজিক প্রতিবন্ধ দেবযাণীর মর্মের গভীরতম প্রদেশে আত্মসংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা সার্বজনীন নয়, সর্বকালের নয়। সমাজের একটি বিশেষ স্তরে তাহাদের গুরুত্ব; সে স্তর কাটাইয়া গেলে তাহারা নির্বিষ হইয়া পড়ে। ইহা নিঃসন্দেহ যে স্বাধীন ভারতে উন্নততর সামাজিক ভাবাদর্শের প্রভাব বাদ দিয়া হিমাদ্রি-দেবযাণী-খোকনের সম্মিলিত জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই যে একটি সুখের সংসারের উপস্থাপনা হইল, স্বাধীন ভারতের ব্যুরোক্রাট-পর্যুদস্ত পরিবেশে ইহার ভবিষ্যত কতখানি সুখের থাকিতে পারিবে, উপন্যাসকার চাণক্য সেন তাহার কোনো ইঙ্গিত তাঁহার গ্রন্থে দেন নাই। দেবযাণী-হিমাদ্রির সযত্ন-লালিত দেশসেবার কর্মপদ্ধতি—দিল্লীতে বেসরকারী উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক গবেষনাগার প্ল্যানটি ভবিষ্যতের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকিয়া গেল।

গবেষনাগার সম্বন্ধে উপন্যাসে এই অনিশ্চয়তা, আমার মনে হয়, চাণক্য সেন মহাশয়ের শিল্পচর্চায় বিবেকবত্তায় পরিচায়ক। তিনি জানেন, বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলগত প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিচারবুদ্ধি দ্বিধামুক্ত নয়। তাহারা ইহাকে দেখিতে চান সনাতন ভারতীয় সভ্যতার মানবিক ঐতিহ্যবাহী আধুনিক পরি-প্রসার হিসাবে। সাবিত্রী আম্মার মুখ দিয়া তাই তিনি বলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার একটা দুরপনেয় দায়িত্ব আছে, যা দেবযাণীও মানিয়া লইয়া ভাবেন, ভারতবর্ষ দেশ নয়, সংস্কৃতি ও সংস্কার, আমাদের রক্তের স্রোতে ধমনীতে ধমনীতে ভারতবর্ষ প্রবাহিত। কিন্তু দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি এই সনাতন ভারতবর্ষের কোনো ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। হিন্দু-সমাজ কি ভারতের সব প্রদেশে সর্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সমাজ, তাহার অভ্যন্তরে কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রের সংঘাত কখনো ছিল না, ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণ অজ্ঞাত ছিল? তাছাড়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস কি কেবল্ হিন্দুরই ইতিহাস? ভারতীয় মুসলমান কি কখনই ভারতীয় হয় নাই। ইহা মানিলে তো মানিতে হয় ভারত-বিভাগই ভারত-ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি? চাণক্য সেন নিজেই দেখাইয়াছেন কি ভাবে বর্তমানের কংগ্রেসী নেতারা সযত্নে পরিহার করেন এই প্রসঙ্গকে। অন্যদিকে তিনি চাহেন যে ভারতীয় রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে আধুনিক ও বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠুক। তাই তিনি হিমাদ্রি-দেবযাণীর প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতে

'সায়েন্টিফিক ম্যান' গড়িবার প্রয়াসী। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র দেবযানী বলিতেছে, বিজ্ঞানের কোনও দেশকাল পাত্র নাই; বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি নাই যে দেবযানীর এই বিজ্ঞান-আনুগত্য এক বিমূর্ত বিজ্ঞান-সাধনার প্রতিভাস কি না। অর্থাৎ যে সমাজে বিজ্ঞানের সাধনা চলিতেছে সেখানে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের চরম মূল্য নির্ধারিত সেই সমাজের চালিকা-শক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। সেই কারণেই বর্তমান বিশ্বে সকল দেশের সকল সমস্যার মূলে হইতেছে এক অবিরাম সংঘাত—সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমাজবাদের, সংঘবদ্ধ ধনশক্তির সহিত বিবর্ধমান শ্রম-শক্তির। সনাতন ভারতবর্ষের বর্তমান খণ্ডিত উত্তরাধিকারেও এ সংঘর্ষের বিরাম নাই। তাই বিজ্ঞান-প্রসারের প্রসঙ্গেও রাষ্ট্রকর্মীরা বিব্রতভাবে প্রশ্ন তোলেন—এ কোন বিজ্ঞান? মার্কিন বিজ্ঞান, না রুশ বিজ্ঞান? তাই সাবিত্রী আম্মার স্বল্পদৃষ্টি কিন্তু রূঢ়ভাষী কন্যা সরোজা দিল্লীর রাজনীতি-বিশারদদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে আদর্শবাদী তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইংরেজ চলিয়া যাওয়াতে তাহাদের মহাবিপদ হইয়াছে, লড়িবার আর কিছুই নাই।

লড়িবার আর কিছুই নাই এই মনোভাব সর্বতোভাবে প্রযোজ্য ভারতের বুদ্ধিজীবীর বেলায়। চাণক্য সেনের এই বৃহদাকার উপন্যাসের সমস্ত পটভূমি জুড়িয়া আছে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বৃহৎ ধনশক্তির প্রতিনিধি বা সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধির কেহই এই উপন্যাসে স্থান পায় নাই। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে অনবহিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রধান চরিত্রগুলির সকলকেই বর্তমান বিশ্বের মূলগত সমস্যা সম্বন্ধে অনীহা-প্রবণতার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলায় এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে হইয়াছে কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে। কনট প্লেসের এক মাঝারি অভিজাত রেস্তোরায় এক মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণে আগত কয়েকজন বিভিন্ন-প্রদেশীয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সহিত দেবযানীর আলাপ-আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ আলোচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য, দর্শন কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়ে না। এবং দেখা যায়, বক্তাদের কাহারো মতের সঙ্গে অন্য কাহারও মতের কোনো ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকে না। এই আলোচনা-পর্বের প্রায় সমাপনকালে, আমন্ত্রণকারী অধ্যাপক সমীর ঘোষ দেবযানীকে বলিতেছে:

"আমাদের সবাকার কথা শুনে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস হচ্চে, আমাদের বিরাট মতভেদ। কোনো দুজন ভারতবাসী সব বিষয়ে একমত নয়। আসলে আমরা সবে মাত্র চলতে শুরু করেছি। এখনও নির্দিষ্ট পথে আমরা চলছি না। দেখুন না আমাদের রাষ্ট্রীয় চেহারা: আমরা গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু এ দেশে নেতারা যত অন্ধপূজা পান পশ্চিমে তার একাংশও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র হয়েও আমরা এক এবং অদ্বিতীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কিন্তু আসলে আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের জয়জয়কার। ধনী-দরিদ্র এমন প্রভেদ আজ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে নেই। আমাদের কংগ্রেস দল সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রকে বলিষ্ঠ করছে, আমাদের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিন মুখাপেক্ষী। কমুনিস্টরা সংগ্রাম-পলাতক ভদ্রলোক। অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছুই নির্ভেজাল নয়। আমরা এখন এক বিরাট লেবরেটরী; এখানে কেবল নানা পরীক্ষা চলছে— আমরা ফুটছি—মানে সেদ্ধ হচ্ছি, ফুটে উঠছি না।"

সকলে হেসে ওঠাতে সমীর ঘোষ আবার বলল, "প্রকৃত সংগ্রাম আমাদের এখনও শুরু হয় নি। দেরী আছে। প্রকৃত সংগ্রাম হলো সাধারণ মানুষের অধিকারের সংগ্রাম। একদিন আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। আমরা হঠাৎ দেখব শিব গড়তে গড়েছি বাঁদর। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় দেখব ধনতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমাসীন। গণতন্ত্রের পোশাক পরে দেখব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধনীদের রাজত্ব। তখন আমাদের নজর খুলবে। তখন ভারতবর্ষে হবে প্রকৃত সংগ্রাম। আজ আমাদের কারুর দল বেছে নেবার দরকার নেই তখন দরকার হবে। তখন জীবন নিজেই প্রশ্ন করবে তুমি কোন দলে? অনেকের দলে, না কয়েকজনের দলে? তখন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী; বৈজ্ঞানিক, সবাইকে দল বেছে নিতে হবে। এখন আমরা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ সবকিছুকে গালাগালি দিই। আমেরিকা ও রাশিয়াকে এক মানদণ্ডে বিচার করে নিজেদের অদলীয় নিরপেক্ষতার বাহাদুরী দেখাই। দম্ভ করে বলি অথবা কোনও দলে নই, সকলের কাছ থেকে তাই আমরা ননীর জন্যে হাত পাতি। আজ সবাই

আমাদের মিত্র। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে পশ্চিমের ধনতন্ত্র, প্রাচ্যের সাম্যবাদ। এমন দিন চিরকাল থাকবে না। ইতিহাসের নিয়মে আমাদের দল বেছে নিতে হবে। তখন আমরা নতুন সাহিত্য লিখব, আমাদের অর্থনীতি, জীবনদর্শন অন্যরকম হবে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে, অন্য লক্ষ্যে চলবে।"

সমীর ঘোষের এই সোচ্ছ্বাস উক্তি সেদিন কনট প্রেসের ভোজন-সভায় লঘুহাস্যে উপহসিত হইয়া সভায় সমাপ্তি টানিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উত্তেজিত উচ্ছ্বাসেরও দৌড় এই পর্যন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও কখনই একেবারে থামিয়া থাকে না। যাহাকে মনে হয় হঠাৎ পরিবর্তন, তাহাও হঠাৎ ঘটে না। নানা বিসর্পিত পথে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা দিয়া তাহা ইতিহাসের উদ্দেশ্য-সাধনের অভিমুখে পদক্ষেপ করিতে থাকে। মহৎ শিল্পীর দিব্যদৃষ্টিতে এই অজানা-পথের পথিকদের পাদচারণ প্রতিফলিত হয়। ইহার জন্য মহৎ শিল্পীদেরও প্রয়োজন হয় জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার। বর্তমান ভারতে বুদ্ধিজীবীদের জীবনের পরিধি যতটা বিস্তৃত তাহারই চৌহদ্দীকে মানিয়া লইয়া চাণক্য সেন "সে নহি সে নহি" উপন্যাসে যে সত্যনিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল সমাজ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যে, ও গল্পগঠনের উৎকর্ষে বর্তমান যুগের অবসানেও ইহাকে পৌছাইয়া দিবে ভবিষ্যৎ যুগের মানসলোকে।

১৭ই মার্চ, ৬৩ **নীরেন্দ্রনাথ রায়**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইংরেজি) সম্পাদনা, পুলিন বিহারী সেন। প্রকাশন শ্রীমতী ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্টের সম্পাদিকা। ১৯৬১। দাম ১৬-বা ২১- টাকা।

দিন যত যাচ্ছে ততই অবনীন্দ্রনাথের সত্যকার পরিচয় তাঁর পরবর্তীকালের কাছে স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও। নিজের সাহিত্য-সৃষ্টিতে জীবিতকালেই যিনি দীপ্যমান সে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তা আজ যেমন আমাদের কাছে এক বিস্ময়, তেমনি নিজের শিল্পসৃষ্টিতে জীবিতকালে যিনি সর্বমান্য শিল্পগুরু সেই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতিত্বও আজ আমাদের সকলের চক্ষে এক অপরূপ প্রকাশ। আর কয় বৎসর পরেই (১৯৭১) তাঁর জন্ম শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসবেরও দিন আসছে, এ কথাটা এখন থেকে স্মরণ করা বাঙালীর ও ভারতবাসীর কর্তব্য—ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব দি অরিয়েন্টাল আর্ট

সমিতির গোল্‌ডেন জুবিলী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তাঁদের জর্নালের এই বিশেষ সংখ্যা (নবেম্বর ১৯৬১) 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র নামে উৎসর্গ করায় সেই কথাটা আমাদের অন্ততঃ মনে পড়ে গেল।

ইং ১৯০৭ সালে সোসাইটির জন্ম। সে কাহিনীও আজ ইতিহাস, স্মরণ করবার মতো গৌরবের ইতিহাস। এলো-পাথারি আর্ট-বিলাসের ধোঁয়ায় সোসাইটি অদৃশ্য প্রায় বলেই আরও স্মরণীয় তার স্মৃতি, তার কীর্তি, তার আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক কাহিনী, শেষে সার্থকতার মধ্যে তার প্রায় জরাবসাদের বেদনাদায়ক কথাও। সমিতির কথাও গ্রন্থখণ্ডে কতকটা বিবৃত হয়েছে নানা লোকের লেখায় ও উদ্ধৃতিতে,— অবনীন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী, জেমস-এ-কাজিন্‌ প্রভৃতির। তার জরতার পর্বটা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে কেউ উদ্‌ঘাটন করলে সম্ভবতঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার অবনীন্দ্র-কীর্তির বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। আমরা অবশ্য মনে করি কালের গুণে সোসাইটিতে জড়তা এলেও ভারতশিল্পের আবিষ্কার মিথ্যা হয় নি। এবং আমাদের জাতীয় আত্মবোধের ও শিল্প-চেতনার নবোদ্বোধনের ইতিহাসে তাই সোসাইটির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ এই নব্য ভারতীয় শিল্পকলার গুরু বলে পরিচিত তাই এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রধানতঃ তাঁরই কথা। অবশ্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় নিশ্চয়ই শুধু এই নয় যে, তিনি সেই শিল্প আন্দোলনের গুরু। বিনোদ বিহারী বাবুর এই কথা অত্যন্ত সত্য। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের বা রিভাইল্‌ভ্‌-এর প্রয়াস এই নব্য-ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে যে দেখা দেয়, তা কিন্তু স্বীকার্য, এবং অবনীন্দ্রনাথ চান বা না-চান, সেই 'পুনরুজ্জীবনের' পুরোধা বলতে দেশে তাঁকেই বোঝায়! নিঃসন্দেহ, তাঁর অপেক্ষা সেই প্রাচীন ঐতিহ্য বেশি প্রাণ লাভ করে তাঁর প্রধান শিষ্য শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর সে সময়কার কর্মে। এবং আরও সত্য এই যে, নন্দলালের কীর্তিও পুনরুজ্জীবন নয়, প্রাণের পুনরুদ্বোধন। অর্থাৎ তিনিও ঐতিহ্যের আবৃত্তি করেন নি, তা নবায়িত করেছেন। আর তারপর নব-নব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের নিয়মে ভারতীয় শিল্পের এমন-এক আধুনিক অধ্যায়েরও উদ্বোধন করেছেন—যা বিচিত্র, অভিনব, বহুঐশ্বর্যবান্‌, অথচ ঐতিহ্যবান্‌, যা স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রাণস্পর্শ হারিয়ে আপনাকে হারাতে চায় নি। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা তাঁর শিষ্যদের পক্ষে এই বন্ধনমুক্তির ক্রমিক সাধনা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার পরিচয় তাঁর নিজের কথায় ও শিল্পরসিকদের কথায় এই অবনীন্দ্র সংখ্যা গ্রন্থটিতে শ্রীপুলিন বিহারী সেনের সযত্ন সম্পাদনায় সার্থক হয়ে উঠেছে। লোভ থেকে যায় বিশদ আলোচনায় এই অবনীন্দ্র পরিচয় পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতে। তা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে আর দেরী না করে শুধু এই অবনীন্দ্রসংখ্যার বিবিধ বিষয় ও চিত্রাদির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আপাততঃ সম্ভব।—প্রথমেই চিত্রের কথা বলি—অবনীন্দ্রনাথের ১৪খানা চিত্র এগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তা সামান্য নয়, কিন্তু সমগ্র অবনীন্দ্র-কীর্তির তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু হায়, সেই সমগ্র কীর্তিও তো আর লভ্য নয়। যা নানা দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাবও এখন দুষ্প্রাপ্য। তবু এই গ্রন্থে কিছু আছে আলেখ্য, আর কিছু নানা বয়স ও রীতির পরিচয়বাহী দান—সেই প্রথম যুগের 'ভারতমাতা', থেকে শেষযুগের একখানি 'কুটুম-কাটম' পর্যন্ত (এক-আধটি 'মুখোস' কি দুর্লভ হয়েছে ?)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা যারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাদেরও অনেকের মনে জাগবে 'শাহাজানের মৃত্যু'র মতো কোনো কোনো চিত্রের সম্মুখে বসে পূর্বতন এক যুগের অপূর্ব শিহরণ। সেই সঙ্গে আছে নন্দলালের দু'খানা চিত্র—অবিস্মরণীয় আলেখ্য (?) চিত্র 'অবনীন্দ্রনাথ', মুকুলদের আলেখ্য, আর 'ফাল্গুনী'-'ডাকঘর'আদির অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ, ও কিছু-কিছু প্রাচীন ভারতীয় ভঙ্গি নিদর্শন, প্রভৃতি। চিত্র ছাড়া আছে ইংরেজী অনুবাদে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ ('সাদৃশ্য', 'ষড়ঙ্গ', 'মূর্তি' প্রভৃতি) এবং 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি থেকে কিছু-কিছু স্মৃতি-কথার অংশ। এ ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মৌলিক রচনা আছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের, অবনীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রমথ নাথ বিশীর, তাঁর অখণ্ড শিল্প-সাধনার আলোচনা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। প্রত্যেকটিই মূল্যবান্।

এই রেখা ও লেখার পরম রসিক শিল্পীর কথা দেখতে দেখতে বারবারই মনে হলো—শতবার্ষিক জয়ন্তীর জন্য আমরা যেন প্রস্তুত হই এখন থেকে।

স্বদেশীসমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্কলন ও সম্পাদনা: শ্রীপুলিন বিহারী সেন বিশ্বভারতী, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

পরিচয় অনাবশ্যক। আবশ্যক ছিল 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ও তৎসম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের অন্য প্রবন্ধের অংশ সমূহের এরূপ সঙ্কলন। এখানে তা একসঙ্গে পেয়ে পাঠক কৃতার্থ হবে। কিন্তু মাত্র ১২৫ পৃষ্ঠার একখানা বইএর দাম তিনটাকা হলে পাঠকের কৃতজ্ঞ হবার কারণ নেই।

গোপাল হালদার